পিশাচ কাহিনি

ড্রাকুলা-খ্যাত ব্রাম স্টোকার-এর

দ্য জুয়েল অভ সেভেন স্টারস

রূপান্তর: ইসমাইল আরমান

সেবা প্রকাশনী

ড্রাকুলা-খ্যাত ব্রাম স্টোকার-এর
আরেকটি বিশ্ববিখ্যাত পিশাচ-কাহিনি

দ্য জুয়েল অভ সেভেন স্টারস

রূপান্তর: ইসমাইল আরমান

প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে মারা গেছে ও;
মমি হয়ে মৃতদেহটা শুয়ে আছে নির্জন, অন্ধকার
এক সমাধিতে। কিন্তু সত্যিই কি মারা গেছে রানী টেরা?
তা হলে মমির হাতটা জ্যান্ত হাতের মত অবিকৃত কেন?
কেন ওটা কেটে গেলে গড়াতে শুরু করে তাজা রক্ত?
কেনই বা মমিটার কাছে এলে অচেতন হয়ে পড়ে মানুষ?
নৃশংসভাবে কে খুন করছে কুলিদের? কেন তাদের গলায়
পাওয়া যায় টেরার হাতের মত সাতটা আঙুলের ছাপ?
মমিটাকে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে এসে ভুল করলেন না তো
অ্যাবেল ট্রেলনি? রাতদুপুরে কে হামলা করছে তাঁর উপর?

বান্ধবীকে সাহায্য করতে গিয়ে রহস্যটার সঙ্গে জড়িয়ে গেল তরুণ আইনজীবী ম্যালকম রস। গভীর রাতে ছুটে যেতে হলো ওকে অশুভ ছায়ায় ঢাকা ট্রেলনি হাউসে। মুখোমুখি হতে হলো ভয়ঙ্কর এক আতঙ্কের। সপ্তর্ষির আতঙ্ক!

ড্রাকুলার পর ব্রাম স্টোকারের লেখা সবচেয়ে বিখ্যাত পিশাচ কাহিনি। আর যা-ই করুন, রাতে পড়তে বসবেন না!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

লেখক পরিচিতি

আব্রাহাম "ব্রাম" স্টোকার ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের ০৮ নভেম্বর আয়ারল্যাণ্ডের ক্লনটার্ফে জন্মগ্রহণ করেন। সাত ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। অজ্ঞাত এক রোগে পুরো শৈশব বিছানাবন্দি থাকার পর কৈশোরে তিনি প্রায় অলৌকিকভাবে সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং ডাবলিন কলেজের কৃতি ক্রীড়াবিদে পরিণত হন। অঙ্কশাস্ত্রে স্নাতক হিসেবে পাশ করবার পর তিনি ডাবলিন প্রাসাদে সরকারি কর্মচারী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন; পাশাপাশি সমকালীন বিভিন্ন পত্রিকার পাতায় গল্প লেখার মাধ্যমে জড়িয়ে পড়েন সাহিত্যচর্চায়। ১৮৭৮ সালে সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি লণ্ডনে পাড়ি জমান এবং বিখ্যাত অভিনেতা সার হেনরি আরভিঙের লাইসিয়াম থিয়েটারে বিজনেস ম্যানেজার হিসেবে যোগ দেন। ১৮৮২ সালে তাঁর লেখা প্রথম গ্রন্থ *আণ্ডার দ্য সানসেট* প্রকাশিত হয়। লেখালেখিকে কখনোই পেশা হিসেবে নেননি তিনি, তারপরও

আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা পান ১৮৯৭ সালে *ড্রাকুলা* প্রকাশের পর। বিশ্বসাহিত্যের সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাসগুলোর একটিতে পরিণত হয় সেটি। *ড্রাকুলা* ছাড়াও স্টোকারের অন্যান্য বিখ্যাত বইগুলোর মধ্যে রয়েছে *দ্য জুয়েল অভ সেভেন স্টারস*, *লেয়ার অভ দ্য হোয়াইট ওঅর্ম*, *লেডি অভ দ্য শ্রাউড*, *ড্রাকুলা'স গেস্ট*, প্রভৃতি। ১৯১২ সালের ২০শে এপ্রিল পরলোকগমন করেন এই কালজয়ী সাহিত্যিক।

অদ্ভুত... অবিশ্বাস্য যে-ঘটনা আজ শোনাতে চলেছি আপনাদের, তার ভিতর মিথ্যে নেই এক রত্তিও। সবকিছু আমার জন্য এতই বাস্তব ছিল যে, ওটাকে কল্পনা বা দুঃস্বপ্ন বলে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। যেভাবে সবকিছু ঘটেছে, তা যুক্তি দিয়ে হয়তো মেনে নেয়া যাবে না; কিন্তু তাই বলে যদি পুরো ব্যাপারটাকে অস্বীকার করি—তা হলে মিথ্যাচার করা হবে। স্মৃতির মণিকোঠায় প্রতিটি ঘটনা আজও জ্বলজ্বল করছে... কখনও এতে আতঙ্ক অনুভব করি, আবার কখনও হই পুলকিত! হাজার হোক, মানুষের জীবন তো এসবেরই মিশেল, তাই না? স্মৃতিও এ-কারণে প্রায়শই নানা রকম খেলায় মেতে ওঠে—অসময়ে এমন সব কথা মনে করিয়ে দেয়, যা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে একেবারেই বেমানান।

আজকের কথাই ধরুন। প্রিয়তমাকে নিয়ে নৌকায় বসে আছি আমি, দুজনে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি পানির দিকে। বিকেলের সোনা-রঙা রোদে ঝলমল করছে দিগ্বিদিক। পানিতে ঝিলিমিলি দেখে মনে হচ্ছে যেন ওখানে তরল সোনা ঢেলে দেয়া হয়েছে। নৌকার পিছনে একজন মাঝি রয়েছে—নিয়মিত তালে বৈঠা বাইছে সে। ছলাৎছল ছন্দে মগ্ন হয়ে রয়েছি আমরা, কথা বলতে

ভুলে গেছি। মাঝে মাঝে শুধু দৃষ্টি বিনিময় করছি পরস্পরের দিকে। নীরবতা আর নির্জনতা মেশানো এক মোহময় পরিবেশে হারিয়ে গেছি দুজনে।

হঠাৎ করে... এই রোমাণ্টিক মুহূর্তকে বিদীর্ণ করে জেগে উঠল সেই স্মৃতি। আমাকে নিয়ে গেল কয়েক বছর আগেকার সেই কালো রাতে।

ব্যাপারটা তা হলে আপনাদের খুলেই বলি।

জারমাইন স্ট্রিটে থাকতাম আমি তখন, ওখানেই আইন ব্যবসা করতাম। নিত্যদিনের স্বাভাবিক কাজকর্ম শেষে সে-রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ জেগে উঠলাম ধুপধাপ শব্দে। এমনিতে এসব শব্দকে পাত্তা দিই না আমি, জারমাইন স্ট্রিটের মত ব্যস্ত এলাকায় দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টাই নানা রকম শব্দ শোনা যায়। গাড়ি-ঘোড়া থেকে শুরু করে মানুষের চেঁচামেচি—সব ধরনের আওয়াজে মুখরিত হয়ে থাকে পুরো এলাকা। ওসবে যদি বিরক্ত বোধ করেন, তা হলে জায়গাটায় বাস করা অসম্ভব হয়ে পড়বে আপনার জন্য। তাই আমিও একটা অভ্যাস করে নিয়েছিলাম—যত শব্দই হোক, সব অগ্রাহ্য করবার। তবে সেদিন আর অগ্রাহ্য করা সম্ভব হলো না, কারণ ধুপধাপ শব্দটা আমার দরজাতেই হচ্ছে—প্রবল শক্তিতে পাল্লায় কিল মারা হচ্ছে, যেন আমার ঘুম না ভাঙিয়ে থামবে না। কলিং বেলটাও বাজানো হচ্ছে একই সঙ্গে।

কী আর করা, উঠে পড়লাম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, তিনটে বাজে। ভুরু কুঁচকে গেল আমার, এত রাতে কে এসেছে আমার কাছে? কেনই বা এসেছে? নীচে না গেলে জানার উপায় নেই। তাই ড্রেসিং গাউন পরে পায়ে স্লিপার গলালাম, তারপর নিঃশব্দে নামলাম নীচতলায়। সদর দরজার ছিটকিনি নামাতেই থেমে গেল ধাক্কাধাক্কি—ওপাশের মানুষটা বুঝতে পেরেছে, আমি

জেগে উঠেছি।

দরজা খুললাম। ফিটফাট পোশাক পরা এক খানসামা দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়। তার কাঁধের উপর দিয়ে রাস্তায় দাঁড়ানো একটা ঘোড়ায় টানা ক্যারিজ চোখে পড়ল—কোচোয়ান বসে আছে তৈরি ভঙ্গিতে; ঘোড়াগুলো জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে, যেন পাগলের মত ছুটে আসতে হয়েছে ওগুলোকে।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালাম খানসামার দিকে।

'রাত-দুপুরে বিরক্ত করবার জন্য ক্ষমা চাইছি, সার,' বলল লোকটা। 'তবে আমাকে বলে দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না বাড়ির লোক দরজা খোলে, ততক্ষণ ধাক্কা দিয়ে যেতে হবে। ব্যাপারটা খুব জরুরি।'

'কী হয়েছে?' জানতে চাইলাম।

'এটা কি মি. ম্যালকম রসের বাড়ি?'

'আমিই ম্যালকম রস।'

'তা হলে এই চিঠিটা আপনার জন্য, সার,' পোশাকের ভিতর থেকে একটা মুখবন্ধ খাম বের করে দিল খানসামা। 'গাড়িটাও।'

বিস্মিত হয়ে চিঠিটা হাতে নিলাম—আইনের পেশায় নানা ধরনের অদ্ভুত অনুরোধ-উপরোধ শুনি বটে, তবে রাতদুপুরে এমন অভিজ্ঞতা এটাই আমার জন্য প্রথম। লোকটাকে দাঁড়াতে বলে হলঘরে চলে এলাম আমি, বাতি জ্বেলে খুললাম খামটা।

মেয়েলি হাতে লেখা হয়েছে চিঠিটা, শুরু হয়েছে কোনও ধরনের সম্বোধন ছাড়া। ভাষাটা এরকম:

অসময়ে এই চিঠি পেয়ে হয়তো অবাক হচ্ছ। কিন্তু তুমিই তো কথা দিয়েছিলে, প্রয়োজনের সময় সাহায্য করবে আমাকে—সেটা যখনই হোক না কেন। কথাটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি আমি, তোমার উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা

আছে। তাই লিখছি এ-চিঠি।

হ্যাঁ, ম্যালকম... তোমার সাহায্য প্রয়োজন আমার... এখুনি। রীতিমত দিশেহারা বোধ করছি। কোথায় যাব, কী করব—কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার বাবাকে খুন করবার চেষ্টা করা হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে গেলেও আহত হয়েছেন, জ্ঞান হারিয়েছেন। ডাক্তার আর পুলিশকে খবর দেয়া হয়েছে, কিন্তু আমি জানি—ওরা এলেই আমি সান্ত্বনা পাব না। কাছের একজন মানুষ প্রয়োজন আমার এ-মুহূর্তে, যার উপর আস্থা রাখতে পারি, যাকে ভরসা করে শান্ত হতে পারি... তোমার কথাই মনে পড়ল সবার আগে।

জানি না, এই অযাচিত অনুরোধে বিরক্ত হচ্ছ কি না। তবে একটাই মিনতি—যদি সম্ভব হয়, এক্ষুণি চলে এসো তুমি, ম্যালকম... এক্ষুণি!

—মার্গারেট ট্রেলনি।

মনটা নেচে উঠল... না, মার্গারেটের বিপদের কথা শুনে নয়; বরং দুঃসময়ে দুনিয়ায় এত লোক থাকতে ও আমাকেই খবর দিয়েছে বলে। অনেকদিন থেকেই ওকে নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনছি আমি—বোঝা যাচ্ছে, ব্যাপারটা একতরফা নয়। ও-ও আমার প্রতি দুর্বল... আমাকে কাছের মানুষ মনে করে।

গলা চড়িয়ে খানসামাকে বললাম, 'একটু অপেক্ষা করো, আমি এখুনি আসছি।' তারপর ছুটে গেলাম ওপরতলায়।

মুখ-হাত ধুয়ে পোশাক পাল্টাতে বেশি সময় লাগল না। মিনিট দশেকের মধ্যেই রওনা হয়ে গেলাম মার্গারেটের বাড়ির উদ্দেশে। ঘোড়ার পিঠে নির্মমভাবে চাবুক চালাল কোচোয়ান, ক্যারিজটাকে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে চলল গন্তব্যের দিকে। আজ

সাপ্তাহিক বাজারের দিন; আমরা যখন পিকাডিলি পৌঁছুলাম, তখন পশ্চিম দিক থেকে একের পর এক ঠেলাগাড়ি ঢুকছে ওখানে—নানা রকম জিনিসপত্র বোঝাই করে। এ-ছাড়া বাকি রাস্তা মোটামুটি ফাঁকাই পাওয়া গেল, ফলে দ্রুত এগোতে পারলাম আমরা।

খানসামা লোকটা আমার সঙ্গেই ক্যাবে বসেছে, সুযোগ পেয়ে তার কাছে পুরো ঘটনা জানতে চাইলাম। জবাবে সে বলল, 'আমি ঠিক জানি না, সার। মিস ট্রেলনি আমার ঘুম ভাঙিয়ে চিঠিটা হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, যত দ্রুত সম্ভব আপনাকে নিয়ে যেতে। আদেশটা পেয়ে আর দেরি করিনি; মরগান... মানে কোচোয়ানকে নিয়ে ছুট লাগিয়েছি।'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু বাড়িতে ঘটেছেটা কী?'

'সত্যিই আমার জানা নেই, সার। শুধু শুনেছি যে, আমাদের কর্তাকে তাঁর রুমে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গেছে। বিছানার চাদর-টাদর সব রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। কিছুতেই তাঁর জ্ঞান ফেরানো যাচ্ছে না।'

'কে পেয়েছে ওঁকে?'

'সম্ভবত মিস ট্রেলনি নিজেই। তেমনটাই শুনেছি।'

'মার্গারেট পেয়েছে!' একটু অবাক হলাম। 'এত রাতে বাবার রুমে কেন গিয়েছিল ও?'

'কী জানি!' কাঁধ ঝাঁকাল পরিচারক। 'বিস্তারিত ঘটনা জানা নেই আমার।'

চুপ হয়ে গেলাম। আরও কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল, কিন্তু মার্গারেটের কাছ থেকে সব শোনাই ভাল হবে বলে মনে হলো। তাই নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে থাকলাম গন্তব্যে পৌঁছুনোর জন্য।

দ্রুত নাইটস্‌ব্রিজ পেরিয়ে গেলাম আমরা, তখন ভোরের নিস্তব্ধ পরিবেশে আমাদের ক্যারিজের চাকার ঘট-ঘটাং অপার্থিব

শব্দ তুলছে। একটু পরেই কেনসিংটন প্যালেস রোডে উঠে এলাম—ওই রাস্তা ধরে নটিং হিলের কাছাকাছি পর্যন্ত গেল ক্যারিজ, তারপর বাঁ-দিকের একটা বিশাল বাড়ির সামনে থামল। খানসামার ইশারা পেয়ে নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে, চোখ বোলালাম সামনে।

বাড়িটা চমৎকার, রীতিমত আলিশান বলা চলে। আকারটা মুখ্য নয়, স্থাপত্যশৈলী-ই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভোরের এই ম্লান আলোতেও আকর্ষণটুকু হারিয়ে যায়নি।

কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলাম স্থিরভাবে, তারপর খানসামার গলা খাঁকারি শুনে তাকে অনুসরণ করলাম। সদর দরজা পেরিয়ে হলঘরে পৌঁছুতেই দেখা পেলাম মার্গারেটের। ব্যক্তিত্ববান মেয়ে ও, নারীসুলভ ব্রীড়াবোধ নেই—সারাক্ষণ এক ধরনের কর্তৃত্বের ছটা বেরোয় ওর মধ্য থেকে। ব্যাপারটা খুব ভাল লাগে আমার। তবে আমি যখন পৌঁছুলাম, তখন কী যেন ঘটে গেছে ওর মধ্যে। অবয়বে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, মুখটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

হলঘরের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে একজন পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে কথা বলছে মার্গারেট; ইউনিফর্মধারী দুজন পুলিশ রয়েছে কাছাকাছি, সাদা পোশাকে আরেকজন দাঁড়িয়ে আছে সামান্য দূরে। বেশ কয়েকজন ভৃত্যকে চোখে পড়ল আশপাশে—পুরুষ চাকররা দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে, চাকরাণীরা রয়েছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। সবার চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ।

আমাকে দেখতে পেয়েই প্রায় ছুটে এল মার্গারেট। হাত চেপে ধরল পরম নির্ভরতায়, ফিসফিসিয়ে বলল, 'আমি জানতাম তুমি আসবে।'

পুলকিত হয়ে উঠলাম। এই হাত চেপে ধরাটা অনেক কিছুই নির্দেশ করে—হোক সেটা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত। মার্গারেটের

সুন্দর-সুগঠিত হাতদুটো যেভাবে আমাকে আঁকড়ে ধরেছে, তা এক ধরনের আত্মসমর্পণ ছাড়া কিছু নয়। ওকে অভয় দেয়ার ভঙ্গিতে হাসলাম একটু, বোঝাতে চাইলাম—সব ঠিক হয়ে যাবে।

সাহস পেল বোধহয় ও। হাত ছেড়ে দিয়ে পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের দিকে ফিরল, তারপর পরিচয় করিয়ে দিল আমাকে। 'সুপারিনটেনডেন্ট ডোলান, ইনি আমার বন্ধু... মি. ম্যালকম রস।'

'চিনি ওঁকে,' একটু হেসে বললেন সুপারিনটেনডেন্ট। 'মি. রস-ও হয়তো চিনবেন আমাকে... ব্রিক্সটনের সেই মুদ্রার কেসটাতে একসঙ্গে কাজ করেছি আমরা।'

সচকিত হয়ে উঠলাম। এতক্ষণ মার্গারেটের দিকে মনোযোগ ছিল বলে ভদ্রলোককে ঠিকমত খেয়াল করিনি। এবার তাকাতেই চিনে ফেললাম। ভদ্রতাসূচক হাসি হেসে বললাম, 'অবশ্যই, সুপারিনটেনডেন্ট। খুব ভালমতই মনে আছে আপনাকে।'

এগিয়ে গিয়ে হাত মেলালাম ভদ্রলোকের সঙ্গে। আড়চোখে মার্গারেটকে উসখুস করতে দেখলাম—আমরা দুজন পূর্ব-পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও কেন যেন অস্বস্তি বোধ করছে ও। কারণটা অনুমান করতে অসুবিধে হলো না। তাই ডোলানকে বললাম, 'যদি কিছু মনে না করেন, আমি মিস ট্রেলনির সঙ্গে একটু একান্তে কথা বলতে চাই। আপনি তো সব শুনেই ফেলেছেন, আবার শোনার নিশ্চয়ই প্রয়োজন নেই? আমি ব্যাপারটা জেনে নিয়ে নাহয় আপনার সঙ্গে আলোচনা করব...'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই...' তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন সুপারিনটেনডেন্ট। 'যান, কথা বলুন আপনারা। আমি এখানেই আছি। দরকার হলে ডাকবেন আমাকে।'

ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে মার্গারেটের পিছু নিলাম। হলঘরের একপাশের দরজা খুলে ছিমছামভাবে সাজানো একটা

রুমে আমাকে নিয়ে গেল ও। ওটা বাড়ির পিছনের অংশ; জানালা দিয়ে পিছনের বাগানটা দেখা যায় ওখান থেকে।

দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে মার্গারেট বলল, 'এই বিপদের সময় আমাকে সাহায্য করতে আসায় কী যে খুশি হয়েছি, তা কল্পনাও করতে পারবে না তুমি, ম্যালকম...'

বাধা দিলাম আমি। 'ধন্যবাদটা পরে দাও। আগে পুরো ঘটনাটা শোনাও আমাকে। তা হলেই না বুঝব, আসলে সাহায্য করতে পারব কি পারব না।'

'ঠিক আছে, বলছি,' বলতে শুরু করল মার্গারেট। 'রাতে একটা শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আমার—কীসের শব্দ, তা বলতে পারব না। হঠাৎ শুধু টের পেলাম—ঘুম ভেঙে গেছে, বুক ধড়ফড় করছে। শব্দটা আবার শোনার জন্য কান পাতলাম বাবার রুমের দিকে; কিন্তু যা শুনলাম, তা ঠিক স্বাভাবিক নয়। ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি—বাবার রুমটা আমার রুমের ঠিক পাশেই। প্রায় রাতেই ঘুমোনোর আগে ওঁর রুম থেকে হাঁটাচলার শব্দ পাই আমি—বাবা বেশ রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন, কাজ করেন। মাঝে মাঝে তো ঘুমানই না! ভোরে জেগে উঠে কয়েকবারই ওই হাঁটাচলার শব্দ শুনেছি আমি। এ-নিয়ে অনেক বোঝাতে চেয়েছি বাবাকে—এভাবে রাত জাগা ওঁর শরীরের জন্য ভাল নয়; কিন্তু লাভ হয়নি। বাবা যে কেমন একগুঁয়ে, তা তো আগে বলেছি তোমাকে। চুপচাপ যখন ঘাড়-ত্যাড়ামি করে, তখন রীতিমত ভয়ই লাগে আমার; এরচেয়ে খেপে গেলেই বরং বেশি স্বস্তি পাই। অবাক হচ্ছ? কিন্তু নিজ চোখে দৃশ্যটা দেখলে আর অবাক হতে না। চুপ করে থাকে ঠিকই, কিন্তু ঠোঁটের কোনাদুটো বেঁকে যেতে থাকে... দাঁত বেরিয়ে পড়ে... সে-এক ভয়াবহ দৃশ্য।

'যা হোক, ঘুম ভেঙে যাওয়ায় উঠে পড়লাম আমি। পা টিপে টিপে চলে গেলাম বাবার রুমের দরজার সামনে। ভয় হচ্ছিল,

কাজের সময় বিরক্ত করলে উনি রেগে যান কি না; তবে এরচেয়ে বেশি ভয় লাগছিল ভিতরের শব্দটার কারণে। স্বাভাবিক হাঁটাচলার শব্দ ছিল না ওটা, কারও কণ্ঠও নয়; শুধু মেঝেতে কিছু একটা ঘষটানোর শব্দ, সেইসঙ্গে যেন আস্তে আস্তে ভারী শ্বাস ফেলছে কেউ। কী যে ভয় করছিল, বোঝাতে পারব না। অন্ধকারের ভিতর দাঁড়িয়ে থাকা, আর কানে বাজতে থাকা অমন অদ্ভুত আওয়াজ... পরিস্থিতিটায় তুমি নিজে না পড়লে বুঝতে পারবে না।

'শেষ পর্যন্ত সাহস সঞ্চয় করে হাতল ঘোরালাম, দরজাটা সামান্য ফাঁকা করে উঁকি দিলাম ভিতরে। গাঢ় অন্ধকারে শুধু জানালার আকৃতি ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না, তবে ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দটা আরও পরিষ্কারভাবে কানে বাজল। কান পেতে রইলাম, তবে আর কোনও আওয়াজ পেলাম না। কী করব বুঝতে পারলাম না, মনে হচ্ছিল—ওপাশে ভয়ঙ্কর কিছু একটা অপেক্ষা করছে আমার জন্য, দরজা খুললেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকাও চলে না; তাই লম্বা করে দম নিলাম, তারপর এক ঝটকায় খুলে ফেললাম পুরো দরজা—ওপাশে যদি কেউ থাকেই, তাকে চমকে দেবার জন্য। তবে তেমন কিছু ঘটল না।

'সাহস ফিরে পেলাম কিছুটা, ভিতরে ঢুকে বাতি জ্বাললাম, তাকালাম খাটের দিকে। শূন্য বিছানা, তবে এলোমেলো চাদর দেখে বুঝতে পারলাম—বাবা শুয়েছিল ওখানে। ঠিক মাঝখানটায় লাল কী যেন দেখতে পেলাম, চলে গেছে বিছানার প্রায় কিনারা পর্যন্ত। ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাবার আগেই আবার ভারী শ্বাসের শব্দটা কানে এল, সেটা অনুসরণ করে মাথা ঘোরাতেই বুক খামচে ধরল কী যেন।

'বাবাকে দেখতে পেলাম মেঝেতে—কাত হয়ে এমনভাবে পড়ে আছে, যেন একটা লাশ... ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে!

এতক্ষণে বুঝলাম, লাল জিনিসটা আসলে রক্ত... ওটা বিছানার দিক থেকে শুরু হয়ে বাবার দেহ পর্যন্ত পৌঁছেছে, মেঝেতে জমে আছে থিকথিকে হয়ে। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম ওঁর কাছে। রুমের বড় সেফটার সামনে পড়ে ছিল বাবা, পরনে রাতের পোশাক—বাম হাতাটা ছিঁড়ে গেছে। ভয়ঙ্কর একটা দৃশ্য, নিজেকে সামলে তাড়াতাড়ি ওঁকে পরীক্ষা করলাম। দেখলাম, বাবার বাম হাতটা সেফের দিকে বাড়ানো... কবজিতে একটা শেকলের তৈরি সোনার বালার মত জিনিস-পরা, ওটারই চারপাশের মাংস ছিঁড়ে-কেটে গেছে বিশ্রীভাবে... রক্ত বেরুচ্ছে অবিরাম। ভয় তো পেয়েছি আগেই, এবার অবাকও হলাম; কারণ বাবা যে এমন অদ্ভুত একটা জিনিস হাতে পরে, সেটাই জানা ছিল না আমার।'

দম নেয়ার জন্য একটু থামল মার্গারেট। এই সুযোগে আমি সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলাম। বললাম, 'ওটা দেখে অবাক হবার কিছু নেই। আজকাল অনেক পুরুষই সোনার ব্রেসলেট পরে—নতুন ফ্যাশন বলতে পারো। আমি নিজেই একজন জজ সাহেবের হাতে অমন জিনিস দেখেছি।'

কথাটা মার্গারেটের উপর খুব একটা প্রভাব ফেলল বলে মনে হলো না। ইতোমধ্যে নিজেকে অনেকটাই সামলে নিয়েছে ও, মুখ খুলে শান্ত স্বরে খেই ধরল কাহিনির, 'আমি আর দেরি করিনি, বুঝতে পারছিলাম—জলদি কিছু একটা না করলে রক্তক্ষরণেই মরবে বাবা। তাই ঘণ্টা বাজিয়ে তাড়াতাড়ি চাকর-বাকরদের ডাকলাম, সবাই মিলে বাবাকে ধরাধরি করে শোয়ালাম একটা সোফায়। আমাদের হাউসকিপার... মিসেস গ্র্যান্ট, প্রাথমিক চিকিৎসা জানে, পরিষ্কার একটা রুমাল দিয়ে হাতের ক্ষতটা বেঁধে দিল। রক্তপাত বন্ধ হতেই দুজন চাকরকে পাঠিয়ে দিয়েছি আমি ডাক্তার আর পুলিশকে খবর দেয়ার জন্য। ওরা চলে যেতেই কেমন একা-একা লাগল, মনে পড়ল তোমার কথা। তাই

খানসামাকে একটা চিঠি আর ক্যারিজ দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম তোমাকে নিয়ে আসবার জন্য...'

আবার থামল মার্গারেট, কথা গুছিয়ে নিচ্ছে। আমি এবার কিছু বললাম না, শুধু নীরবে তাকালাম ওর দিকে। ওর প্রতি আমার মনোভাবটা হয়তো ফুটে উঠল দৃষ্টিতে, চোখে চোখ পড়তেই মার্গারেট মুখ নিচু করে ফেলল—গালদুটো লাল হয়ে উঠেছে। খানিক পর আবার বলতে থাকল ও, 'ডাক্তার সাহেব খুব তাড়াতাড়ি এসেছেন, খবর পেয়েই পড়িমরি করে ছুট লাগিয়েছেন তিনি। এখানে পৌঁছে বাবার হাতে ড্রেসিং করেছেন, তারপর দরকারি ওষুধ আর ডাক্তারি সরঞ্জাম আনতে ফিরে গেছেন বাড়িতে। শীঘ্রি চলে আসবেন আবার। উনি চলে যাবার পর এসেছে পুলিশ, অবস্থা দেখে ওরা হেডকোয়ার্টারে খবর পাঠিয়েছে, সেটা শুনে সুপারিনটেনডেন্ট ডোলান নিজে চলে এসেছেন। ওঁর পর এসেছ তুমি।'

কথা শেষ হয়েছে মার্গারেটের, নিজের হাতে ওর হাত তুলে নিয়ে অভয়ের হাসি হাসলাম, তারপর দুজনে ফিরে গেলাম হলঘরে।

আমাদের এগোতে দেখে সুপারিনটেনডেন্ট বললেন, 'সবকিছু আমি নিজে পরীক্ষা করে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে রিপোর্ট পাঠিয়েছি, মিস ট্রেলনি। তবে কয়েকটা জিনিস খুব খাপছাড়া ঠেকছে। আমার মনে হয়, ব্যাপারটা সিআইডি-কে দিয়ে তদন্ত করালে বেশি ভাল হয়। সার্জেন্ট ড-কে আসবার জন্য খবর পাঠিয়েছি আমি, ও ওখানকার সেরা লোক। মি. রস বোধহয় চিনবেন ওকে—ওই যে... হক্সটনের সেই মার্কিন ভদ্রলোককে বিষ খাওয়ানোর কেসটার কথা মনে আছে?'

'হ্যাঁ, খুব ভালই মনে আছে সার্জেন্ট ড-কে,' মাথা ঝাঁকালাম আমি। 'অত্যন্ত যোগ্য লোক—সৎ, দক্ষ। খুব বুদ্ধিমান। কয়েকটা

কেসে সাহায্য পেয়েছি ওঁর।'

'ওর ব্যাপারে তা হলে আপত্তি নেই আপনার? খুব ভাল। খবর চলে গেছে, যে-কোনও মুহূর্তে এসে পড়বে ও।'

দরজায় শব্দ হলো, কয়েক মুহূর্ত পরই ডাক্তারি ব্যাগ নিয়ে অল্পবয়েসী এক যুবক উদয় হলো। তীক্ষ্ণ চেহারা, সুদর্শন, দুচোখে বুদ্ধির ঝিলিক। কপালটা একটু বড়, তবে দেখতে খারাপ লাগে না, বরং তাকে জ্ঞানী বলে মনে হয়। মার্গারেট আমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিল।

'ডা. উইনচেস্টার, ইনি হচ্ছেন আমার বন্ধু—মি. ম্যালকম রস। আর ইনি... স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সুপারিনটেনডেণ্ট ডোলান।'

করমর্দন করলাম আমরা। ডাক্তার খুব করিৎকর্মা মানুষ, অভিবাদন-পর্ব শেষ হতেই বললেন, 'চলুন, মি. ট্রেলনির কাছে যাই। ওঁর চিকিৎসা বাকি আছে এখনও।'

সবাই মিলে দোতলায় উঠে এলাম আমরা, মার্গারেটের বাবার ঘরে ঢুকলাম। চারপাশে নজর বোলালাম আমি—যা শুনেছি, তার সঙ্গে একবিন্দু অমিল দেখতে পেলাম না। বিছানা আর মেঝেতে রক্তের দাগ... কালচে হতে শুরু করেছে। একপাশে সোফায় শুয়ে আছেন অচেতন মি. ট্রেলনি। পুরো ঘরটা ভর্তি নানা রকম মিশরীয় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দিয়ে, ছোট-বড়... সব রকমই আছে। ওসবের কড়া গন্ধ ভাসছে পুরো ঘরে।

পুরনো ব্যাণ্ডেজটা খুলে ফেলে ক্ষত পরিষ্কার করতে শুরু করলেন ডাক্তার। একটু পরেই সুপারিনটেনডেণ্টকে কাছে ডাকলেন তিনি, ক্ষতটা দেখালেন।

'এই দেখুন, কাটাগুলো সমান্তরাল—কবজির বাম দিক থেকে শুরু হয়েছে, রেডিয়াল আর্টারির দফা-রফা করে দিয়েছে। ছোট ক্ষতগুলো দেখুন, আমার ধারণা—ভোঁতা কোনও অস্ত্রের আঘাতে হয়েছে এগুলো। চামড়া কেটেছে আঁকাবাঁকা হয়ে, অস্ত্রটা ধারালো

হলে ক্ষতের কিনারা একেবারে সমান হতো।'

'হুম!' ব্যাপারটা নোটবুকে টুকে নিলেন ডোলান।

মার্গারেটের দিকে তাকালেন ডাক্তার। 'হাতের এই ব্রেসলেটটা কি খুলে নেব? না নিলেও চলে অবশ্য, নীচের দিকে ঝুলে থাকবে... ব্যাণ্ডেজে কোনও অসুবিধে হবে না। জিনিসটা কি ওঁর খুব প্রিয়?'

চেহারায় বিব্রতভাব ফুটল মার্গারেটের। নিচু গলায় বলল, 'আ... আমি ঠিক জানি না। আসলে বেশিদিন হয়নি বাবার সঙ্গে থাকতে শুরু করেছি, ওঁর পছন্দ-অপছন্দ বা জীবনযাত্রা সম্পর্কে খুব কমই জানি আমি।'

অবাক হবার কিছু নেই। মি. ট্রেলনির সঙ্গে স্ত্রী মারা গেছেন মার্গারেটকে জন্ম দিতে গিয়ে। ভদ্রলোক নিজের পেশা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলেন যে শিশু-সন্তানকে দেখাশোনা করবার সময় ছিল না। দূর সম্পর্কের এক খালার কাছে বড় হয়েছে মার্গারেট, বছরখানেক হলো ফিরে এসেছে বাবার কাছে।

আশ্বস্ত করবার ভঙ্গিতে হাসলেন ডাক্তার। 'থাক, আর বলতে হবে না। আমারই আসলে প্রশ্নটা করা উচিত হয়নি। আপনি এ-নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না। দরকার যেহেতু নেই, তাই ব্রেসলেটটা আপাতত ওভাবেই থাকুক। ওটা পরে থাকার পিছনে মি. ট্রেলনির নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য আছে। যতক্ষণ না সেটা জানতে পারছি, ততক্ষণ ওটায় আর হাত দেব না। প্রয়োজন হলে পরে নাহয় খুলে নেয়া যাবে।' ব্রেসলেটের দিকে নজর ফেরালেন তিনি, পরমুহূর্তে বিস্ময় ফুটল কণ্ঠে। 'আরে, এটার সঙ্গে দেখি একটা ছোট্ট চাবি আছে!'

আমার হাতে একটা মোমবাতি আছে, ওটা কাছে নিয়ে ধরতে ইশারা করলেন ডাক্তার; তারপর পকেট থেকে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে ব্রেসলেটটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলেন।

মিনিট পাঁচেক চলল এই পর্যবেক্ষণ, শেষে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গ্লাসটা সুপারিনটেনডেন্ট ডোলানের হাতে তুলে দিলেন তিনি। বললেন, 'আপনি নিজেই দেখুন—এটা কোনও সাধারণ ব্রেসলেট না। ক্ষয়ে যাওয়া জায়গাগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে—তিন পরত লোহার উপর সোনার প্রলেপ দেয়া হয়েছে। এটা সহজে খোলার জিনিস না, সাধারণ করাত বা ছেনি দিয়ে কাটা যাবে না ব্রেসলেটটা।'

ভ্রূকুটি দেখা দিল ডোলানের কপালে, নিচু হয়ে অলঙ্কারটা কিছুক্ষণ দেখলেন তিনি, তারপর সোজা হয়ে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা আমাকে দিলেন। মার্গারেটকে ইশারা করে বললেন, 'আপনারা দুজনও দেখুন—বড়ই অদ্ভুত জিনিস।'

গ্লাসটা মার্গারেটের দিকে বাড়িয়ে দিলাম আমি, কিন্তু ও সজোরে মাথা নাড়ল। বলল, 'আমি দেখব না। বাবা যদি ওটা আমাকে দেখাতে চাইত, তা হলে তো বহু আগেই দেখাতে পারত। ওঁর ইচ্ছেকে সম্মান দেখাতে চাই আমি। তবে তোমার বেলায় কোনও বাধা নেই, ম্যালকম। তুমি দেখতে পারো।'

একটু পিছু হটে উল্টো ঘুরল ও, পিছন থেকে পিঠটা কেঁপে উঠতে দেখলাম—কাঁদছে মার্গারেট। ওর মনের অবস্থা বুঝতে কষ্ট হলো না। বাবার সঙ্গে সত্যিকার অর্থে পরিচয় ছিল না বেচারির, ব্যাপারটা কষ্টকর। আরও কষ্টকর হচ্ছে, পিতা-কন্যার এই দূরত্ব এমন একটা মুহূর্তে বাইরের লোকের সামনে প্রকাশ হয়ে যাওয়া। কীভাবে ওকে সান্ত্বনা দেব বুঝতে পারলাম না, তাই নিচু হয়ে ব্রেসলেটটার উপর ঝুঁকে পড়লাম। আমার দেখা শেষ হতেই আবার সোফার পাশে অবস্থান নিলেন ডা. উইনচেস্টার, ব্যস্ত হয়ে পড়লেন রোগীর সেবা-শুশ্রূষায়।

'দক্ষ লোক,' আমার কাছে এসে নিচু সুরে মন্তব্য করলেন সুপারিনটেনডেন্ট ডোলান। 'চোখের নজরও খুব চোখা। এমন

ডাক্তার পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকিয়ে একমত হলাম আমি। আর ঠিক তখুনি দরজায় মৃদু করাঘাত করল কে যেন।

ঠক্! ঠক্! ঠক্!

দুই

অদ্ভুত নির্দেশ

এগিয়ে গিয়ে বেডরুমের দরজাটা আস্তে করে খুললেন সুপারিনটেনডেন্ট ডোলান, আমরা কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে রইলাম। স্বস্তি ফুটল তাঁর চেহারায়, পরমুহূর্তে ফিটফাট পোশাকের এক যুবক ঢুকল ভিতরে। নিখুঁতভাবে দাড়ি-গোঁফ কামানো, ফর্সা চামড়া, চেহারায় ঈগলের তীক্ষ্ণতা, দু'চোখে বুদ্ধির ঝিলিক। দেহটা অ্যাথলিটের মত। উল্লসিত ভঙ্গিতে যুবকটির সঙ্গে হাত মেলালেন সুপারিনটেনডেন্ট।

'আপনার পাঠানো খবর পেয়েই ছুটে এসেছি, সার,' বলল যুবক। 'আমার উপর আজও আপনার আস্থা আছে জেনে খুব খুশি হয়েছি।'

'সেটা সারাজীবনই থাকবে,' হাসিমুখে বললেন ডোলান। 'বাউ স্ট্রিটের সেই দিনগুলির কথা কোনোদিনই ভুলতে পারব না, তুমি অনেক সাহায্য করেছ আমাকে। এসো, সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

দ্রুত পরিচয়পর্ব সারলেন সুপারিনটেনডেন্ট। যুবককে আমি চিনি—সার্জেন্ট ড, সিআইডি-র লোক। একটু আগে এর কথাই বলছিলেন ডোলান। ড-ও চিনতে পারল আমাকে। হক্সটনের কেসে একসঙ্গে কাজ করেছি আমরা। হাত মেলালাম দুজনে।

আনুষ্ঠানিকতা শেষ হতেই সার্জেন্টকে সবকিছু খুলে বললেন সুপারিনটেনডেন্ট। মনোযোগী শ্রোতার মত সব শুনল ড, কথার মাঝখানে কথা বলল না। দু-একটা ছোটখাট জিজ্ঞাস্য যা ছিল, সেগুলো পরিষ্কার করে নিল ডোলানের কথা শেষ হবার পর।

'কাজেই বুঝতে পারছ, ড, আমি এই কেসটার সম্পূর্ণ ভার তোমার উপর ছেড়ে দিচ্ছি,' সবশেষে বললেন সুপারিনটেনডেন্ট।

'তদারকির জন্য আপনি থাকছেন নিশ্চয়ই?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়লেন ডোলান। 'আমার হাজারটা কাজ আছে, এই একটা কেসের পিছনে লেগে থাকবার সময় নেই। সময় সময় সাহায্য করতে পারলে খুশি হব, তবে তদন্তের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তোমার।'

'ইয়েস, সার,' স্যালুট ঠুকে নির্দেশটা মেনে নিল সার্জেন্ট। কাজের মানুষ সে... অত্যন্ত সিরিয়াস, একটুও দেরি করল না, সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ল তদন্তে।

প্রথমেই ডা. উইনচেস্টারের কাছে গিয়ে তার নাম-ঠিকানা লিখে নিল ড। মি. ট্রেলনির আঘাতের বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট আর ঘটনা সম্পর্কে তাঁর ভাষ্য লিখিতভাবে চাইল। আপত্তি করলেন না ডাক্তার, মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হয়ে গেলেন।

'আপনাদের ডাক্তারকে আমার পছন্দ হয়েছে,' কাছে এসে আমাকে বলল ড। কারণটা পরিষ্কার, পুলিশের কাছে লিখিত রিপোর্ট দিতে বেশিরভাগ চিকিৎসকই গড়িমসি করে। 'মনে হচ্ছে একসঙ্গে কাজ করতে অসুবিধে হবে না আমাদের।'

মার্গারেটের দিকে ফিরল সে। 'আপনার বাবা সম্পর্কে

আমাকে কিছু বলুন, মিস ট্রেলনি। কেমন মানুষ তিনি, কী ধরনের জীবনযাপন করেন, কীসে তাঁর আগ্রহ, অস্বাভাবিক কোনও কিছুর সঙ্গে তিনি জড়িত কি না...'

অসহায় দেখাল মার্গারেটকে, আমি ওর হয়ে জবাব দিতে চাইলাম, কিন্তু হাত তুলে বাধা দিল ও। তারপর নিজেকে সামলে বলল, 'দুঃখিত, সার্জেন্ট। বাবার সম্পর্কে খুব কমই জানি আমি, সে-কথা ইতোমধ্যে সুপারিনটেনডেন্ট ডোলান আর মি. রসকে বলেছি।'

'সেক্ষেত্রে ঘটনাটা সম্পর্কে বলুন। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আপনি ঘরের ভিতরে শব্দ শুনেছেন, তাই না?'

'জী না, আমার ঘর থেকে প্রথমে অস্পষ্ট আওয়াজ পেয়েছি। সেজন্যেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কী ঘটেছে দেখার জন্য বেরিয়ে আসি। বাবার রুমের সামনে যখন আসি, তখন সিঁড়ির ল্যাণ্ডিং আর উপরের অংশটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার নজর এড়িয়ে কেউ রুম থেকে বেরুতে পেরেছে কি না, এটাই জানতে চাইছেন তো? না, বেরোয়নি কেউ। বেরুলে ঠিকই দেখতে পেতাম।'

'আপনি বুদ্ধিমতী,' হাসল ড। 'ওটাই আসলে জানতে চাইছিলাম আমি। নিশ্চিন্ত থাকুন, সবাই যদি সত্যি কথা বলে, তা হলে রহস্যটা ভেদ করতে বেশি সময় লাগবে না।'

খাটের দিকে এগিয়ে গেল সে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কী যেন দেখল কয়েক মুহূর্ত, তারপর প্রশ্ন করল, 'বিছানায় কি কেউ হাত দিয়েছে, মিস ট্রেলনি?'

'আমি দিইনি,' বলল মার্গারেট। 'তবে মিসেস গ্র্যাণ্টকে জিজ্ঞেস করে দেখা যেতে পারে।'

'ডাকুন তাকে।'

ঘণ্টি বাজাল মার্গারেট, একটু পরেই হাজির হলো বয়স্কা

boiRboi.net

হাউসকিপার। সার্জেন্টকে পরিচয় করিয়ে দিল মার্গারেট, বলল, 'এই ভদ্রলোক জানতে চাইছেন, বাবার বিছানায় কেউ হাত দিয়েছে কি না।'

'আমি দিইনি, ম্যা'ম,' বলল মিসেস গ্র্যান্ট। 'আর কাউকেও এটার কাছে ঘেঁষতে দেখিনি।'

'তা হলে আর কেউই হাত লাগায়নি, সার্জেন্ট,' মার্গারেট বলল। 'সারাক্ষণই আমি বা মিসেস গ্র্যান্ট এ-ঘরে ছিলাম। চাকরদের কেউই বিছানার কাছে যায়নি। বাবা পড়ে ছিলেন সেফের সামনে, ওঁকে ধরাধরি করে সোফায় নিয়ে গেছি আমরা, তারপর চাকরদের পাঠিয়ে দিয়েছিলাম নীচে।'

'হুম। আপনারা একটু দূরে দাঁড়ান।' বিছানার দিকে আবার এগিয়ে গেল ড। পকেট থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে প্রতিটা ভাঁজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল। বিছানা শেষ করে একটু পর মেঝে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। খাটের কিনারা থেকে যেখানটায় রক্ত গড়িয়ে পড়েছে, সেখানটা দেখল ভাল করে, তারপর দক্ষ ট্র্যাকারের মত রক্তের দাগ অনুসরণ করল। হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গিতে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোল সার্জেন্ট, থামল গিয়ে সেফের সামনে—মি. ট্রেলনি ওখানেই পড়ে ছিলেন। জায়গাটার আশপাশ খুব ভালমত পরীক্ষা করল সে, তবে মুখ দেখে বুঝলাম—উল্লেখযোগ্য কিছুই পায়নি।

এবার সেফ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ড। ওটা বন্ধ; তাই ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে বাইরে থেকে পাল্লা, তালা, হাতল—সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। সবশেষে সে এগিয়ে গেল জানালার দিকে—পাল্লাদুটো ছিটকিনির সাহায্যে শক্ত করে বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

'শাটারগুলো কি টানা ছিল?' জানতে চাইল সে।

নেতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মার্গারেট।

সার্জেন্টের তদন্তকাজের দিকে ডা. উইনচেস্টারের মনোযোগ নেই। মি. ট্রেলনির হাতের ক্ষতটা ড্রেসিং করছেন তিনি, মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করছেন সারা দেহ। কয়েকবার রোগীর মুখের কাছে নাক নিতে দেখলাম তাঁকে—গন্ধ শুঁকছেন, তারপর যেন অসচেতনভাবেই দৃষ্টি বোলাচ্ছেন রুমের আনাচে-কানাচে। মনে হলো, কিছু খুঁজছেন তিনি।

ব্যাপারটা নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবার সুযোগ পেলাম না, তার আগেই সার্জেন্ট ড গমগমে গলায় বলে উঠল, 'যদ্দূর বুঝতে পারছি, ব্রেসলেটের চাবিটাকে সেফ পর্যন্ত আনার জন্যই এত কাণ্ড! মি. ট্রেলনিকে অজ্ঞান করা হয়েছে, তারপর টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসা হয়েছে এখান পর্যন্ত। তবে তালাটা অদ্ভুত—সাতটা অক্ষরের কম্বিনেশন... কম্বিনেশনটাকেও আবার লক করে রাখার একটা ব্যবস্থা আছে। জিনিসটা *চ্যাটউড* কোম্পানির তৈরি, ওদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।' ডাক্তারের দিকে ফিরল সে। 'ডা. উইনচেস্টার, লিখিত রিপোর্টের আগে আমাকে কিছু জানাতে পারেন? জানি, পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার আছে, তবে এখুনি দু-একটা তথ্য পেলে খুব উপকার হয়।'

'নিশ্চয়ই,' উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার। 'খুব বেশি কিছু জানতে পারিনি অবশ্য, তবে যতটুকু বুঝতে পেরেছি, তা-ই বলছি। পেশেন্টের মাথায় কোনও আঘাতের চিহ্ন পাইনি আমি। তারপরও ভদ্রলোক যেভাবে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন, তাতে দুটো সন্দেহ জাগে—হয় তাঁকে ওষুধের সাহায্যে অজ্ঞান করা হয়েছে, নয়তো তিনি সম্মোহনের শিকার হয়েছেন। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা ক্ষীণ, আবার পরিচিত কোনও ওষুধেরও গন্ধ পাচ্ছি না। অবশ্য...' ঘরভর্তি আর্টিফ্যাক্টগুলোর দিকে ইশারা করলেন তিনি, 'সারা ঘর কেমন মমি-মমি টাইপের গন্ধে ভরে আছে, তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। এর ভিতর ওষুধের গন্ধ বোঝা খুবই মুশকিল।'

'উপসর্গ দেখে কিছু আঁচ করতে পারছেন না?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'উঁহুঁ,' মাথা দোলালেন ডাক্তার। 'নতুন ধরনের ড্রাগ হতে পারে, সিম্পটমগুলো আমার পরিচিত নয়। আরেকটা চিন্তাও মাথায় উঁকি দিচ্ছে। হাতে যে-আঘাতটা দেখছি, ওটা অদ্ভুত... হয়তো ওষুধের প্রভাবে নিজেই নিজেকে আহত করে বসেছেন মি. ট্রেলনি। সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়।'

'তা হলে তো যে-অস্ত্র দিয়ে উনি নিজের হাত কেটেছেন, সেটা পাওয়া যেত পাশে।'

'অজ্ঞান হবার আগে লুকিয়ে ফেলেছেন হয়তো,' বললেন ডাক্তার। 'নতুন ধরনের ড্রাগ হলে ওটার প্রভাব সম্পর্কে কিছুই জানি না আমরা। সবই সম্ভব।'

'যুক্তি আছে আপনার কথায়,' স্বীকার করল ড। 'অস্ত্রটা খুঁজে দেখব আমরা। আগেই পাওয়া গেল না কেন, সেটা একটা প্রশ্ন বটে...'

'সেফে ঢুকিয়ে রাখা হয়নি তো?' বোকার মত বলে বসলাম আমি।

'নাহ্,' মাথা নাড়লেন ডাক্তার। 'তা হলে তো ডালায় রক্ত লেগে থাকত।'

'সে যা-ই হোক, ওটা এখানে আছে বলে মনে হচ্ছে না,' ড বলল। 'থাকলে এতক্ষণে চোখে পড়ত। সময় নিয়ে পুরো বাড়িতে তল্লাশি চালাতে হবে।'

'আমি কি কিছুক্ষণের জন্য যেতে পারি?' বললেন ডাক্তার। 'মি. ট্রেলনির জন্য একজন নার্স দরকার, বোধহয় নিয়ে আসতে পারব।'

'নিশ্চয়ই! যান।'

মার্গারেটের দিকে তাকালেন ডাক্তার। 'আমি না ফেরা পর্যন্ত

আপনারা কেউ একজন সারাক্ষণ রোগীর সঙ্গে থাকুন। আপনি বা মিসেস গ্র্যান্ট হলে ভাল হয়। পারবেন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল মার্গারেট।

'গুড,' বলল ডাক্তার। 'আপাতত এভাবেই থাকুন উনি। আমি ফিরে এলে নাহয় অন্য কোনও রুমে নিয়ে যাব।' কী করতে হবে, সে-বিষয়ে কিছু নির্দেশনা দিলেন তিনি। সব শুনে সোফায় গিয়ে বসল মার্গারেট, পিতার পাশে।

সুপারিনটেনডেন্ট ডোলানও এগিয়ে গেলেন সার্জেন্ট ড-র দিকে। বললেন, 'আমিও স্টেশনে ফিরে যেতে চাই... যদি তোমার অসুবিধে না থাকে আর কী।'

'না, না, অসুবিধে কীসের?' তাড়াতাড়ি বলল ড। 'ইয়ে... জনি রাইট কি এখনও আপনার ডিভিশনে আছে?'

'হ্যাঁ। কেন, ওকে দরকার?'

ইতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা ঝোঁকাল ড।

'ঠিক আছে, যত দ্রুত সম্ভব পাঠিয়ে দেব ওকে। তোমার সঙ্গেই থাকবে এ-কেস শেষ না হওয়া পর্যন্ত।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, সার,' সুপারিনটেনডেন্টকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে বলল ড। 'আপনার সঙ্গে কাজ করবার আনন্দই অন্যরকম। সহযোগিতার ব্যাপারে কার্পণ্য করেন না কখনও।'

মৃদু হেসে বিদায় নিলেন ডোলান, ডা. উইনচেস্টার সঙ্গ দিলেন তাঁকে। ড ফিরে এসে বলল, 'মিস ট্রেলনি, আমিও একটু বেরুব। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গিয়ে আমার চিফের কাছে রিপোর্ট করতে হবে। চ্যাটউড কোম্পানির সঙ্গেও কথা বলব। চিন্তা করবেন না, যত দ্রুত সম্ভব ফিরে আসব আমি। আর ইয়ে... যদি আপত্তি না থাকে তো, আমি আগামী দু-তিনদিন এ-বাড়িতেই কাটাতে চাই। রহস্যটা সমাধান করতে সুবিধে হবে তা হলে...'

'আপত্তি কীসের?' বলল মার্গারেট। 'আপনি থাকলে আমি বরং সাহস পাব।'

ঘুরতে গিয়ে থেমে গেল সার্জেন্ট। ঘরের এক কোণের চেয়ার-টেবিলের উপর নজর পড়েছে। বলল, 'যাবার আগে আপনার অনুমতি নিয়ে আমি মি. ট্রেলনির ডেস্কটা একটু তল্লাশি করতে চাই, ম্যা'ম। জরুরি কোনও সূত্র পাওয়া যেতে পারে।'

'নিশ্চয়ই,' মার্গারেট বলল। 'এই জঘন্য ঘটনাটার রহস্য ভেদ করবার জন্য যে-কোনও কিছু করতে পারেন আপনি।'

খুব সাবধানে ডেস্কটেবিলে তল্লাশি চালাল সার্জেন্ট। উপরের প্রতিটা ইঞ্চি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, কাগজপত্র উল্টাল, তারপর হাত দিল ড্রয়ারে। একটু পরেই ফিরে এল সে, হাতে একটা মুখবন্ধ খাম, ওটা তুলে দিল মার্গারেটের হাতে।

'আরে! এ দেখি বাবার লেখা চিঠি... আমার কাছে!' খামের উপরের লেখাটা দেখে বিস্মিত গলায় বলে উঠল মার্গারেট। তাড়াতাড়ি খামটা খুলল ও, পড়তে শুরু করল চিঠিটা। ওর মুখের ভাব বদলে যেতে দেখলাম, লক্ষ করলাম—সার্জেন্ট ড-ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করে চলেছে ওকে। বুঝতে পারলাম, লোকটা মার্গারেটকে সন্দেহের তালিকায় রেখেছে।

পড়া শেষ করে কিছুক্ষণ স্থবির হয়ে রইল মার্গারেট, মাথা তুলল না। একটু পর মনোযোগ দিয়ে আবার পড়ল চিঠিটা, এবার চেহারায় অভিব্যক্তিগুলো আরও প্রকট হতে দেখলাম। পড়া শেষ করে চিঠিটা সার্জেন্টের হাতে তুলে দিল ও, লোকটা নির্বিকার ভঙ্গিতে পড়ল ওটা... ঠিক মার্গারেটের মত... পর পর দু'বার। তারপর ফিরিয়ে দিল।

এবার আমার হাতে চিঠিটা তুলে দিল মার্গারেট, পলকের জন্য ওর ফ্যাকাসে চেহারায় রক্তের আভা ফুটতে দেখলাম—কেন, কে জানে। ও নিয়ে মাথা ঘামালাম না অবশ্য; কৌতূহলী হয়ে

উঠেছিলাম, তাড়াতাড়ি পড়লাম চিঠিটাঃ

প্রিয় মার্গারেট,

শুরুতেই এ-চিঠিকে অলঙ্ঘনীয় একটি নির্দেশ হিসেবে গণ্য করো। আমার কপালে যা-ই ঘটুক, এটার বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় ঘটানো চলবে না। যদি আমি কোনও ধরনের দুর্ভাগ্যের শিকার হয়ে থাকি... অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, কিংবা হামলার কারণে... তা হলে এ-নির্দেশনা তোমাকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে। কী অবস্থায় থাকব আমি, জানি না; তবে জীবিত বা মৃত... যেটাই হোক, আমাকে আমার রুমে রাখতে হবে তোমাকে... সেই সময় পর্যন্ত, যতক্ষণ না আমার জ্ঞান ফিরে আসছে, বা আমি নিজের মুখে নতুন নির্দেশ দিতে পারছি, কিংবা আমাকে কবর দেয়া হচ্ছে। আমাকে একা রাখা চলবে না... এক মুহূর্তের জন্যও নয়। সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত অন্তত দুজন মানুষ সর্বক্ষণ আমার পাহারায় থাকতে হবে। একজন অভিজ্ঞ নার্স রাখতে পারো, সময় সময় আমার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে সে, দরকার হলে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। যদি আমি মারা যাই, তা হলে কী করতে হবে, সে-ব্যাপারে আমার আইনি প্রতিনিধি—২৭ বি, লিঙ্কন ইনের মারভিন অ্যাণ্ড জিউক্সের কাছে বিস্তারিত নির্দেশ পাবে। মি. মারভিন ব্যক্তিগতভাবে আমার শেষ ইচ্ছা বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিয়েছেন। তোমার জন্য একটি পরামর্শও আছে, প্রিয় মার্গারেট। আত্মীয়-স্বজন যেহেতু তেমন কেউ নেই আমাদের, তুমি সঙ্গে একজন বন্ধুকে রেখো... পুরুষ বা নারী, যে-ই হোক না কেন, যাতে আমার উপর নজর কাজে সাহায্য করতে পারে তোমাকে। তবে হ্যাঁ, সে যে-লিঙ্গেরই হোক না

কেন, দ্বিতীয়জনকে তার বিপরীত লিঙ্গের হতে হবে। নারী-পুরুষ... এ-দুয়ের সম্মিলিত পাহারায় থাকতে চাই আমি। আরেকটা কথা... চোখ-কান খোলা রেখো, কোনও কিছুই অবহেলা কোরো না—তা যত ক্ষুদ্র, কিংবা অস্বাভাবিকই হোক না কেন। তোমার, আমার, সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্যই বলছি কথাটা। আমি যদি আহত হয়ে থাকি, তা হলে জেনো—ব্যাপারটা সাধারণ কোনও ঘটনা নয়, সতর্ক না থাকলে অনেক বড় বিপদ ঘটে যেতে পারে।

আর হ্যাঁ, আমার রুমের কোনও কিছুই... মানে আর্টিফ্যাক্ট এবং কিউরিওগুলো... নড়ানো যাবে না, কোনও অবস্থাতেই না। বিশেষ কারণে, বিশেষ ভঙ্গিতে ওগুলো সাজিয়েছি আমি। একটাও যদি নড়ে, তা হলে আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে।

যদি তোমার টাকা-পয়সা, কিংবা বুদ্ধি-পরামর্শের প্রয়োজন হয়, তা হলে মি. মারভিনের সঙ্গে যোগাযোগ কোরো। তাঁর কাছে সমস্ত নির্দেশ দিয়ে রেখেছি আমি। বিদায়।

—অ্যাবেল ট্রেলনি।

চিঠিটা এমনই অদ্ভুত যে আমিও দ্বিতীয়বার পড়তে বাধ্য হলাম ওটা। তারপরও মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না। এমন অদ্ভুত একটা চিঠি লেখার মানেটা কী! তবে বর্তমান ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে জিনিসটার যে একটা যোগসূত্র আছে, সেটাও অস্বীকার করবার জো নেই। রহস্যজনক একটা পরিস্থিতিতে সত্যিই মি. ট্রেলনি আহত হয়েছেন, ব্যাপারটার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। আরেকটা জিনিস বুঝতে পারলাম, চাই বা না-চাই, চিঠিতে

যে-বন্ধুর সাহায্য নিতে মেয়েকে বলেছেন ভদ্রলোক, সেটা আমিই হতে চলেছি। এই চিঠি পাবার আগেই তো মার্গারেট আমাকে খবর দিয়ে এনেছে।

তাই কাগজটা ফিরিয়ে দিতে দিতে বললাম, 'যদি তোমার আপত্তি না থাকে, আমি পাহারার কাজে সাহায্য করতে চাই, মার্গারেট।'

ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল মার্গারেটের। আমার হাত চেপে ধরে বলল, 'বাঁচালে! কীভাবে অনুরোধ করব, সেটাই বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু... তুমি তো ব্যস্ত মানুষ, অনেক কাজ আছে; এখানে সময় দিতে পারবে?'

'তোমার জন্য সব পারব,' অর্থপূর্ণ স্বরে বললাম। 'কিচ্ছু ভেবো না, কোনও অসুবিধে হবে না। পাহারা দিতে হবে তো সেই সন্ধ্যা থেকে, দিনের বেলা আমি অফিসে গিয়ে কাজ সেরে আসব। যদি খুব বেশিদিন এসব পাহারা-টাহারা দিতে না হয়, তা হলে সমস্যা হবে না।'

কৃতজ্ঞতায় মার্গারেটের চোখ ছলছল করে উঠল, তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফেরাল ও। সার্জেন্ট ড বলল, 'আপনি থাকবেন শুনে খুব খুশি হলাম, মি. রস। আমি নিজেও থাকব... অফিসের অনুমতিসাপেক্ষে অবশ্য... তবে আপনাকে সঙ্গে পেলে বেশ ভাল হবে। চিঠিটা ঘটনার উপর কিছুটা আলো ফেলেছে বটে, তবে রহস্যটা এখনও আগের মতই ঘোলাটে মনে হচ্ছে আমার কাছে। যদি ঘণ্টাদুয়েক আপনি থাকেন এখানে, আমি হেডকোয়ার্টার আর তালার কারিগরের সঙ্গে কথা বলে আসছি। তারপর নাহয় আপনি যেতে পারবেন। কাজ-টাজ সেরে এরপর একেবারে বিকেলে এলেই চলবে।'

রাজি হলাম প্রস্তাবটাতে।

সার্জেন্ট চলে যাবার পর অনেকক্ষণ নীরবতায় কাটল।

মার্গারেট তার বাবার সেবা-যত্নে ব্যস্ত, কথা বলার সুযোগ হলো না। আমি চেষ্টাও করলাম না অবশ্য, মাঝে মাঝে মানুষকে একা থাকতে দিতে হয়। কথা হলো অনেকক্ষণ পরে, তাও স্রেফ কাজের কথা... আমাকে মি. ট্রেলনির দিকে নজর রাখতে বলে বেরিয়ে গেল মার্গারেট।

খানিক পর মিসেস গ্র্যান্ট আর কয়েকজন চাকরসহ ফিরে এল ও, দেখলাম একটা ছোট আকারের খাট নিয়ে এসেছে। ওটা সোফার পাশে রেখে জোড়া দিল চাকররা। মার্গারেট ব্যাখ্যা করল, রক্তে ভেজা খাটে যেহেতু মি. ট্রেলনিকে শোয়ানো যাবে না, তাই আরেকটা নিয়ে এসেছে। ডা. উইনচেস্টার ফিরলে ওঁর পরামর্শক্রমে সোফা থেকে বিছানায় নিয়ে শোয়াবে বাবাকে।

চেয়ার নিয়ে মি. ট্রেলনির পাশে বসে পড়ল মার্গারেট। আমি ঘুরে ঘুরে দেখতে শুরু করলাম ঘরটা। কৌতূহল জাগাবার মত একটা জায়গাই বটে। ঘরের সাধারণ আসবাবপত্র ছাড়া বাকি সবই নানা ধরনের প্রাচীন প্রত্নসম্পদ—বেশিরভাগ মিশরীয়। রুমটা আকারে বড় হওয়ায় অনেক জায়গা ভিতরে... সবটাই ভরে ফেলা হয়েছে। ইজিপ্টোলজির বিষয়ে মি. ট্রেলনির ঝোঁক আছে বলে জানতাম, কিন্তু তিনি যে এত বড় একজন কালেক্টর, তা জানা ছিল না।

আর্টিফ্যাক্টের সংগ্রহ দেখতে দেখতে মগ্ন হয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেলাম চাকার শব্দে। একটা গাড়ি এসে থেমেছে বাইরে। নীচতলায় বেল বাজল, একটু পরেই বেডরুমে উদয় হলেন ডা. উইনচেস্টার। সঙ্গে সেবিকার পোশাকে এক যুবতী।

'কপাল ভাল বলতে হবে,' বললেন ডাক্তার। 'নার্স পেয়েছি।' পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি। 'মিস ট্রেলনি, এ হচ্ছে নার্স কেনেডি।'

তিন

পাহারা

চেহারা এবং মুখের ভাব দেখে সাক্ষীদেরকে আদালতে যাচাই করি আমি, ব্যক্তিগত জীবনেও তার ছাপ পড়েছে। তাই এ-মুহূর্তে নবাগতাকেও নিজের অজান্তে যাচাই করতে শুরু করলাম। তুলনা করতে শুরু করলাম মার্গারেটের সঙ্গে। দুজনের মধ্যে মিল নেই কোনও, তারপরও কোথায় যেন একটা চমৎকার সামঞ্জস্য আছে... যেন একের অভাবগুলো পূরণ করে দিচ্ছে অপরজন। মার্গারেট সুন্দরী, দেহটা ছিপছিপে। জলপাই আকারের বড় বড় চোখ, কালো মণিতে সাগরের গভীরতা। ভুরুগুলো ধনুকের মত নিখুঁত বাঁকঅলা, সিল্কের মত মসৃণ দীঘল কালো চুল নেমে গেছে কোমর ছাড়িয়ে। নারীসুলভ কমনীয়তার কোনও অভাব নেই, তারপরও বিস্ময়ের ব্যাপার—চেহারায় অদ্ভুত এক ধরনের দৃঢ়তা ফুটে থাকে ওর। সবকিছু মিলিয়ে পূর্ণাঙ্গ, অভিজাত... এবং নিখুঁত এক নারীর স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি ও।

নার্স কেনেডি অবশ্য অনেকটাই বিপরীত। খুব একটা লম্বা নয়, গড়পড়তা হিসেবে খাটোই বলা চলে। স্বাস্থ্যবতী, চওড়া কাঁধ... হাতগুলোও শক্তিশালী। কায়িক পরিশ্রমই সম্ভবত এর কারণ। চামড়া রোদে-পোড়া, চোখও কিছুটা গর্তে বসে গেছে, হলদেটে খয়েরি চুল অযত্নে ভুগছে। সুন্দরী বলা চলে না তাকে,

আবার কুৎসিতও নয়... মাঝামাঝি একটা অবস্থা—বৈচিত্র্যহীন চেহারা। নারীসুলভ কমনীয়তার পরিবর্তে তার ভিতর রয়েছে এক ধরনের শক্তিমত্তার আভা—মানসিক ও শারীরিক। মানুষজন মোটামুটি চিনতে জানি আমি, তাই নার্স কেনেডিকে দেখে বুঝতে পারলাম—এ-মেয়ে দয়াবতী, পরিশ্রমী এবং বুদ্ধিমতী।

আসবার পথেই সম্ভবত ডা. উইনচেস্টার তাকে সব খুলে বলেছেন; ঘরে ঢুকে তাই দেরি করল না সে, চুপচাপ রোগীর দায়িত্ব নিয়ে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মি. ট্রেলনিকে দেখল, নতুন বিছানাটা ঝেড়ে-পিটে ঠিকঠাক করল। এরপর ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে রোগীকে বিছানায় শোয়ানোর অনুমতি নিল সে, আমরা সবাই তাকে সাহায্য করলাম।

রাতের বাকি সময়টা ঘটনাবিহীনভাবে কেটে গেল। সার্জেন্ট ড ফিরল বেশ দেরি করে... দুপুরে। এসেই ক্ষমা চাইল অযাচিত বিলম্বের জন্য। মৃদু হেসে বললাম, কিছু মনে করিনি। বাড়ি থেকে কয়েকদিন চলবার মত জামাকাপড় আর দরকারি জিনিসপত্র আনিয়ে নিয়েছিলাম ইতোমধ্যে, সার্জেন্ট ফিরতেই তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম নিত্যদিনের কাজে।

কোর্টে আমারও দেরি হলো, গুরুত্বপূর্ণ একটা কেসের রায় দেয়া হচ্ছিল, সেটা চলল প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত। শেষে আমি যখন কেনসিংটন প্যালেস রোডে ফিরলাম, তখন সূর্য পাটে বসেছে। বাড়িতে ঢুকে দেখলাম, মি. ট্রেলনির রুমের কাছাকাছি আরেকটা বড় রুমে থাকতে দেয়া হয়েছে আমাকে।

সে-রাতে একটু অগোছালোভাবে আমাদের পাহারা শুরু হলো। নার্স কেনেডি সারাদিন ছিল রোগীর সঙ্গে, ওকে শুতে পাঠিয়ে দিলাম। ডা. উইনচেস্টারও বাড়িতে আছেন, মি. ট্রেলনির দিকে তার কড়া নজর, ডিনারের সময়টুকু ছাড়া পাশ ছাড়লেন না। ডাক্তারের খাওয়ার সময়টাতে পাহারা দিল মিসেস

গ্র্যান্ট। সার্জেন্ট ড-কেও খুব ব্যস্ত দেখলাম, মি. ট্রেলনির কাছাকাছি থাকল সে-ও, তবে তার সময় কাটল গৃহকর্তার রুমের ভিতরের আর আশপাশের জিনিসপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে।

রাত ন'টায় আমি আর মার্গারেট গেলাম মি. ট্রেলনিকে দেখতে, আমাদের ডিউটি অবশ্য আরও পরে শুরু হবে। রাত জাগবে বলে বিকেলে একটু ঘুমিয়ে নিয়েছে মার্গারেট। আমি অবশ্য তেমন সুযোগ পাইনি, তারপরও ঠিক করেছি—যেভাবে হোক, ওকে সঙ্গ দেব, কিছুতেই ঘুমাব না। নিঃশব্দে মি. ট্রেলনির ঘরে গিয়ে হাজির হলাম আমরা, ডা. উইনচেস্টার বিছানার উপর ঝুঁকে রোগীকে পরীক্ষা করছিলেন, সোজা হতেই আমাদেরকে দেখে চমকে উঠলেন। মনে হলো, বাকিদের মত পুরো পরিস্থিতিটা তাঁর নার্ভের উপরও চাপ ফেলতে শুরু করেছে। এভাবে চমকে যাওয়ায় নিজের উপরই বিরক্ত হলেন যেন তিনি, অস্বস্তি কাটাবার জন্য হড়বড় করে কথা বলতে শুরু করলেন।

'সত্যি বলতে কী, আমি রীতিমত বিভ্রান্ত বোধ করছি। ডাক্তারি জ্ঞান হাঁচড়ে-পাঁচড়েও মি. ট্রেলনির এই অচেতন অবস্থাটার কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। কয়েকবার পরীক্ষা করে দেখেছি, ভদ্রলোকের মস্তিষ্কে আঘাত পাবার কোনও চিহ্ন নেই। শরীরের সমস্ত ভাইটাল অর্গানও অক্ষত রয়েছে। অল্প অল্প করে কয়েকবার খাইয়েছি ওঁকে, হজমে অসুবিধে হয়নি। শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছেন স্বাভাবিকভাবে, নাড়ির গতিও সকালের তুলনায় এখন অনেকটাই ভাল। এখন পর্যন্ত কোনও ধরনের ড্রাগ ব্যবহারের প্রমাণ পাইনি আমি, এই অচেতন অবস্থাটা আমার জানাশোনা কোনও হিপনোটিক ঘুমের সঙ্গেও মেলে না। আর এই ক্ষতগুলো...' ব্যাণ্ডেজে মোড়া কবজির উপর আলতোভাবে আঙুল ছোঁয়ালেন ডাক্তার, 'এগুলোকে যে কীভাবে ব্যাখ্যা করব, সেটাও বুঝতে পারছি না। দেখে মনে হয় ধারালো

চিরুনীর আঁচড়, কিন্তু সেটা তো হাস্যকর... চিরুনী আবার ধারালো হয় নাকি! কিছুটা বিশ্বাসযোগ্য শোনায়, যদি বলি হিংস্র পশুর নখের আঘাত... কিন্তু এখানে হিংস্র পশু আসবে কোত্থেকে! ভাল কথা, মিস ট্রেলনি, বাড়িতে কোনও পোষা প্রাণী আছে নাকি? মানে একটু অদ্ভুত ধরনের... বনবিড়াল বা ওই জাতীয় কিছু?'

'না, না, জন্তু-জানোয়ার একেবারেই পছন্দ করে না বাবা,' বলল মার্গারেট। 'ছোট্ট একটা বেড়াল আছে আমার, ওটাকেই তাড়াবার জন্য সবসময় বকাঝকা করে। রীতিমত গোঁয়াতুর্মি করে রেখেছি ওকে আমি। বাবা তো ওকে এ-রুমে ঢুকতেই দেয় না...'

বলতে না বলতে দরজার পাল্লায় মৃদু আঁচড়ের আওয়াজ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল মার্গারেটের। বলল, 'ওই তো আমার *সিলভিও!* কোনও রুমে ঢুকতে চাইলে এভাবেই দরজায় আঁচড় কাটে ও। নিয়ে আসছি ওকে, নিজেরাই দেখতে পাবেন।' প্রায় ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিল ও। আদুরে গলায় বলল, 'কী রে, একা লাগছে বুঝি? ভিতরে আসতে চাস? ঠিক আছে, আয়, কিন্তু কাউকে বিরক্ত করবি না কিন্তু! ঠিক আছে?'

দুহাতের ভাঁজে বেড়ালটাকে তুলে নিয়ে আমাদের কাছে ফিরে এল মার্গারেট। প্রাণীটা সুন্দর—মখমলের মত মোলায়েম লোমে আবৃত একটা চিনচিলা গ্রে পার্সিয়ান। চেহারা-সুরতে অভিজাত ভাব, সাধারণ মানুষের বেড়াল হিসেবে মোটেই মানাবে না ওটাকে। মেঝেতে বেড়ালটাকে নামিয়ে আদর করতে শুরু করেছিল মার্গারেট, হঠাৎ মোচড় খেল ওটা, মালকিনের হাতের বাঁধন ফাঁকি দিয়ে ছুটে চলে গেল একটা নিচু টেবিলের তলায়—ওটার উপরে প্রাচীন একটা প্রাণীর মমি রাখা। *মিউ মিউ*

শব্দ আর টেবিলের পায়ায় শরীর ঘষার শব্দ পেলাম, মার্গারেট এগিয়ে গিয়ে টেনে বের করে আনল বেড়ালটাকে। মুক্তি পাবার জন্যে কোলের মধ্যে মোচড়ামুচড়ি শুরু করল সিলভিও, তবে খেয়াল করলাম—খামচি দিচ্ছে না। বোঝা গেল, মালকিনকে খুবই পছন্দ করে বেড়ালটা।

'খুব দুষ্টু হয়েছ তুমি, সিলভিও,' অনুযোগের সুরে বলল মার্গারেট। 'আর তোমাকে ছেড়ে রাখা যাবে না। ঘুমোতে চলো, সবাইকে শুভরাত্রি জানাও।' বেড়ালের একটা পা ধরে বাড়িয়ে দিল ও করমর্দনের ভঙ্গিতে।

অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, থাবাটা স্বাভাবিকের চাইতে বড়। বললাম, 'ওরেব্বাপরে! এ দেখি একটা বক্সিঙের গ্লাভ! নখঅলা গ্লাভ!'

হাসল মার্গারেট। 'খেয়াল করেছ তা হলে! আসলে একটু অস্বাভাবিক ওর থাবাটা—সাতটা আঙুল আছে।' থাবাটা ছড়িয়ে দেখাল।

ভুল বলেনি ও। সাতটা নখ দেখা যাচ্ছে বেড়ালটার পায়ে। ওগুলো হাত দিয়ে স্পর্শ করতেই চমকে উঠলাম। 'ভীষণ ধার দেখি নখগুলোয়! একেবারে ক্ষুরের মত!'

আমার কথা শুনে কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এলেন ডা. উইনচেস্টার। তীক্ষ্ণ চোখে দেখলেন থাবাটা, তারপর টেবিল থেকে রাইটিং প্যাডের একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে এলেন। কাগজটা হাতের তালুতে রেখে বেড়ালের থাবাটা ওটার উপর চেপে ধরলেন তিনি। বিরক্ত হয়ে পা সরিয়ে নিতে চাইল সিলভিও, টানা-হেঁচড়ায় নরম কাগজে আঁচড় পড়ল তার সাতটা নখের। এটাই চাইছিলেন ডাক্তার। কাজ হয়ে যেতেই ক্ষমা চেয়ে ছেড়ে দিলেন বেড়ালটাকে। মার্গারেট ওটাকে নিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

ভুরু কুঁচকে তাকালাম ডা. উইনচেস্টারের দিকে, একটা ব্যাখ্যা আশা করছি তাঁর আচরণের, কিন্তু ভদ্রলোক নীরব রইলেন। একটু পরেই ফিরে এল মার্গারেট। ঘরে ঢুকে নিচু টেবিলে রাখা মমিটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'অবাক ব্যাপারই বটে... মমিটার কথা বলছি, প্রথম যেদিন সিলভিওকে বাবার কাছে নিয়ে এলাম, সেদিনও একইভাবে ওটার দিকে ছুটে গিয়েছিল ও। লাফ দিয়ে টেবিলে উঠে মমিটাকে কামড়ে দিতে চেয়েছিল। বাবা খুব খেপে গিয়েছিলেন, চাইছিলেন সিলভিওকে তক্ষুণি রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে... আমি বহু কষ্টে ঠেকিয়েছি। শেষ পর্যন্ত বাবা ওকে সহ্য করে নিলেও নিজের ঘরে ঢুকতে দেননি আর কোনোদিন। রীতিমত নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন।'

ডা. উইনচেস্টার ওর কথা শুনতে পেয়েছেন বলে মনে হলো না। ভদ্রলোক ব্যস্ত রোগীকে নিয়ে। মি. ট্রেলনির হাতের ব্যাণ্ডেজটা খুলে ফেলেছেন তিনি—ক্ষতটা অনেকটাই পরিষ্কার এখন, লালচে কাটা দাগগুলোর আকার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। সিলভিও-র আঁচড়অলা কাগজটা পাশাপাশি রেখে মিলিয়ে দেখলেন তিনি, তারপর হঠাৎই তাঁর মুখে বিজয়ীর হাসি ফুটল। বললেন, 'মনে হচ্ছে, নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করেছে বেড়ালটা!'

এ-কথার অর্থ বুঝতে অসুবিধে হলো না আমাদের। কয়েক মুহূর্ত চুপ হয়ে রইলাম, কী বলব বুঝতে পারছি না। শেষে চমকটা সামলে নিয়ে প্রতিবাদের সুরে মার্গারেট বলল, 'কিন্তু... কিন্তু কাল তো সিলভিও এ-রুমে আসেনি!'

'আপনি নিশ্চিত?' ভুরু নাচালেন ডাক্তার। 'প্রমাণ দেখাতে পারবেন?'

'প্রমাণ করা তো কঠিন,' ইতস্তত করে বলল মার্গারেট। 'তবে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। আমার রুমে, বিছানার পাশে একটা ঝুড়িতে ঘুমায় সিলভিও। রোজকার মত কাল রাতে আমি

নিজেই শুইয়েছি ওকে, গায়ের উপর কম্বল টেনে দিয়েছি। সকালেও আমিই জাগিয়েছি। অবশ্য... রাতে যখন বাবাকে পেলাম, তখন ও আমার পিছু পিছু এসেছিল কি না, তা বলতে পারব না। মাথার ঠিক ছিল না তখন, সিলভিও-র দিকে নজর না পড়াটাই স্বাভাবিক।'

হতাশার ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন ডাক্তার। 'হুম, দেখেননি তা হলে? এখন তো ওকে পরীক্ষা করেও লাভ নেই। বেড়াল-কুকুর যেভাবে নিজের শরীর চাটে, এখন ওর পায়ে রক্ত-টক্তের চিহ্ন পাওয়া যাবে না।'

'খামোকাই ওকে সন্দেহ করছেন, ডাক্তার সাহেব,' প্রতিবাদ করল মার্গারেট। 'সিলভিও কীভাবে বাবাকে জখম করবে? আমি যখন প্রথমবার অদ্ভুত শব্দটা শুনি, তখন আমার রুমের দরজা বন্ধ ছিল; বাবার রুমের দরজাটাও খুলে ঢুকতে হয়েছে আমাকে। ঢুকে তো দেখি বাবা অলরেডি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। নিশ্চয়ই ভাবছেন না, দু-দুটো দরজা খুলে একটা পোষা বেড়াল এ-ঘরে এসে হামলা চালিয়েছিল?'

যুক্তিটা অকাট্য। আমি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম বেড়ালটা নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায়। মার্গারেটের প্রিয় বেড়াল মানে আমারও প্রিয় বেড়াল। সকৌতুকে বললাম, 'সিলভিওকে বেকসুর খালাস দিচ্ছি আমি, ডাক্তার!'

রসিকতায় খুশি দেখাল না ডা. উইনচেস্টারকে। ভদ্রতার সুরে বললেন, 'বেড়ালটার দিকে সন্দেহের আঙুল তোলার জন্য ক্ষমা চাইছি, মিস ট্রেলনি। তারপরও কেন জানি খটকা লাগছে আমার মনে। মমিটার কথা ভাবছি... এই একটাই নয়, আরও মমি আছে বাড়িতে, তাই না? আমি নিজেই হলঘরে তিনটে দেখেছি। সিলভিও কি সবগুলোর দিকেই ওভাবে ছুটে যায়?'

'ঠিকই ধরেছেন, অনেক মমি আছে বাড়িতে,' বলল

মার্গারেট। 'মাঝে মাঝে তো আমার নিজেরই সন্দেহ হয়—বাড়িতে, নাকি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছি! তবে ওসব কোনোটার দিকেই সিলভিও-র আগ্রহ নেই। এই একটাই ওর মনোযোগের বস্তু... কে জানে, এটাই একমাত্র পশুর মমি বলে হয়তো। বাকি সবগুলো তো মানুষের।'

'কীসের মমি এটা... বেড়ালের নাকি?' এগিয়ে গিয়ে বিবর্ণ মমিটা পরীক্ষা করলেন ডাক্তার। 'হ্যাঁ, তাই তো! চমৎকার স্পেসিমেন। নিশ্চয়ই উচ্চবংশীয় কারও খুব পছন্দের বেড়াল ছিল এটা, নইলে মমি হবার মত সম্মান পেত না। দেখুন, রঙিন কেস আর অবসিডিয়ান পাথরের চোখ দেয়া হয়েছে বেড়ালটাকে, ঠিক মানুষের মমির মত। হুম... ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, চার-পাঁচ হাজার বছরের পুরনো একটা মৃত বেড়ালকে আধুনিক একটা জ্যান্ত বেড়াল আক্রমণ করছে... শত্রুতা করছে যেন। কারণটা কী!' মার্গারেটের দিকে তাকালেন ডাক্তার। 'আপনার অনুমতি নিয়ে আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে চাই, মিস ট্রেলনি।'

দ্বিধা দেখা দিল মার্গারেটের চোখে। ইতস্তত করে বলল, 'আপনার উপর আমার আস্থা আছে। করুন যা-খুশি, শুধু একটাই অনুরোধ... আমার সিলভিও-র যেন কিছু না হয়।'

মুচকি হাসলেন ডা. উইনচেস্টার। 'সিলভিও-র ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন। সহানুভূতি দেখাতে হলে অন্য বেড়ালটাকে দেখান।'

'মানে!'

'সিলভিও হামলা চালাবে, অন্য বেড়ালটা হামলার শিকার হবে।'

'হামলা! কী বলছেন এসব?'

ব্যাখ্যা করলেন ডাক্তার, 'মিউজিয়াম স্ট্রিটে সস্তায় অনেক বেড়ালের মমি পাওয়া যায়। একটা নিয়ে আসব আমি, এই

মমিটার বদলে বসিয়ে দেব। তারপর সিলভিওকে নিয়ে আসব এখানে। দেখব, ও কি শুধু এই বেড়ালটাকেই আক্রমণ করে, নাকি যে-কোনও বেড়ালের মমিকে?'

'আসলটা সরিয়ে ফেলবেন?'

'হ্যাঁ। কেন, আপত্তি আছে? ভাবছেন, এতে আপনার বাবার দেয়া নির্দেশের ব্যত্যয় ঘটবে?'

'তা তো ঘটবেই,' বলল মার্গারেট। 'তবে ওঁর ভাল-র জন্য ঝুঁকিটা নিতে রাজি আছি আমি, যদি কাজশেষে মমিটা আবার আগের জায়গায় রেখে দেন আপনি।'

'রাখব,' কথা দিলেন ডাক্তার।

'ঠিক আছে, করুন আপনার পরীক্ষা। তবে সামান্য একটা বেড়ালের মমির তেমন কোনও বিশেষত্ব আছে বলে মনে হচ্ছে না আমার।'

ডাক্তার এ-কথার পিঠে অন্য কিছু বললেন না। মুখ শক্ত করে বসে থাকলেন। তার গাম্ভীর্যের প্রভাব কিছুটা আমার উপরও পড়ল। বুঝতে পারলাম, এখন পর্যন্ত যতটা ভেবেছি, গোটা বিষয়টা তারচেয়ে অনেক গুরুতর। চিন্তাটা মনের মধ্যে জেঁকে বসল, ছড়াতে শুরু করল অশুভ ডালপালা। মি. ট্রেলনির বিশাল শয়নকক্ষ আরও বাড়িয়ে দিল শঙ্কা। সাধারণ একটা বেডরুম নয় এটা; মমি আর মমি-সংশ্লিষ্ট নানা জিনিসে ভরে আছে ভিতরটা। বিটুমিন, আরক এবং নানা ধরনের গন্ধ প্রাচীন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে এখানে। রুমে আলোর পরিমাণও যথেষ্ট নয়, মনে সাহস জোগায় না; বেশিরভাগ অংশ ঢেকে রয়েছে ছায়ায়, মনে হয় যেন তার আড়াল থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসবে কোনও মূর্তিমান আতঙ্ক। দুজন সঙ্গী থাকা সত্ত্বেও কেন যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম।

সংবিৎ ফিরে পেলাম নার্স কেনেডিকে ঢুকতে দেখে। তাকে দেখেই মনে পড়ে গেল, আমি কোনও অশুভ আবাসে নেই, রয়েছি

একজন অসুস্থ মানুষের ঘরে... তার চিকিৎসার জন্য। ছায়াগুলোকে আগের মত আর ভীতিকর মনে হলো না। মিশরীয় গন্ধগুলো অবশ্য এখনও সহনীয় হলো না, তবে মেনে নিলাম ওগুলোকে। মি. ট্রেলনির জন্য সহানুভূতি হলো, অল্প একটু সময়েই পরিবেশটা আমাকে যেভাবে প্রভাবিত করছিল, সেখানে যে-ভদ্রলোক বছরের পর বছর এর মধ্যে বাস করছেন তার না জানি কী অবস্থা। অজ্ঞাত রোগের কথা বলছেন ডা. উইনচেস্টার, সেটা পরিবেশের প্রভাবেই নয়তো!

মাথা ঝাড়া দিয়ে চিন্তাগুলোকে দূর করলাম, আজ রাতে অন্যমনস্ক হলে চলবে না; থাকতে হবে সতর্ক এবং জাগ্রত অবস্থায়। কাল রাতে ঠিকমত ঘুম হয়নি, আজ সারাদিনও বিশ্রাম নিতে পারিনি; তাই সন্দেহ জাগল, ঠিকমত পাহারা দিতে পারব কি না। পুরনো গন্ধটাও খুবই অসহ্য লাগছে। মার্গারেটকে বলে বেরিয়ে এলাম বাড়ি থেকে, একটা ওষুধের দোকান খুঁজে বের করে রেসপিরেটর কিনলাম।

যখন ফিরলাম, তখন দশটা বাজে। ডা. উইনচেস্টার রাতের মত বিশ্রাম নিতে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন, তাঁর জায়গা নিতে এসেছে সার্জেন্ট ড। মার্গারেট এখনও বাবার পাশে বসে আছে। ডাক্তারের কাছ থেকে রোগীর বিষয়ে নির্দেশ জেনে নিল নার্স কেনেডি, তারপর ফিরে এল বিছানার কাছে। ছোট্ট একটা আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করা হলো, ও রাত দু'টো পর্যন্ত পাহারা দেবে, তারপর মার্গারেট দায়িত্ব বুঝে নেবে। সার্জেন্ট ড থাকবে বারোটা পর্যন্ত, এরপর আমি। এ-পদ্ধতিতে মি. ট্রেলনির নির্দেশ মোতাবেক সবসময় একজন নারী ও একজন পুরুষ পাহারায় থাকছে; ওভারল্যাপিঙের ব্যবস্থা থাকায় কোনও একটা নির্দিষ্ট সময়ে সম্পূর্ণ নতুন দুজন মানুষও পাহারায় যোগ দিচ্ছে না। পদ্ধতিটা পছন্দ হলো সবার।

নিজের রুমে ফিরে গেলাম আমি, শুয়ে পড়লাম। চাকরদের বলে রাখলাম, যেন বারোটা বাজার আগেই ডেকে তোলে আমাকে। ক্লান্ত ছিলাম, ঘুমিয়ে পড়তে দেরি হলো না। দেরি হলো না জেগে উঠতেও। চোখ মুদতে না মুদতেই যেন ডাক শুনলাম এক চাকরের।

ঘড়ি দেখলাম, বারোটা বাজে প্রায়। কাঁচা ঘুম ভেঙেছে, প্রথমে কিছুক্ষণ ভার হয়ে রইল মাথা, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারলাম না নিজেকে। তবে একটু পর সচেতন হয়ে গেলাম, মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল একই সাথে। মুখ-হাত ধুয়ে চলে গেলাম মি. ট্রেলনির ঘরে।

নার্স কেনেডিকে দেখলাম বিছানার পাশে; সজাগ, রোগীর দিকে কড়া নজর রেখেছে। সার্জেন্টকে প্রথমে চোখে পড়ল না, পরে ভাল করে তাকাতেই আবিষ্কার করলাম, রুমের কোণে ছায়ার ভিতর চেয়ার নিয়ে বসে আছে সে, নড়াচড়া করছে না। আমি কাছাকাছি যেতেই মুখ খুলল, বলল, 'ঘুমোইনি আমি। জেগে আছি।'

কথাটা অপ্রয়োজনীয়, কেমন যেন অজুহাতের মত শোনাল। জানালাম, পাহারার পালা শেষ হয়েছে তার। ঘুমোতে যেতে পারে।

উঠে দাঁড়াল ড। দরজা পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিলাম আমি। যাবার আগে আমার দিকে ফিরে সে বলল, 'আমার ঘুম খুব পাতলা, সঙ্গে পিস্তলও থাকবে। সমস্যা দেখলেই ডাকবেন, ঠিক আছে? আর কিছুক্ষণ থাকতে অসুবিধে হতো না, কিন্তু মমির গন্ধে মাথা ভার হয়ে গেছে। কিছু মনে করবেন না। আমি ছ'টায় আবার ফিরে আসব।'

'পরে এলেও অসুবিধে নেই, আপনি যান।' এক ধরনের স্বস্তির পেলাম—বিচ্ছিরি গন্ধটা শুধু একা আমারই অসুবিধে করছে

না জানতে পেরে।

নার্স কেনেডিকে জিজ্ঞেস করলাম, কিছু লাগবে কি না; নেতিবাচক জবাব দিল সে। মেয়েটির কোলে সুগন্ধি তেলের একটা শিশি লক্ষ করলাম, তারমানে পুরনো গন্ধটা ওর-ও সহ্য হচ্ছে না। ওর দৃষ্টি এড়িয়ে ছায়ায় গিয়ে বসলাম, নাক-মুখ ঢাকলাম রেসপিরেটরে। গন্ধের উৎপাত কমে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

নানা রকম এলোমেলো চিন্তায় ডুবে গেল মন। গত চব্বিশ ঘণ্টায় অদ্ভুত যে-সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি, সেগুলো বিশ্লেষণের চেষ্টা করলাম, যদিও থই পেলাম না। প্রাচীন মমির বোটকা গন্ধটা নিয়েও ভাবলাম, বিস্মিত হয়ে লক্ষ করলাম—ঘ্রাণেন্দ্রিয়-র উপর থেকে অত্যাচার সরে যাওয়ায় সারা দেহে অদ্ভুত আরাম অনুভব করছি। রেসপিরেটর কেনাটা সার্থক, কাজের মত কাজ হয়েছে একটা।

কম ধকল যায়নি গতকাল থেকে, একটু আরাম পেতেই সে-কারণে শরীরটা অবসাদে আক্রান্ত হলো। আধো-ঘুম, আধো-জাগরণের এক অদ্ভুত জগতে বিচরণ করতে শুরু করলাম। চোখ-কান খোলা, দেখছি-শুনছি সবই, তারপরও কোনও কিছুই যেন বাস্তব নয়।

একটা স্থিরচিত্রের মত মনে হলো পরিবেশটাকে—রেসপিরেটরে নাক-মুখ ঢেকে বসে আছি আমি, নার্স কেনেডি বিছানার পাশে বসে আছে আমার দিকে পিছন ফিরে, মি. ট্রেলনি আগের মতই অচেতন শুয়ে। ছবিটা যেন অনন্তকালের জন্য স্থবির হয়ে আছে, পরিবর্তনহীনভাবে। বাইরে... দূর থেকে আবছাভাবে ভেসে আসা নানা রকম শব্দ শুনতে পেলাম—চাকার ঘুরছে রাস্তায়, পাহারাদার হাঁক ছাড়ছে, রাতের ট্রেন হুইসেল বাজিয়ে ছুটে যাচ্ছে দূর-দূরান্তে। ঘরের ভিতর একটামাত্র বাতি জ্বলছে, আলোকিত হয়ে আছে খুব সামান্য একটু জায়গা, বাকিটা ছায়ার

দখলে। হঠাৎ করেই ছায়াগুলোকে কেন জানি জ্যান্ত মনে হলো, নড়তে-চড়তে শুরু করেছে যেন। একটা বেড়ালের ডাক শুনলাম, পর্দা খসখস করল, ধাতব ঠনঠনও কানে বাজল। নড়তে পারলাম না একটুও, ঘোরের মধ্যে চলে গেছি, সবকিছু কেমন অবাস্তব মনে হচ্ছে, শরীরটা যেন আর নিজের নেই।

তারপর... হঠাৎ করেই চমকে উঠলাম। সাড়া ফিরে পেলাম ইন্দ্রিয়গুলোতে। তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার কর্ণকুহরে আঘাত করল। চোখের সামনে আলোর ঝলকানি দেখতে পেলাম, একই সঙ্গে পিস্তলের গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ। একবার... দুবার! সাদাটে একটা ধোঁয়ার মেঘ ছড়িয়ে পড়ল রুমের ভিতর। সেটা সরে যেতেই যা দেখলাম, তা আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিল।

চার

দ্বিতীয় হামলা

দৃশ্যটা ভয়াবহ। দুঃস্বপ্ন ভেবে ভুলে যেতে পারলেই ভাল হতো, কিন্তু তা সম্ভব নয়। জলজ্যান্ত বাস্তব ওটা, ভুল বোঝার কোনও অবকাশ নেই। রুমের মধ্যে অনেকগুলো বাতি জ্বলছে এখন, উজ্জ্বল আলো দূর করে দিয়েছে দৃষ্টিবিভ্রান্তির সমস্ত সম্ভাবনা।

বিছানাটা শূন্য। নার্স কেনেডি আগের মত বসে আছে পাশের চেয়ারে, আমার দিকে পিঠ ফেরানো। কিন্তু পাথর হয়ে গেছে ও। ফ্যাকাসে মুখটাতে ভয় বা আতঙ্কের ছাপ নেই, ফ্যাল ফ্যাল

তাকিয়ে রয়েছে শূন্যের দিকে, চোখের পাতা পড়ছে না... যেন মূর্তি হয়ে গেছে মেয়েটি। দম ফেলছে, তারপরও একটা মৃতদেহ মনে হচ্ছে ওকে; পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই।

বিছানার উপর নজর ফেললাম, এলোমেলো হয়ে আছে চাদর—মানবদেহ টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাবার স্পষ্ট ইঙ্গিত। চাদরের এককোণা লেগে রয়েছে মেঝের সঙ্গে, ওখানে পড়ে রয়েছে একটা ব্যাণ্ডেজ—মি. ট্রেলনির হাতের ক্ষতটা ওটা দিয়ে ড্রেসিং করেছিলেন ডা. উইনচেস্টার। একটু দূরে পড়ে আছে রক্তাক্ত আরেকটা খণ্ড... তারপর আরেকটা! এক এক করে ছিঁড়ে ফেলা ব্যাণ্ডেজের টুকরোগুলো যেন ট্রেইল তৈরি করেছে, আর তার শেষ মাথায় পড়ে আছেন মি. ট্রেলনি—ঠিক যেখানে গতকাল পড়ে ছিলেন... বিশাল সেফটার সামনে! বাম হাতটা আজও সেফের ডালার দিকে প্রসারিত, তবে হাতটা আজ গতকালকের চেয়ে ভয়াবহ আক্রোশের শিকার হয়েছে। চাবিঅলা ব্রেসলেটটার ঠিক উপর দিয়ে কেটে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবার চেষ্টা করা হয়েছে বাহু। অস্ত্র হলো একটা ধারালো *কুকরি* ছুরি—ভারতীয় শিখরা এ ছুরি ব্যবহার করে। ডিসপ্লের জন্য দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল ছুরিটা, ওটাই খুলে আনা হয়েছে। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে দেখতে পেলাম, হাতের একটা পাশের মাংস কেটে গেছে হাড় পর্যন্ত; অন্যপাশটাতেও কাটা শুরু হয়েছিল, কিন্তু শেষ হয়নি... মাংসের মধ্যে এখনও আটকে আছে ছুরিটা! গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে ক্ষত থেকে।

মার্গারেটকে দেখতে পেলাম পিতার পাশে বসে থাকতে; দৃষ্টিতে বিভ্রান্তি, জামা ভিজে যাচ্ছে মেঝেতে গড়ানো রক্তে, কিন্তু খেয়াল নেই সেদিকে। রুমের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সার্জেন্ট ড, পরনে ঘুমের পোশাক... হাতের পিস্তল রিলোড করছে, চোখে-মুখে উদ্‌ভ্রান্ত চাহনি। কাঁচা ঘুম থেকে উঠে এসেছে

সে। কী ঘটছে, তা ঠিকমত বুঝতে পারছে না বোধহয়। নানা ধরনের বাতি হাতে বেশ ক'জন চাকর দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, এগোলাম মার্গারেটের দিকে। কিন্তু আমাকে দেখতে পেয়েই চিৎকার করে উঠল ও, অজ্ঞান হয়ে যেতে বসল। ড ঝট্ করে পিস্তল তুলল আমার দিকে। তাড়াতাড়ি রেসপিরেটর সরিয়ে ওকে থামতে বললাম, নইলে গুলি খেতে হতো এখুনি। বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল সবাই, চেহারা নাকি আমারও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, ঘুমোনোর কারণে বেশবাস অবিন্যস্ত, চমকে উঠেছে মার্গারেট তাই। ভুরু কুঁচকে রেসপিরেটরটার দিকে তাকালাম; বুঝতে পারছি না, নার্স কেনেডির মত দশা আমারও না-হবার পিছনে এটার কোনও ভূমিকা আছে কি না।

তবে ওটা নিয়ে মাথা ঘামাবার সুযোগ পেলাম না, সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মি. ট্রেলনিকে নিয়ে। গতকালের ঘটনায় করণীয় সম্পর্কে মোটামুটি অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে সবার, আজ তড়িৎগতিতে কাজ হলো। প্রথমেই বন্ধ করা হলো রক্তপাত—মি. ট্রেলনির হাতটা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেলা হলো, ক্ষতের উপরে-নীচে দেয়া হলো শক্ত বাঁধন... রক্তক্ষরণ কমাবার জন্য। একজনকে পাঠিয়ে দেয়া হলো ডাক্তারকে ডেকে আনবার জন্য। বাকিরা ধরাধরি করে মি. ট্রেলনিকে নিয়ে গেলাম সোফায়, গতকালের মত শোয়ালাম ওঁকে। এরপর নার্স কেনেডির দিকে নজর দিলাম আমরা। মড়ার মত পড়ে আছে ও, কিছুতেই চেতনা ফেরানো গেল না। শেষে ওকে যেমন আছে তেমনই রেখে ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করবার সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা।

মিসেস গ্র্যান্ট ইতোমধ্যে নিয়ে গিয়েছিল মার্গারেটকে, একটু পরেই ফিরল ও। পোশাক পাল্টে নিয়েছে, হাবভাব আগের চেয়ে

শান্ত। সোফার দিকে এগিয়ে এল ও, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। আশ্বস্ত করবার ভঙ্গিতে বললাম, 'ভয়ের কিছু নেই, কিচ্ছু হয়নি আমার। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আর কিছু না।'

'ঘুমিয়েছ!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মার্গারেট। 'আমার বাবার এ-অবস্থা, আর তুমি কিনা...! এভাবেই বুঝি পাহারা দাও তুমি?'

অপমানিত বোধ করলাম খুব, তবে ধৈর্য হারালাম না। শান্ত গলায় বললাম, 'জানি, কাজটা ঠিক হয়নি। তবে ঘুমিয়ে পড়বার কোনও ইচ্ছে ছিল না আমার, অনেক চেষ্টা করেছি জেগে থাকতে... পারিনি। পরিস্থিতিটা এখানে স্বাভাবিক ছিল না, নার্স কেনেডিকে তো দেখছ। আমি যে অক্ষত আছি, সেটাই আশ্চর্য।' রেসপিরেটরটা বের করে দেখালাম। 'সম্ভবত এটাই আমাকে বাঁচিয়েছে।'

পালা করে মূর্তিতে পরিণত হওয়া নার্স আর আমার দিকে তাকাল মার্গারেট। তারপর মুখ চেপে ধরল দুহাতে। বলল, 'আমাকে ক্ষমা করে দাও, ম্যালকম। মাথার ঠিক নেই আমার, কী বলতে কী বলছি, তার কোনও ঠিক নেই। তোমাকে পর্যন্ত সন্দেহ করছি!'

ওর এ-অবস্থা দেখে বুকের মধ্যে আবেগ উথলে উঠল, তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে ওর হাত চেপে ধরলাম। বললাম, 'শান্ত হও, সব ঠিক হয়ে যাবে। যা হবার তা হয়ে গেছে। এসো, বরং জানার চেষ্টা করি, কীভাবে কী ঘটেছে। কী মনে পড়ে তোমার, সেটা বলো।'

নিজেকে একটু সুস্থির করে নিল মার্গারেট। তারপর বলল, 'ঘুমাচ্ছিলাম আমি, হঠাৎ জেগে উঠলাম একটা অশুভ অনুভূতি নিয়ে। মনে হলো, বাবার উপর একটা ভয়ানক বিপদ ঘনিয়ে আসছে। দৌড়ে এ-রুমে ছুটে এলাম, খুব অন্ধকার ছিল ভিতরটা, কিন্তু দরজা খুলতেই একটু আলো ঢুকল ভিতরে; সেই আলোয়

বাবাকে পড়ে থাকতে দেখলাম সেফের সামনে...' আর বলতে পারল না ও, ফুঁপিয়ে উঠল।

মার্গারেটকে আর বিরক্ত না করে সার্জেন্ট ড-র দিকে ফিরলাম, গম্ভীর হয়ে নিজের রিভলভারটা নাড়াচাড়া করছে সে। জিজ্ঞেস করলাম, 'সার্জেন্ট, কীসের দিকে গুলি ছুঁড়ছিলেন আপনি?'

সংবিৎ ফিরে পেল ড। আড়চোখে দেখল চারপাশ, তারপর বলল, 'চাকর-বাকরদের চলে যেতে বলুন। খোলাখুলিভাবে কথা বলতে পারব তা হলে।'

মার্গারেটের অনুমতি নিয়ে ইশারা করলাম সবাইকে, নীরবে রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেল চাকররা। পিছনে টেনে দিল দরজাটা।

একটু অপেক্ষা করল সার্জেন্ট, তারপর বলল, 'যতটুকু মনে আছে, তা খুলে বলছি। নিজেরাই চেষ্টা করে দেখুন, কিছু বুঝতে পারেন কি না। মিস মার্গারেটের মত আমিও ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ একটা চিৎকার শুনে ভেঙে যায় ঘুমটা। বালিশের তলা থেকে পিস্তলটা নিয়ে ছুটে বেরিয়ে আসি ল্যাণ্ডিঙে। এ-অবস্থায় আবার শুনি চিৎকারটা। দৌড়ে ঢুকি এ-রুমে। নার্সের পাশের বাতিটা নিভে গিয়েছিল, খোলা দরজা দিয়ে আসা আবছা আলোয় মিস ট্রেলনিকে দেখি মেঝেতে, ওঁর বাবার পাশে বসে আছেন, জায়গাটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। জানালার কাছাকাছি কিছু একটা নড়ে উঠেছে বলে মনে হলো, ভাবনা-চিন্তা করবার সময় পেলাম না, সহজাত প্রবৃত্তির বশে গুলি করে বসলাম। লাভ হলো কি না জানি না, তবে জিনিসটাকে মনে হলো জানালার আরও কাছে সরে গেছে। তাই দ্বিতীয়বার আবার গুলি করলাম। এরপর তো আপনিই মুখে ওই মুখোশের মত জিনিসটা পরে উঠে দাঁড়ালেন। ভাগ্যিস গুলি করে দিইনি!'

'কী ছিল ওটা জানালার কাছে?' জেরার ভঙ্গিতে জানতে

চাইলাম।

মাথা চুলকাল ড। জবাব দিল না।

আবার প্রশ্ন করলাম, 'কী ছিল ওটা? মনে পড়ছে না?'

'কী জানি!' কাঁধ ঝাঁকাল সার্জেন্ট। 'কিছু একটা নড়ছিল বটে, কিন্তু ওটা যে কী, তা বলতে পারব না। আসলে... কাঁচা ঘুম ভেঙে উঠে এসেছিলাম তো, মাথা কাজ করছিল না ঠিকমত।'

বেচারা বিব্রত হয়ে উঠছে দেখে সান্ত্বনার সুরে বললাম, 'থাক, থাক, ওসব নিয়ে চিন্তা করবেন না। নার্সকে অচেতন করে ফেলেছে যে-জিনিস... যেটা আমাকেও ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে... ওটায় বোধহয় আপনিও খানিকটা আক্রান্ত হয়েছিলেন রাতে। যান, আপনি যেখানটায় দাঁড়িয়েছিলেন, ওখানে গিয়ে দাঁড়ান। আমিও আমার চেয়ারে গিয়ে বসছি। হয়তো বুঝতে পারব, কোথায় আপনি গুলি ছুঁড়ছিলেন।'

আপত্তি করল না ড, রুমের মাঝামাঝি গিয়ে পজিশন নিল, হাতে তাক করে রেখেছে পিস্তলটা। লক্ষ করলাম, আমার চেয়ারের কাছাকাছি স্থির হয়ে আছে তার লক্ষ্য। পিস্তলের নলটাকে অনুসরণ করে পিছনে তাকালাম, একটা বুল কেবিনেট দাঁড়িয়ে আছে দেয়াল ঘেঁষে—কাঁচের দরজাটা ভেঙে চৌচির।

'এটা কি আপনার দ্বিতীয়, না প্রথম গুলি?' জানতে চাইলাম।

'দ্বিতীয়। প্রথমটা ওইদিকে ছিল।'

পিস্তল-ধরা হাতটা ঘুরে গেল বামে, বিশাল সেফটার দিকে। ওদিকে তাকাতেই নিচু টেবিলটা চোখে পড়ল, অন্যান্য কিউরিও-র পাশপাশি সিলভিও-র চোখের বিষ... বেড়ালের মমিটা রয়েছে ওটায়। একটা মোমবাতি হাতে এগিয়ে গেলাম ওদিকে। গুলির চিহ্নটা খুঁজে পেতে অসুবিধে হলো না। কাঁচের একটা ফুলদানি, আর হায়ারোগ্লিফিক্স-খোদিত একটা কালো ব্যাসল্টের কাপ গুঁড়িয়ে দিয়েছে ওটা। দেয়ালের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে চ্যাপ্টা হয়ে

গেছে বুলেটটা, পড়ে আছে টেবিলের উপরে।

ভাঙা কেবিনেটটার দিকে গেলাম এবার। ওটা দামি কিউরিও রাখার জন্য তৈরি করা। সোনা, অ্যাগাট, সবুজ জ্যাসপার, অ্যামেথিস্ট, লাপিস লাজুলি, ওপ্যাল, গ্র্যানেট আর নীলচে সবুজ চীনামাটির সমন্বয়ে তৈরি বেশ ক'টা গুবরে পোকার প্রতিকৃতি চোখে পড়ল। সৌভাগ্যক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি ওগুলো, গুলিটা দরজার কাঁচ গুঁড়িয়ে কেবিনেটের পিছনদিক ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। একটা বিষয় কৌতূহলী হয়ে লক্ষ করলাম—গুবরে পোকা, আংটি, অ্যামিউলেট-সহ যে-সব জিনিস রয়েছে কেবিনেটে, সব ডিম্বাকৃতি একটা চক্রে সাজিয়ে রাখা হয়েছে বাজপাখির মাথাঅলা এক দেবতার মূর্তিকে ঘিরে। ব্যাপারটা নিয়ে তৎক্ষণাৎ মাথা ঘামালাম না, আরও জরুরি কাজ পড়ে রয়েছে হাতে। ভাঙা কেবিনেট থেকে মমি-টাইপের গন্ধটা তীব্র হয়ে ছড়াচ্ছে, রুমের স্বাভাবিক গন্ধের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি এটা।

ভোর হয়ে এসেছে, জানালার ফাঁক দিয়ে আবছা আলোর ছটা দেখা দিচ্ছে। সোফার কাছে ফিরে গিয়ে মিসেস গ্র্যান্টকে জানালার পর্দা সরিয়ে দিতে বললাম। একটু পরেই ভোরের ম্লান আলোয় ঢুকে পড়ল কক্ষটাতে। ভৌতিক পরিবেশটা কেটে যাবে ভেবেছিলাম, কিন্তু বিস্মিত হয়ে লক্ষ করলাম, তা ঘটেনি। আবছা আলোয় ঘরটাকে আরও অশুভ লাগল আমার কাছে। কোণায় কোণায় জমাট বেঁধে থাকা ছায়াগুলো সরেনি, সোফায় পড়ে থাকা মি. ট্রেলনি, আর চেয়ারে এলিয়ে থাকা নার্স কেনেডির মুখদুটো হলদেটে দেখাচ্ছে। ফ্যাকাসে হয়ে আছে মার্গারেটের মুখটাও, যেন রক্ত নেই ওখানে। সবমিলিয়ে গা শিরশির করা একটা পরিবেশ।

খানিক পরে ডা. উইনচেস্টার এসে পড়ায় কিছুটা স্বস্তি পেলাম। হাঁপাচ্ছেন ভদ্রলোক, সম্ভবত ছোটাছুটি করে আসার

ফলে। রুমে ঢুকে একটাই প্রশ্ন ছুঁড়লেন তিনি।

'হাতটা কাটল কীভাবে, কেউ দেখেছেন?'

একযোগে মাথা নাড়লাম সবাই। ডাক্তার তাই আর বিষয়টা নিয়ে উচ্চবাচ্য করলেন না, ব্যাগ খুলে সেলাইয়ের সরঞ্জাম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এক পলকের জন্য নিথর পড়ে থাকা নার্স কেনেডির দিকে তাকালেন বটে, কিন্তু হাতের কাজ থামল না। কপালে ভ্রূকুটি জাগতে দেখলাম শুধু। সময় নিয়ে রক্তবাহী ধমনীগুলো জোড়া দিলেন তিনি, ক্ষত পরিষ্কার করলেন জীবাণুনাশক দিয়ে, তারপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধলেন। মি. ট্রেলনির চিকিৎসা শেষ হবার পর আবার মুখ খুললেন ডাক্তার।

'নার্সের ব্যাপারটা কী?'

'জানি না,' বলল মার্গারেট। 'আড়াইটার দিকে রুমে ঢুকে ঠিক ওই অবস্থাতেই পেয়েছি ওকে। নাড়াচাড়া করিনি আর; তাতে লাভ হতো বলেও মনে হয় না। সাড়া নেই ওর শরীরে। সার্জেন্টের ছোঁড়া গুলির শব্দেও নড়েনি ও।'

'গুলি!' বিস্মিত হলেন ডাক্তার। 'এখানে ঘটেছে কী, বলুন তো?'

সবাই চুপ করে আছে দেখে আমি মুখ খুললাম। বললাম, 'আমরা কেউই সেটা বুঝতে পারছি না, ডা. উইনচেস্টার। কেনেডির সঙ্গে পাহারায় ছিলাম আমি, তারপরও টের পাইনি কিছু। সন্ধ্যায় মমির গন্ধে মাথা ঘুরছিল, তাই একটা রেসপিরেটর কিনে এনেছিলাম। ওটা পরে ছিলাম আমি, তারপরও ঘুম ঠেকাতে পারিনি। যখন জেগে উঠেছি, তখন ঘরভর্তি মানুষ। মিস ট্রেলনি বসে ছিলেন ওঁর বাবার পাশে, সার্জেন্ট ড-ও কিছুটা অস্বাভাবিক ছিলেন। জানালার কাছে কিছু একটা নড়ছে ভেবে দুবার গুলি ছুঁড়েছেন উনি।'

'হুম! মি. ট্রেলনিকে কোথায় পাওয়া গেছে?'

'সেফের পাশে... ঠিক গতকালের মত।' উঠে গিয়ে রক্তের ছোট্ট পুকুরটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। 'এই যে, এই ছুরিটা বিঁধে ছিল ওঁর হাতে। আমরা আর হাত লাগাইনি ওটায়।'

'তারমানে গতকালকের মত আজকের ঘটনারও কোনও ব্যাখ্যা নেই কারও কাছে?'

'ঠিক ধরেছেন।'

চিন্তায় ডুবে গেলেন ডাক্তার। একটু পর মার্গারেটের দিকে তাকালেন তিনি। 'যদি আপত্তি না থাকে, নার্স কেনেডিকে আরেকটা রুমে নিয়ে যেতে চাই আমি।'

'না, না, আপত্তি কীসের?' মিসেস গ্র্যান্টের দিকে ফিরল মার্গারেট। 'ওঁকে ওঁর রুমে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল মিসেস গ্র্যান্ট। খানিক পরে দুজন চাকর নিয়ে ফিরে এল। ওরা ধরাধরি করে নিয়ে গেল নার্সকে। পিছু পিছু বেরিয়ে গেলেন ডা. উইনচেস্টার। সার্জেন্ট ড তাকে অনুসরণ করল। কামরায় এখন আমি আর মার্গারেট একা।

আমার কাছে সেঁটে এল ও। ধরা গলায় বলল, 'আমার কথায় কিছু মনে কোরো না, ম্যালকম। সত্যি... তোমাকে ছোট করবার কোনও ইচ্ছে ছিল না আমার মনে...'

বাধা দিয়ে ওর হাতদুটো ধরলাম, চুমু খেলাম তালুর উল্টোপিঠে। বললাম, 'ভুলে যাও। আমি ওসব মনে রাখিনি।'

ওকে ছেড়ে দিয়ে তাকালাম আমি মি. ট্রেলনির দিকে। ভোরের আলো মোটামুটি ভালভাবেই ফুটেছে বাইরে, জানালা দিয়ে এসে ঢুকছে ঘরে, আঁধার কেটে যেতে শুরু করেছে। ভদ্রলোকের পাথরের মত অভিব্যক্তিহীন মুখটার দিকে তাকিয়ে ভাবনায় হারিয়ে গেলাম। গত ছাব্বিশ ঘণ্টায় যে-দুর্ভেদ্য রহস্যের মুখোমুখি হয়েছি, তার থই পেতে চাইলাম। ঘন ভুরু, চওড়া কপাল, আর চওড়া থুতনি মিলিয়ে মি. ট্রেলনির চেহারা অন্যরকম

লাগল; যেন গোপন কোনও বার্তা লুকিয়ে আছে ওখানে।

মার্গারেট আবার পাশে চলে এল আমার, কাঁধে মাথা রেখে নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করল। কথা বলতে পারলাম না, বলে লাভও নেই অবশ্য; শুধু ওর পিঠে হাত রেখে নীরব সান্ত্বনা দিলাম। মুহূর্তটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল, কিন্তু তাতে মার্গারেটের আপত্তি দেখলাম না।

কতক্ষণ এভাবে ছিলাম দুজনে, জানি না। হঠাৎ পায়ের শব্দ পেতেই সচকিত হয়ে উঠলাম। সরিয়ে নিলাম হাতটা। মার্গারেটও সোজা হয়ে বসল। একটু পরেই রুমে ঢুকলেন ডা. উইনচেস্টার। এগিয়ে এসে রোগীকে দেখলেন তিনি। বললেন, 'মি. ট্রেলনি আর নার্স কেনেডির সংজ্ঞাহীন অবস্থার মধ্যে প্রচুর মিল আছে। দুজনই একই কায়দায় আক্রান্ত হয়েছে বলে ধারণা করছি আমি। তবে কেনেডির অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভাল। শুঁকবার মত একটা ওষুধ দিয়েছি ওকে, তাতে বেশ উপকার হয়েছে। পেশির আড়ষ্টতা কমতে শুরু করেছে, চামড়াও কিছুটা সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে অসুখটা সারানো একেবারে অসম্ভব নয়।'

'মিল দেখছেন কোথায়?' ভুরু কোঁচকালাম। 'মি. ট্রেলনির পেশি তো আড়ষ্ট হয়নি। ওঁর শরীরে সাড়া নেই গতকাল থেকে, কোনও ধরনের সংবেদনশীলতাও চোখে পড়েনি একবারও। নার্স কেনেডির সঙ্গে মেলালে তো অনেক আগেই জ্ঞান ফিরে আসবার কথা ওঁর।'

'বললাম তো, ওঁর অবস্থাটা বেশি সিরিয়াস,' বললেন ডাক্তার। 'কেসটা জটিল, চট্ করে সমাধান পাওয়া যাবে না। তবে রোগটা নিয়ে গবেষণা করতে পারলে অনেক অজানা তথ্য পাওয়া যাবে—আমি নিশ্চিত!' ডাক্তারের ভিতর গবেষক সত্তা জেগে উঠছে, খুশি খুশি দেখাল তাঁকে।

সকালের আলো যতই উজ্জ্বল হলো, ততই ঘন ঘন দু'রুমে

ছোটাছুটি করতে থাকলেন ডাক্তার। নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন দুই রোগীকে। মিসেস গ্র্যান্ট আছে নার্স কেনেডির সঙ্গে, মি. ট্রেলনির কাছে রয়েছি আমি আর মার্গারেট। পালা করে মুখহাত ধুলাম আমরা, প্রাতঃকৃত্য সারলাম, নাস্তাও করলাম।

সকাল হতেই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে চলে গেল সার্জেন্ট ড। রাতের ঘটনার রিপোর্ট দেবে, সেই সঙ্গে খোঁজ নেবে সহকর্মী জনি রাইটের ব্যাপারে—লোকটা এখনও আসেনি, কোথাও ঝামেলা হয়েছে বোধহয়। সুপারিনটেনডেন্ট ডোলানের সঙ্গে কথা বলে ওর আসাটা নিশ্চিত করবে বলে ঠিক করেছে।

দিনটা কাটল চরম উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্যে। বিকেলে ফিরল ড। চেহারা দেখেই বুঝলাম, নির্দিষ্ট কোনও লক্ষ্য ছাড়াই গোলাগুলি করায় কর্তাদের বকা খেয়ে এসেছে। ব্যাপারটা অবশ্য লুকাবার চেষ্টা করল না সে। হাসিমুখে বলল, 'পুরনো সুনাম থাকার একটা ভাল দিক আছে, বুঝলেন? এই দেখুন, কেস থেকে সরিয়ে নেয়া হয়নি আমাকে, পিস্তলটাও কেড়ে নেয়নি।'

মৃদু হাসলাম কথাটা শুনে।

সন্ধ্যা নামার সময় নার্স কেনেডির অবস্থার বেশ উন্নতি ঘটল। পেশি শিথিল হয়ে গেল পুরোপুরি, হাত-পা নড়ানো যাচ্ছে। জ্ঞান অবশ্য ফেরেনি, তবে তার শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে স্বাভাবিকভাবে। ইতোমধ্যে আরও দুজন নার্স নিয়ে এসেছেন ডা. উইনচেস্টার—একজন কেনেডির দেখভাল করছে, অন্যজন মি. ট্রেলনির পাহারায় আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। মেয়েটি বেশ উৎসাহী, আগে থেকেই জানিয়ে দিল—রাতের প্রথম পালাটা সে পাহারা দেবে। প্রস্তুতির জন্য বিকেলে তাই কয়েক ঘণ্টার জন্য ঘুমাতে পাঠানো হলো ওকে।

সূর্য ডুবে যেতেই অজানা ভয় আর অনিশ্চয়তা জাপটে ধরল আমাদেরকে; যার যার মত সেটাকে সামাল দিতে চেষ্টা করলাম

আমরা। ডা. উইনচেস্টারকে দেখলাম আমার রেসপিরেটরের বিষয়টাকে খুব সিরিয়াসলি নিতে। তিনি নিজে একটা কিনে আনবেন বলে জানালেন, এমনকী মার্গারেটকেও রাজি করালেন ওর ডিউটির সময় একটা ব্যবহার করতে।

রাত ধীরে ধীরে গভীর হতে শুরু করল।

পাঁচ

আরও অদ্ভুত নির্দেশ

রাত সাড়ে এগারোটায় পাহারা দেবার জন্য নিজের রুম ছেড়ে মি. ট্রেলনির কামরায় গেলাম। একটামাত্র টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে ভিতরে। সেই আলোয় বিছানার পাশে চেয়ারে নতুন নার্সটিকে দেখলাম জাগ্রত ও সতর্ক অবস্থায় বসে থাকতে—গতকাল ঠিক ওখানেই বসেছিল নার্স কেনেডি। একটু দূরে, খাট আর সেফের মাঝামাঝি ডা. উইনচেস্টারও বসে আছেন—রেসপিরেটরে নাক-মুখ ঢাকা থাকায় কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছে ওঁর চেহারা। দরজায় দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছিলাম, পিছনে পায়ের শব্দ পেয়ে ঘাড় ফেরালাম; চোখাচোখি হলো নতুন ডিটেকটিভ জনি রাইটের সঙ্গে। সন্ধ্যার একটু পরে এসেছে সে। আমাকে দেখে ভদ্রতাসূচক একটা হাসি হাসল লোকটা, ঠোঁটের কাছে আঙুল তুলে নীরব থাকতে বলল, তারপর শব্দ না করে হেঁটে চলে গেল একদিকে। বুঝলাম, টহল দিচ্ছে। আজ রাতে পাহারার পরিমাণ বাড়ানো

হয়েছে, কেউ কোনও ঝুঁকি নিচ্ছে না।

দরজার বাইরে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম, শুরু করলাম ডিউটি। কোনও ধরনের ভয়ের আশঙ্কায় রুমের বাইরে অবস্থান নিইনি, আসলে পাহারার নিয়মই ঠিক করা হয়েছে এভাবে। বাইরে একজন রাখবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে আজ রাতে। অলসভাবে বসে থাকলে যা হয়, আবার এলোমেলো চিন্তা ভর করল মাথায়। যুক্তিগ্রাহ্য একটা উপসংহারে পৌঁছুতে চেষ্টা করলাম গত দুদিনের ঘটনা বিশ্লেষণ করে, কিন্তু পারলাম না। উল্টো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর অমূলক সন্দেহে আচ্ছন্ন হয়ে গেল মন। তাড়াতাড়ি মাথা ঝাড়া দিয়ে সমস্ত বাজে ভাবনা দূর করে দিলাম; কাল রাতের কথা মনে পড়ে গেছে, আলতু-ফালতু চিন্তা করতে করতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি। আজ তা হতে দেয়া যাবে না। সচেতন হয়ে সত্যিকার প্রহরীর মত পাহারা দিতে শুরু করলাম।

একটু পর ডা. উইনচেস্টার বেরিয়ে এলেন কামরা থেকে। মুখ থেকে রেসপিরেটরটা খুললেন, তারপর শুঁকে দেখলেন বাইরের দিকটা। কিছু বুঝলেন কি না, তা চেহারা দেখে আঁচ করা গেল না। জিনিসটা পকেটে ভরে রেখে তিনি বললেন, 'আমি এখন বাড়ি যাচ্ছি, সকালে তাড়াতাড়ি চলে আসব... যদি না রাতদুপুরে আবার আপনারা ডেকে পাঠান আর কী!' একটু কৌতুকের সুর ফুটল তাঁর গলায়। পরমুহূর্তে আবার সিরিয়াস হয়ে বললেন, 'চিন্তার কিছু নেই। আজ রাতে সমস্যা হবার মত কিছু চোখে পড়েনি আমার।'

চলে গেলেন তিনি। খানিক পরেই উদয় হলো সার্জেন্ট ড, ডাক্তারের জায়গা নিতে এসেছে। আমি বাইরে রইলাম, মাঝে মাঝে উঁকি দিতে থাকলাম রুমের ভিতরে, পরিস্থিতি বোঝার জন্য। অবশ্য বিশেষ সুবিধে করতে পারছি না, ভিতরে আলোর পরিমাণ খুব কম, ঠিকমত ঠাহর করা যায় না কিছু।

বারোটায় এল মার্গারেট। বাবার রুমে ঢোকার আগে নার্স কেনেডিকে দেখতে গেল। মিনিটদুয়েক পর ফিরে এল ও, চেহারায় কিছুটা স্বস্তি ফুটে উঠেছে... সম্ভবত কেনেডির শারীরিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছে দেখে। আমার কাছে এসে জানতে চাইল, এর মাঝে নতুন কোনও ঘটনা ঘটেছে কি না। জবাবে জমি রাইটের মত ঠোঁটের কাছে আঙুল তুললাম আমিও। আজ রাতে উঁচু গলায় কথা বলা যাবে না এ-বাড়িতে, সে-রকমই নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন ডাক্তার। ব্যাপারটা ওকে বুঝিয়ে দিলাম, সেইসঙ্গে ফিসফিসিয়ে জানালাম—সব স্বাভাবিক আছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে মুখে রেসপিরেটর পরল মার্গারেট, পরলাম আমিও। তারপর দুজনে গিয়ে ঢুকলাম মি. ট্রেলনির কামরায়। আমাদের দেখে নতুন নার্সটি উঠে দাঁড়াল। সার্জেন্ট ড-কে বললাম, তার অসুবিধে না হলে মার্গারেটের সঙ্গে আমি থাকতে চাই। আপত্তি করল না সে, নার্সসহ বেরিয়ে গেল রুম থেকে, যাবার পথে টেনে দিয়ে গেল দরজাটা।

অনেকক্ষণ নীরবতায় কাটল, নিজের বুকের ধুকপুকানি পরিষ্কার শুনতে পেলাম। কামরার ভিতরটা অন্ধকারে ছাওয়া, একটামাত্র টেবিল-ল্যাম্প তার মোকাবেলায় কিছুই নয়। মৃদু আলোটা বরং ছায়াকে গাঢ় করে তুলেছে আরও। কাল রাতের মত আজও ছায়াকে জ্যান্ত মনে হলো। তবে আজ আর ঘুম পাচ্ছে না, প্রতি দশ মিনিট অন্তর উঠে গিয়ে মি. ট্রেলনিকে দেখে আসতে থাকলাম। মার্গারেটও জেগে আছে। আধ ঘণ্টা পর পর দুই ডিটেকটিভও পালা করে দরজা খুলে উঁকি দিচ্ছে ভিতরে। কথা বলে তাদের জানিয়ে দিচ্ছি, কোনও অসুবিধে নেই।

যতই সময় পেরুল, নীরবতা আর অন্ধকার যেন ততই বেড়ে চলল। টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বলছে বটে, কিন্তু আলোটা মনে হলো ম্লান হয়ে গেছে আগের চেয়ে। বাইরে থেকে ভেসে আসা নির্ঘুম

শহরের আবছা শব্দ, চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে থাকা জানালার কিনারা, আঁধারে ছেয়ে থাকা ঘরের অভ্যন্তর... সব মিলিয়ে পরিবেশটা গা-ছমছমে হয়ে উঠেছে।

করিডরের ঘড়িতে রাত দুটো বাজার ঘণ্টা পড়ল, আর তার একটু পরেই অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো আমার। মার্গারেটকে মাথা ঘুরিয়ে চারপাশে তাকাতে দেখলাম, ও-ও কিছু অনুভব করতে শুরু করেছে নিশ্চয়ই। ডিটেকটিভ একটু আগে উঁকি দিয়ে গেছে দরজা খুলে, আগামী অন্তত পনেরো মিনিটের জন্য আমরা একা।

হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে গেল, ভয় পেতে শুরু করলাম হঠাৎ করে। মনে হলো নতুন কেউ উপস্থিত হয়েছে ঘরে! পায়ের সঙ্গে ঘষা খেল কী যেন, হাত বাড়াতেই সিলভিও-র নরম লোমের স্পর্শ পেলাম। গরগর করে উঠল বেড়ালটা, খামচে দিল আমাকে। হাতে রক্তের উষ্ণতা অনুভব করলাম। উঠে গিয়ে বিছানার কাছে ছুটে গেলাম ত্রস্ত পায়ে। মার্গারেটও দাঁড়িয়ে পড়েছে, ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে পিছনদিকে, যেন কিছু একটা ওর খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে। হাপরের মত ওঠানামা করছে ওর বুক, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ওর গায়ে হাত দিতেই ঝটকা দিয়ে দূরে সরে গেল, আমাকে চিনতেই পারছে না যেন। আবার এগোবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু হাত-পা ছুঁড়ে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পাগল হয়ে গেল ও।

গোলমাল যে বেধেছে, তাতে আর সন্দেহ রইল না। ইতিকর্তব্য নির্ধারণে দেরি করলাম না, বাধা-টাধা এড়িয়ে জাপটে ধরলাম মার্গারেটকে, আলগোছে কাঁধে তুলে ছুটে গেলাম দরজার কাছে। চেঁচিয়ে উঠলাম সাহায্যের জন্য।

চোখের পলকে দুই ডিটেকটিভ হাজির হলো, পিছু পিছু মিসেস গ্র্যান্ট আর নতুন নার্স। কয়েকজন চাকরও ছুটে এল

কয়েক সেকেণ্ডের ভিতর। মার্গারেটকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম করিডরে, ওকে মিসেস গ্র্যান্টের হাতে সঁপে দিয়ে আবার ঢুকলাম রুমে। সুইচ টিপে জ্বেলে দিলাম দেয়ালের বাতিগুলো। আমাকে অনুসরণ করে সার্জেন্ট ড আর নতুন নার্সও ঢুকেছে রুমে, সবাই একযোগে তাকালাম সেফের দিকে। মি. ট্রেলনিকে যথারীতি ওখানে পড়ে থাকতে দেখলাম। তবে সৌভাগ্যের কথা, নতুন কোনও আঘাত নেই ওঁর শরীরে... এক্কেবারে সময়মত বাগড়া দিয়েছি আমরা। আরেকটু দেরি হলে সর্বনাশটা ঠেকানো যেত না। ব্যাণ্ডেজের বেশ ক'টা ছেঁড়া টুকরো পড়ে আছে আশপাশে, আর পড়ে আছে বাঁকানো একটা মিশরীয় ছুরি—জিনিসটা গতকাল ভাঙা কেবিনেটের ভিতর দেখেছি আমি। ছুরির ডগাটা বিঁধে আছে কাঠের মেঝেতে।

এটুকু বাদ দিলে কামরাটার বাকি সবকিছু রয়েছে আগের মত, কোথাও কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। চাকররা ধরাধরি করে মি. ট্রেলনিকে বিছানায় নিয়ে গেল, সেই ফাঁকে আমি আর সার্জেন্ট ড পুরো রুমে তল্লাশি চালালাম। কিন্তু খাটুনিটাই সার হলো, ঘটনাটার পিছনে কোনও সূত্র পাওয়া গেল না।

খানিক পরেই রুমে ফিরে এল মার্গারেট। চেহারা ফ্যাকাসে, তবে নিজেকে সামলে নিয়েছে। আমাদের কাছে এসে বলল, 'কী ঘটেছে কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। হঠাৎ করে ভয় লাগছিল খুব, মনে হচ্ছিল অজ্ঞান হয়ে যাব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বিছানার দিকে এগোলাম, মি. ট্রেলনিকে দেখব। পিছন থেকে মার্গারেট আঁতকে উঠে বলল, 'এ কী! তোমার হাতে এত রক্ত কেন?'

এতক্ষণে চিনচিন করে উঠল হাতটা। উত্তেজনার ঠেলায় সিলভিও-র আঁচড়ের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। মুখ খোলার সময় পেলাম না, মার্গারেট কাছে এসে হাতটা পরীক্ষা করল। সমান্তরাল

কয়েকটা আঁচড় পড়েছে, ও বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'আরে! এগুলো তো ঠিক বাবার প্রথম ক্ষতটার মত!'

শান্ত রইলাম আমি। বললাম, 'সিলভিও খামচি দিয়েছে আমার হাতে।'

'অসম্ভব!' মাথা নাড়ল মার্গারেট। 'ও আমার রুমে, নিজের ঝুড়িতে ঘুমাচ্ছে! বিশ্বাস না হলে এসো, দেখাচ্ছি।'

ওর পিছু পিছু পাশের বেডরুমে গেলাম। সিলভিও-কে ঝুড়িতেই পাওয়া গেল বটে, তবে ঘুমাচ্ছে না। জেগে আছে, থাবা চাটছে।

ড বলল, 'হুম। এই তো বেড়ালটা! কিন্তু পা চাটছে কেন?'

বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করে ঝুঁকল মার্গারেট, সিলভিও-র থাবাটা দেখতে চাইল। কিন্তু বেড়ালটার তাতে ঘোর আপত্তি, ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইছে। মিসেস গ্র্যান্ট এসে ঢুকল ঘরে, সিলভিওকে নিয়ে কর্ত্রীর টানাহেঁচড়া দেখে বলল, 'করছেন কী, ম্যা'ম! বেড়ালটা তো এতক্ষণ নার্স কেনেডির বিছানায় উঠে ঘুমাচ্ছিল।'

'কী!' চমকে উঠল মার্গারেট। 'ওখানে গেল কখন?'

'আপনি পাহারায় যাবার পরপরই,' জানাল মিসেস গ্র্যান্ট। 'ফিরেছে এই একটু আগে। বাদ দিন ওর কথা, এদিকে আরেকটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। নতুন নার্সটা বলল, কেনেডি নাকি অজ্ঞান অবস্থাতে গোঙাচ্ছে... প্রলাপ বকছে। যেন দুঃস্বপ্ন দেখছে ও। আমার মনে হয়, ডা. উইনচেস্টারকে খবর দেয়া দরকার।'

'এক্ষুনি পাঠাও কাউকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল মিসেস গ্র্যান্ট। আমরা ফিরে গেলাম মি. ট্রেলনির কামরায়। বাবার বিছানার পাশে নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল মার্গারেট, চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে থাকল ওর। খানিক পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিরল আমার দিকে। বলল, 'তোমার

কী মনে হয়, ম্যালকম? বাবার ব্যাপারে কি অন্য কারও মতামত নেব? ডা. উইনচেস্টারকে অসম্মান জানিয়ে বলছি না কথাটা; ওঁর উপর আমার আস্থা আছে, বুদ্ধিমান লোক। কিন্তু বয়স তো বেশি নয় ওঁর। অভিজ্ঞতা বলে একটা কথা আছে না? এমনিতে তো কিছুই করতে পারছেন না উনি। আরেকটু অভিজ্ঞ... আরেকটু জ্ঞানী কেউ হয়তো বাবাকে সুস্থ করতে পারবে...' বলতে বলতে গলা ধরে এল ওর। তাড়াতাড়ি ওকে ধরে সান্ত্বনা দিলাম।

ডা. উইনচেস্টার এসে পড়লেন খুব অল্প সময়ের ভিতরে। রাতদুপুরে পর পর তিনদিন ঘুম নষ্ট করে ছুটে আসতে হয়েছে তাঁকে, কিন্তু চেহারায় কোনও অসন্তোষ লক্ষ করলাম না। ঘরে ঢুকেই প্রথমে মি. ট্রেলনির খোঁজ নিলেন তিনি, তারপর গেলেন নার্স কেনেডিকে দেখতে। রোগিণীকে পরীক্ষা করে স্বস্তি ফুটতে দেখলাম ভদ্রলোকের মুখে। ভেজা একটা তোয়ালে দিয়ে মুছে দিলেন অচেতন নার্সের মুখটা। চামড়ায় গোলাপী আভা ফিরল, ঠাণ্ডা তোয়ালের স্পর্শে একটু কেঁপেও উঠল মেয়েটি। সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে নতুন নার্সের দিকে ফিরলেন ডাক্তার। নার্সের নাম সিস্টার ডোরিস—ইতোমধ্যে জানতে পেরেছি আমরা।

ডাক্তার বললেন, 'সব ঠিক আছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জেগে উঠবে ও। জ্ঞান ফেরার পর একটু অপ্রকৃতিস্থ থাকতে পারে, হিস্টিরিয়ার লক্ষণও দেখাতে পারে... কিন্তু সেজন্যে কী করতে হবে, তা জানো তো?'

'জী সার,' সায় দিল ডোরিস আর ওর সঙ্গিনী অপর নার্স।

'খুব ভাল।'

আমাকে আর মার্গারেটকে নিয়ে মি. ট্রেলনির রুমে ফিরে এলেন ডাক্তার। পুরো ঘটনা জানতে চাইলেন। সব খুলে বললাম আমি। জেরা করার ভঙ্গিতে খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় জেনে নিলেন ভদ্রলোক। কথা যখন শেষ হলো, তখন তাঁকে একটু চিন্তিত

দেখাল। মার্গারেটের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মিস ট্রেলনি, আমার মনে হয় এ-পরিস্থিতিতে একজন অকাল্ট বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেয়া দরকার।'

'আমিও ও-কথাই ভাবছিলাম,' বলল মার্গারেট। 'ডাকুন যাকে খুশি, আমার কোনও আপত্তি নেই।'

'আপনার পছন্দের কেউ আছে?' জানতে চাইলেন ডাক্তার। 'পূর্ব-পরিচিত, কিংবা আপনার বাবার কোনও চিকিৎসা করেছে আগে...'

'অমন কারও কথা আমি জানি না। সবচেয়ে ভাল হয় আপনি নিজেই কাউকে বাছাই করে আনলে। এ-মুহূর্তে এ-লাইনে সেরা লোক কে?'

'ভাল ভাল অনেকেই আছে। তবে আমাকে জিজ্ঞেস করলে *কিং'স কলেজ*-এর ফ্রেয়ারের কথা বলব। থিয়োরি আর বাস্তবতার মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে তাঁর মত আর কেউ কাজ করতে জানে না। প্রতিভা একটা, কাজ নিয়েই আছেন চব্বিশ ঘণ্টা, শখ-টখ বলতে কিছু নেই। ভদ্রলোকের অভিজ্ঞতার ঝুলিও বিশাল।'

'তা হলে ডক্টর ফ্রেয়ারকেই খবর দিন,' সিদ্ধান্ত নেয়ার সুরে বলল মার্গারেট। '*ডক্টর*-ই তো, নাকি *মিস্টার* ফ্রেয়ার?'

'কোনোটাই না,' হালকা সুরে বললেন ডাক্তার; মার্গারেটের অনুমতি পাওয়ায় কাঁধের বোঝা অনেকটাই যেন হালকা হয়ে গেছে তাঁর। 'উনি একজন *নাইট*। সার জেমস ফ্রেয়ার। আমি যাই, দেখি সকালে ওঁকে নিয়ে আসতে পারি কি না। তবে...' আমার দিকে ফিরলেন তিনি, 'যাবার আগে আপনার হাতটা দেখে যেতে চাই।'

'ব্যস্ত হবেন না,' বললাম আমি। 'সামান্য জখম, ডাক্তার দেখাবার মত কিছু নয়।'

'বোকার মত কথা বলবেন না!' চোখ রাঙালেন ডাক্তার।

'পশুপাখির আঁচড়-কামড় কখনও অবহেলা করতে নেই। বড় ধরনের বিপদ ঘটে যেতে পারে। দেখি, বাড়ান হাতটা।'

অগত্যা দেখতে দিলাম তাঁকে জখমটা। জীবাণুনাশক দিয়ে ক্ষতটা পরিষ্কার করে ড্রেসিং করে দিলেন ডাক্তার, এক ফাঁকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন জায়গাটা। পকেট থেকে গতকালের কাগজটা বের করতে দেখলাম তাঁকে, যেটায় সিলভিও-র আঁচড়ের ছাপ নিয়েছিলেন। আমার ক্ষতের সঙ্গে ওটা মেলালেন তিনি, তবে ফলাফলটা বুঝতে পারলাম না। ডাক্তার শুধু বললেন, 'অসময়ে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ানো উচিত না বেড়ালটার।'

এরপর বিদায় নিলেন তিনি।

সকাল দশটার দিকে প্রায় পুরোপুরিই সুস্থ হয়ে উঠল নার্স কেনেডি। জ্ঞান ফিরেছে আগেই, এখন উঠে বসতে পারছে, ঠিকমত কথাও বলতে পারছে। সেদিনকার রাতের ব্যাপারে কিছু জানা যায় কি না, সে-চেষ্টা করে দেখলাম আমরা, তবে বিফলমনোরথে ফিরতে হলো। কেনেডি কিছুই মনে করতে পারছে না।

এগারোটায় সার জেমস ফ্রেয়ারকে নিয়ে এলেন ডা. উইনচেস্টার। নীচতলায় ওঁদের উদয় হতে দেখে মার্গারেটের জন্য করুণা অনুভব করলাম—সম্পূর্ণ অচেনা আরেকজন মানুষের কাছে পিতার সঙ্গে ওর দূরত্বের কথা খুলে বলতে হবে।

সার ফ্রেয়ার ব্যক্তিত্ববান মানুষ, দেখলে আপনাতেই শ্রদ্ধা জাগে। চোখদুটো অন্তর্ভেদী, চেহারায় কাঠিন্য... দেখে বোঝা যায়, দৃঢ় চরিত্রের লোক; মানুষকে বশে রাখতে জানেন। একটু শঙ্কিত হলাম, গোঁয়ার-টোঁয়ার কি না, তা ভেবে; কিন্তু পরিচিত হবার পর ভেঙে গেল ভুল ধারণা। সার ফ্রেয়ার অত্যন্ত অমায়িক,

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের একজন হয়ে গেলেন। ডা. উইনচেস্টার-সহ তাঁকে মি. ট্রেলনির রুমে ঢুকতে দেখে আশান্বিত হয়ে উঠলাম সবাই।

রুমটাতে অনেকটা সময় কাটালেন ওঁরা, আর কাউকে ঢুকতে দিলেন না। মাঝে একবার সিস্টার ডোরিসের ডাক পড়েছিল, তবে ও-ও বেশিক্ষণ থাকেনি। মি. ট্রেলনির পরে নার্স কেনেডিকে দেখতে গেলেন দুজনে। ওখানে যে-নার্স ডিউটি করছিল, তাকে বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হলো, শুধু ওঁরাই রইলেন ভিতরে। পরে ডা. উইনচেস্টারের কাছে শুনেছি যে, কেনেডির কাছ থেকে পুংখানুপুংখভাবে সে-রাতের ঘটনা জেনে নিয়েছিলেন ফ্রেয়ার... মানে ওর অজ্ঞান হবার আগ পর্যন্ত আর কী। দুই রোগীকে দেখা শেষে স্টাডিতে গিয়ে আলোচনায় বসলেন দুই চিকিৎসক। বাইরে থেকে আমরা মাঝে মাঝে তাঁদের উঁচু গলা শুনতে পাচ্ছিলাম; তা থেকে বোঝা যাচ্ছিল—উত্তপ্ত বিতর্ক চলছে দুজনের মধ্যে। একেকবার প্রায় ঝগড়ার পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছিল হৈচৈ, বাইরে আমরা দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠছিলাম।

যা হোক, কোনোরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়া এক সময় শেষ হলো বৈঠক। স্টাডি থেকে বেরিয়ে ডা. উইনচেস্টার বললেন, মার্গারেট আর আমাকে ডেকেছেন সার ফ্রেয়ার। অনুসরণ করলাম তাঁকে। স্টাডির দরজা বন্ধ হতেই ফ্রেয়ার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শুনেছি আপনি মিস ট্রেলনির ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ঘটনাটার সঙ্গে শুরু থেকে আছেন... তাই ঠিক করেছি, আপনাকে সঙ্গে রাখব। মানে... আপনার যদি কোনও অসুবিধে না-থাকে আর কী!'

'না, না, অসুবিধে কীসের?' তাড়াতাড়ি বললাম আমি। 'তবে একটা প্রশ্ন না করে পারছি না—আমার কাছ থেকে ঠিক কী ধরনের সাহায্য পাবেন বলে আশা করছেন আপনারা?'

'নির্দিষ্ট কোনও কিছু নয়। আসলে... বাড়তি একজন মানুষ সঙ্গে থাকলে কিছু না কিছু উপকার হয়। অবশ্য, আপনি উকিল হওয়ায় একটা লাভও আছে। রহস্যটার মূলে যদি স্রেফ খুনের চেষ্টা বা ডাকাতির মোটিভ আবিষ্কৃত হয়, তা হলে আপনার আইনি বিদ্যাটা কাজে লাগবে আমাদের।'

'আমি রাজি,' সম্মতি দিলাম প্রস্তাবে।

মার্গারেটের দিকে ফিরলেন এবার ফ্রেয়ার। 'মিস ট্রেলনি, আপনার বিষয়টাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রোগীকে দেখেছি আমি, ডাক্তারি চিকিৎসার জন্য উইনচেস্টারের পদ্ধতিটা ঠিক আছে, ওতে আমি নাক গলাতে চাই না। আমি কাজ করব অন্য লাইনে, কিন্তু সেটার জন্য আমার একটা শর্ত আছে—রোগীকে ওই কামরা থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে, নইলে সরিয়ে নিতে হবে জঘন্য ওই আর্টিফ্যাক্টগুলো। জানি, বাবার দেয়া একটা নির্দেশ পালন করছেন আপনি, হাত-পা বাঁধা... তারপরও এই কাজটা করতে হবে আপনাকে। পরিবেশটা না বদলালে কাজ করতে পারব না আমি, কাজেই আমার শর্তটাকে অলঙ্ঘ্য ধরে নিতে পারেন। যদি রাজি থাকেন, শুধু তা হলেই আমি কেসটা নেব। অন্যথায় নয়।'

দ্বিধায় পড়ে গেল মার্গারেট, পালা করে তাকাল আমার আর ডা. উইনচেস্টারের দিকে, কিন্তু আমরা কোনও পরামর্শ দেয়া থেকে বিরত থাকলাম। শেষে ইতস্তত করে ও বলল, 'আ... আমাকে একটু ভেবে দেখতে হবে।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকালেন ফ্রেয়ার। 'কী সিদ্ধান্ত নিলেন, সেটা জানাবেন আমাকে। এখন তা হলে আসি।'

বিদায় নিয়ে চলে গেলেন ভদ্রলোক, ডাক্তার তাঁকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলেন। ফিরে এসে বললেন, 'ডাক্তার হিসেবে ওঁর প্রস্তাবটা অগ্রাহ্য করতে পারছি না। মি. ট্রেলনিকে অন্য রুমে সরিয়ে নিতে পারলে আসলেই ভাল হতো। কিন্তু আমরা যে অদ্ভুত

চিঠিটার কারণে আটকা পড়ে গেছি, সেটা বোঝাতে পারলাম না। একগুঁয়ে লোক, অমন একটা শর্ত দিচ্ছেন দেখে ঝগড়া জুড়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু টলাতে পারলাম না। এখন... মিস ট্রেলনি... পুরো ব্যাপারটা আপনার উপর নির্ভর করছে।'

'আপনিও চলে যাবেন না তো?' শঙ্কিত গলায় জিজ্ঞেস করল মার্গারেট। 'আমার পক্ষে বাবার নির্দেশ অমান্য করা সম্ভব নয়। চিকিৎসা যদি চালিয়ে যেতে চান, বাবাকে তাঁর রুমে রেখেই চালাতে হবে।'

'নিশ্চিন্ত থাকুন,' হেসে বললেন ডাক্তার। 'আমি অত সহজে যাচ্ছি না। এমন ইন্টারেস্টিং কেস কেউ হাতছাড়া করে? যতক্ষণ সম্ভব, আমি চেষ্টা করে যাব।'

'শুনে খুশি হলাম,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মার্গারেট। 'তবে আপনার ওই বিশেষজ্ঞকে আমার খুব একটা পছন্দ হয়নি। আপনার আগ্রহের ছিটেফোঁটাও দেখলাম না ওঁর মধ্যে, নিজের শর্ত নিয়ে আছেন, কেসটা ছেড়ে দিতেও দ্বিধা নেই। তা ছাড়া কথাবার্তা শুনে তো মনে হলো না, আপনার চাইতে খুব বেশি কিছু বুঝতে পেরেছেন...'

'মানা করে দিতে চান ওঁকে?'

একটু ভাবল মার্গারেট। 'না, এখুনি নয়। আগে দেখি, বাবার নির্দেশ অমান্য না করে ওঁর শর্তপূরণের কোনও ব্যবস্থা আছে কি না। আমি আজই মি. মারভিনের সঙ্গে কথা বলব, ওঁর কাছে বাবার চিঠিটার ব্যাখ্যা থাকবার কথা।'

পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে ছোট্ট একটা চিঠি লিখে ফেলল ও সঙ্গে সঙ্গে, মি. মারভিনকে ট্রেলনি হাউসে আসতে অনুরোধ করল তাতে। চিঠিসহ একটা ক্যারিজ পাঠিয়ে দেয়া হলো আইনজীবী ভদ্রলোকের কাছে।

কেনসিংটন প্যালেস রোড থেকে লিঙ্কন ইন খুব একটা দূরে

নয়। চিঠি পেয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে হাজির হয়ে গেলেন মি. মারভিন। মার্গারেটের মানসিক অস্থিরতা দেখে সরাসরি কাজের কথা পাড়লেন তিনি। বললেন, 'আপনি যখনই চাইবেন, মি. ট্রেলনির নির্দেশনা সম্পর্কে বিস্তারিত খুলে বলতে তৈরি আছি আমি, মিস ট্রেলনি।'

'যখনই মানে!' একটু বিরক্ত হলো মার্গারেট। 'এখুনি বলতে অসুবিধে কোথায়?'

'আপনি এ-মুহূর্তে একা নন,' আমার দিকে ইঙ্গিত করলেন আইনজীবী।

'মি. রস আমার প্রয়োজনেই এখানে উপস্থিত হয়েছেন,' বলল মার্গারেট। 'ওর কাছে কোনও কিছু গোপন রাখবার কারণ দেখছি না আমি।'

'একটু বুঝতে চেষ্টা করুন, মক্কেলের কনফিডেনশিয়ালিটির ব্যাপার...'

বাধা দিল মার্গারেট। বলল, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে ওসবের কোনও মূল্য নেই। আমার কথাই ভাবুন—বাবা সারাজীবন নিজেকে আড়াল করে রেখেছে আমার কাছ থেকে। তাঁর শেষ ইচ্ছের কথা আমাকে শুনতে হচ্ছে একজন অপরিচিত মানুষ... আপনার কাছ থেকে। চিঠি একটা লিখে রেখে গেছে বটে, কিন্তু আমাকে ওটার কথা কক্ষনো বলেনি। না, মি. মারভিন, আপনার সঙ্গে একাকী বসবার কোনও দরকার নেই। ব্যাপারটা অত গোপনই যদি হতো, তা হলে বাবা আপনাকেও জড়াত না। তা ছাড়া ম্যালকম আমার খুব কাছের মানুষ, ওকে আমি অবিশ্বাস করি না।'

আইনজীবীর মুখ কালো হয়ে গেল কড়া কথা শুনে। কথা বলতে পারলেন না তিনি। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুল ধরতে পারল মার্গারেট। ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত,

মি. মারভিন। ওভাবে বলতে চাইনি কথাটা। আসলে... আসলে মাথা কাজ করছে না আমার। ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে। আমি আসলে একা থাকতে চাইছি না। ম্যালকমকে পাশে রাখতে চাইছি আমি... যদি বাবার নির্দেশে এ-ব্যাপারে কোনও নিষেধ না থাকে।'

'না, না, কোনও নিষেধ নেই,' তাড়াতাড়ি বললেন মারভিন। 'সাক্ষী থাকলে তো ভালই হয়। ঠিক আছে, বলছি তা হলে। আপনার বাবার লেখা চিঠিটা সম্পর্কে জানি আমি, মিস ট্রেলনি। ওটা আসলেই অলঙ্ঘনীয়। সামান্যতম নড়চড় হতে পারবেন না চিঠির নির্দেশগুলো থেকে। ব্যাপারটা এতই সিরিয়াস যে, আপনার বাবা আমাকে পাওয়ার অভ অ্যাটর্নি দিয়ে গেছেন, যাতে প্রয়োজন হলে আমি আপনাদের ওই নির্দেশগুলো মানতে বাধ্য করতে পারি।'

'কী বলছেন আপনি!' চমকে উঠল মার্গারেট, ওর সঙ্গে আমিও।

'ঠিকই শুনেছেন,' বললেন মারভিন। 'আমার কাছ থেকে ওয়াদা আদায় করেছেন মি. ট্রেলনি, যাতে কিছুতেই ওঁর দেহ ওই কামরা থেকে সরাতে না দিই। ওখান থেকে একটা জিনিস-ও যেন এদিক-সেদিক না হয়—সেটা যেন নিশ্চিত করি। সত্যি বলতে কী, সমস্ত আর্টিফ্যাক্টের একটা তালিকাও উনি আমাকে দিয়ে রেখেছেন যাতে মিলিয়ে দেখতে পারি।'

'তালিকাটা দেখতে পারি?'

'যতক্ষণ না আমাকে পাওয়ার অভ অ্যাটর্নি প্রয়োগ করতে হচ্ছে, ততক্ষণ ওটা দেখার কোনও দরকার নেই, মিস ট্রেলনি। মাফ করবেন আমাকে, কিছু কিছু জিনিস গোপন রাখতে হচ্ছে মক্কেলের স্বার্থে। তবে আসল ব্যাপারটা আমিও ঠিক জানি না। এসবের পিছনে কোনও একটা উদ্দেশ্য আছে মি. ট্রেলনির, কিন্তু

সেটা আমাকে বলেননি তিনি। শুধু এটুকু নিশ্চিত করে বলতে পারি, নির্দেশগুলোর ব্যাপারে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। ওগুলো মানতেই হবে আপনাকে। পাওয়ার অভ অ্যাটর্নির কাগজটা আমি নিয়ে এসেছি, মি. রস চাইলে ওটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।'

দেখলাম। মি. মারভিনের কথাই ঠিক, ওটায় কোনও খুঁত নেই। মেয়ের কাছে লেখা চিঠির প্রতিটি নির্দেশ যেন অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়, সেটা নিশ্চিত করবার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ভদ্রলোকের উপর। আইনের কোনও ফাঁক নেই ওতে। কাগজটা ফিরিয়ে দিলাম আমি।

'আর কিছু জানতে চান?' জিজ্ঞেস করলেন মারভিন।

মাথা নাড়ল মার্গারেট।

'আমি তা হলে আসি,' বললেন মারভিন। নিজের ভিজিটিং কার্ড দিলেন মার্গারেটকে। 'এখানে আমার অফিস-বাসা... দু'জায়গারই ঠিকানা আছে। কোনও প্রয়োজন হলেই খবর দেবেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে চলে আসব। দিন-রাত... যখনই হোক না কেন।'

ভদ্রলোক চলে যেতেই উদয় হলো মিসেস গ্র্যান্ট। চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ। কী হয়েছে, জানতে চাইল মার্গারেট।

'খারাপ খবর, মিস, মাত্র দু'জন বাদে বাকি সব চাকর-বাকর আজই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চাইছে। ওদের মধ্যে আপনার খানসামাও আছে। বেতন-টেতনের ধার ধারছে না ওরা; বলেছে, এ-বাড়িতে আর থাকবে না।'

'কেন, তা বলেছে?'

'ওদের ধারণা, বাড়িটা অভিশপ্ত।'

অন্য সময় হলে হয়তো হেসে ফেলতাম কথাটা শুনে, কিন্তু আজ পারলাম না। মার্গারেটের চেহারায় মেঘ জমতে দেখলাম,

আমার ভিতরেও একটা অশুভ চিন্তা জেঁকে বসল। চাকররা যেন মনের কথাটা বলেছে। সত্যিই অভিশাপ নেমে এসেছে ট্রেলনি হাউসের উপর।

ছয়

সন্দেহ

খুব দ্রুত নিজেকে সামলে নিল মার্গারেট। আত্মমর্যাদা বজায় রাখার সুরে বলল, 'ঠিক আছে, মিসেস গ্র্যান্ট, যেতে পারে ওরা। খালি হাতেও যাবার দরকার নেই, আজকের দিন পর্যন্ত পুরো বেতন, সেই সঙ্গে এক মাসের অগ্রিম দিয়ে দাও ওদের। এতদিন খুব ভালমত কাজ করেছে ওরা, তার পুরস্কার পাওয়া দরকার। চলে যেতে যে চাইছে, তা তো আর স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নয়। ভয়ের মধ্যে কাজ করবে কীভাবে? ওদেরকে বলে দাও, এখানে সব ঠিকঠাক হয়ে গেলে আবার ফিরতে পারবে ওরা, দরজা খোলা রইল।'

'কাজটা ঠিক করছেন না,' মনঃক্ষুণ্ন কণ্ঠে বলল মিসেস গ্র্যান্ট। 'বিশ্বাসঘাতকের দল! এতদিন কত্তো ভালভাবে রেখেছেন ওদের, নিজে ওদের ভালমন্দের খোঁজখবর নিয়েছেন। সামান্য বিপদ দেখেই যারা এমন মালিকের পাশ থেকে কেটে পড়ে, তাদের কোনও দয়া দেখানো ঠিক না।'

'থাক, ওভাবে বোলো না,' বাধা দিয়ে বলল মার্গারেট। 'যাও,

ওদের পাওনা মিটিয়ে দাও। আর হ্যাঁ, যারা থাকবে, তারা আগামীতে দ্বিগুণ বেতন পাবে—এ কথা বলে দিয়ো।'

'তাতে বিশেষ লাভ হবে বলে মনে হয় না। ভয় পেয়েছে ওরা, টাকার লোভে থাকবে না।'

'লোভ দেখাচ্ছি না, বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে থাকবে বলে এই বাড়তি বেতন। যাক গে, না থাকলে তো আর জোর করা যাবে না। বলে দেখো, কেউ থাকে কি না। নইলে তুমি আর অন্য যে-দুজন থাকছ, তাদের দিয়েই কাজ চালিয়ে নিতে হবে। ...মানে, যতদিন না নতুন চাকর পাচ্ছি আর কী। যাও, টাকা-পয়সা কিন্তু একেবারে পাই-পাই করে হিসেব করে দেবে। কারও যেন কোনও দাবি না থাকে।'

কাঁধ ঝাঁকাল মিসেস গ্র্যাণ্ট। বলল, 'সাত জনমের ভাগ্য ওদের... এমন রাজকন্যার মত মালকিন পেয়েছে।' উল্টো ঘুরে বেরিয়ে গেল সে।

কথাটা আমার মনে দাগ কাটল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলাম মার্গারেটকে। হ্যাঁ, রাজকীয় অবয়বই বটে। তন্বী, একহারা দেহ; দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে আত্মমর্যাদার ছাপ। ওকে প্রথম দেখেছিলাম বেলগ্রেভ স্কয়্যারের বলনাচের আসরে, সেদিন পুরোপুরি রাজকন্যার মতই লেগেছিল। কালোর উপর সোনালি ফুলের নকশাকাটা একটা গাউন পরেছিল ও, মাথার চুলে গোঁজা ছিল একটা পুরনো মিশরীয় মুকুট, হাতেও পরেছিল একটা অ্যান্টিক ব্রেসলেট। বলনাচের এক আয়োজক যখন আমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিলেন, তখন কিছুটা সিঁটিয়ে ছিলাম... নিজেকে বড্ড ক্ষুদ্র মনে হচ্ছিল ওর সামনে।

মার্গারেটের ডাকে ধ্যান ভাঙল। যে-সব চাকর চলে যাবে, ওদের সঙ্গে শেষবারের মত কথা বলতে যাচ্ছে। আমি যাব কি না, জানতে চাইল। মাথা নাড়লাম, ইচ্ছে করছে না।

শেষ বিকেলে ট্রেলনি হাউসে ফিরে এল সার্জেন্ট ড। আমি তখন স্টাডিতে, সময় কাটাবার জন্য একটা বই পড়বার ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছি। মন এতই বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে যে, বইয়ের পাতায় কিছুতেই মন বসাতে পারছি না। বাড়িতে ঢুকেই আমার কাছে চলে এল ডিটেকটিভ, স্টাডির দরজা বন্ধ করে ইতি-উতি চাইল, যেন নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে, ঘরে আর কেউ নেই। ব্যাপারটা লক্ষ করে ভুরু কুঁচকে গেল আমার। জিজ্ঞেস করলাম, 'এমন করছেন কেন? কী হয়েছে?'

জানালার পর্দা টেনে দিয়ে আমার কাছে এসে বসল ড। বলল, 'আপনার সঙ্গে আমার একান্তে কথা বলা দরকার।'

'বলুন, আমি শুনছি।'

'যা বলব, সেটা কিন্তু গোপন রাখতে হবে। কারও সঙ্গে আলোচনা করতে পারবেন না। ঠিক আছে?'

কাঁধ ঝাঁকালাম। 'নিশ্চয়ই... যদি সেটা মি. ট্রেলনি আর মিস ট্রেলনির ভালর জন্য হয়।'

একটু ইতস্তত করল সার্জেন্ট। তারপর বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমি আমার দায়িত্বকে সবার উপর স্থান দিই। শুধু পোশাক-আশাকে নয়, আমি মনে-প্রাণে একজন পুলিশ... একজন ডিটেকটিভ। সত্য উদ্ঘাটন করাটা আমার দায়িত্ব, সেটা কার পক্ষে যাচ্ছে, আর কার বিপক্ষে যাচ্ছে, তা আমি ভাবি না...'

বাধা দিলাম আমি, 'ভূমিকা করবার দরকার নেই, কী বলতে চান বলুন। আপনি না চাইলে আমি কাউকে কিছু বলব না।'

'ইয়ে... ব্যাপারটা একটু জটিল। এগোবার আগে তাই আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছি। আমার কাছে আপনাকে বেশ বুদ্ধিমান মানুষ বলে মনে হয়েছে। তাই ভাবলাম, আমার ধারণায় কোনও ভুল-ত্রুটি থাকলে সেটা হয়তো ধরিয়ে দিতে

পারবেন...'

'বুঝেছি। বলুন আপনি।'

গলা খাঁকারি দিল সার্জেন্ট, তারপর বলল, 'কেসটা নিয়ে আমি অনেক মাথা ঘামিয়েছি, কিন্তু সাধারণ কোনও সমাধান বের করতে পারিনি। সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হলো, প্রতিটা আক্রমণের সময় কিন্তু বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ ছিল... গত দু'রাত তো আমরা পাহারাও দিচ্ছিলাম। এটা নিশ্চিত করে বলতে পারি, সবার অলক্ষে কারও পক্ষে বাড়িতে ঢোকা, বা বেরুনো সম্ভব ছিল না।'

'হুম, আপনি ভাবছেন, হামলাকারী বাড়ির ভিতরেই ছিল?'

'অনেকটা সেরকমই। আমার ধারণা, মানুষটা আমাদেরই কেউ!'

একটু চমকে উঠলাম। 'কী বলছেন এসব?'

'ঠাণ্ডা মাথায় ভাবুন, আর কী ব্যাখ্যা থাকতে পারে পুরো ঘটনাটার?'

'সিলভিও...'

'ওটা একটা বেড়াল, মি. রস। বড়জোর আঁচড়-কামড় দিয়ে মানুষের রক্ত ঝরাতে পারে। পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষকে টেনে-হিঁচড়ে বিছানা থেকে নামাতে পারে না, ছুরি দিয়ে তার হাত কেটে দু'টুকরো করবার চেষ্টা করতে পারে না। বড়াই করছি না, তবে আমার অভিজ্ঞতা অনেক। সেই অভিজ্ঞতায় দেখেছি, যখনই কোনও অপরাধ ঘটে, সেটা পিছনে মানুষের হাত থাকে; অন্য কোনও কিছুর নয়।'

'বুঝলাম। কিন্তু আমাদের এখানে কোন্ মানুষটাকে সন্দেহ করছেন আপনি?'

অন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল ড। গলার স্বর খাদে নামিয়ে বলল, 'আপনি কি খেয়াল করেছেন, প্রতিটা ঘটনায় মিস

ট্রেলনি সবার আগে ঘটনাস্থলে হাজির হয়েছেন?'

থমকে গেলাম কথাটা শুনে। ভুল বলেনি সার্জেন্ট। প্রথমবার মার্গারেটই ওর বাবাকে আহত অবস্থায় আবিষ্কার করেছে। দ্বিতীয়বার আমি আর নার্স কেনেডি রুমে ছিলাম বটে, কিন্তু চেতনা ছিল না কারও। মার্গারেটই হাজির হয়েছিল বাকিদের আগে। তৃতীয়বার... মানে, কাল রাতেও ও উপস্থিত ছিল রুমে।

ড-র মুখের দিকে তাকালাম, তার চেহারা ভাবলেশহীন। কিন্তু এইমাত্র যা বলল, তা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। উকিল আমি, যুক্তিটা বুঝতে পারছি, তা-ও মানতে চাইল না মন। স্বভাবজাত ভঙ্গিতে পাল্টা যুক্তি দেখালাম, 'ও প্রতিবার সবার আগে হাজির হয়েছে বলেই ওকে দোষী ভাবাটা উচিত নয়। ব্যাপারটা কাকতালীয় হতে পারে না?'

'আমি এখনও কিছুই ভাবছি না,' শান্ত গলায় বলল সার্জেন্ট। 'কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে প্রশ্ন জেগেছে, তাই আলোচনা করতে এসেছি আপনার সঙ্গে।'

নীরব হয়ে গেলাম। মনটা দুশ্চিন্তা আর শঙ্কায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল—মার্গারেটের জন্য। ওকে সন্দেহ করতে মন চাইছে না, নিশ্চয়ই অন্য কোনও ব্যাখ্যা আছে পুরো ঘটনাটার পিছনে। কিন্তু যতক্ষণ না সেটা প্রকাশ পাচ্ছে, ততক্ষণ সন্দেহের তালিকায় ও রয়েই যাবে। তা ছাড়া মি. ট্রেলনি মারা গেলে ও-ই সবচেয়ে লাভবান হবে, সমস্ত সহায়-সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী ও—চমৎকার একটা মোটিভ এমনিতেই দেখতে পাচ্ছে ড। মার্গারেটের জন্য কিছু করতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু কী করব বুঝতে পারছি না। শেষে চুপচাপ সার্জেন্টের কথা শোনার সিদ্ধান্ত নিলাম।

'দায়িত্ব পালনে আপনাকে বাধা দেব না আমি,' বললাম তাকে। 'কী করতে চান, জানতে পারি?'

'সেটা নিয়ে আমি নিজেও বিভ্রান্তিতে আছি,' সরল গলায় বলল ড। 'আসলে... অন্য কোনও সময় যদি কেউ এসে আমাকে বলত, মিস ট্রেলনির মত চমৎকার একজন মহিলা কোনও খারাপ কাজের সঙ্গে জড়িত, তা হলে তাকে স্রেফ পাগল ভাবতাম আমি। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন, আমি নিজের চোখে দেখছি সব। ওঁকে দোষী ভাবতে আমারও ইচ্ছে করছে না, কিন্তু কী করব? তারপরও আমি কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না, ভুল করেও একজন নিরপরাধ মানুষকে অভিযুক্ত করতে চাই না। কিছু যদি করতেই হয়, সেটা পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে তবেই করব। কাজটা সহজ নয়, বাড়ির সবখানে তল্লাশি করে প্রমাণ সংগ্রহের সুযোগ আমার আছে, কিন্তু মিস ট্রেলনির মনের মধ্যে কী চলছে, সেটা জানা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তাই আপনার সাহায্য চাই আমি, মি. রস। আপনি ওঁর বন্ধু, কাছের মানুষ... ওঁর সঙ্গে কথা বলে কি আমাকে জানাতে পারবেন, বাবার সঙ্গে ওঁর সম্পর্কটা আসলে কেমন? দুজনের মধ্যে কোনও বড় ধরনের দ্বন্দ্ব আছে কি না, কিংবা মানসিকভাবে মিস ট্রেলনি স্বাভাবিক কি না...'

'আমাকে ওর বিরুদ্ধে নামাতে চাইছেন?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম।

'বিরুদ্ধে নয়, মি. রস,' বলল ড। 'ওঁর পক্ষেই কাজ করুন। প্রমাণ করে দিন, আমার সন্দেহ ভুল। আমিও তা-ই চাই।'

করুণা অনুভব করলাম লোকটার জন্য। গ্যাঁড়াকলে পড়ে গেছে বেচারা। মার্গারেটকে অপরাধী ভাবতে পারছে না সে-ও, যদিও পরিস্থিতি বলছে অন্য কথা। নিজ থেকে কিছু করতে পারছে না এ-অবস্থায়, তাই ছুটে এসেছে আমার কাছে। প্রস্তাবটার বিষয়ে হ্যাঁ-না কিছু বলবার সুযোগ পেলাম না, তার আগেই দরজা ঠেলে মার্গারেট ঢুকল স্টাডিতে।

'ওহ্, দুঃখিত!' আমাদের দেখে বলে উঠল ও। 'আমি

জানতাম না আপনারা এখানে।'

'ক্ষমা চাইবার মত কিছু হয়নি,' বললাম আমি। 'আমরা এমনিই কথা বলছিলাম।'

তারপর ইতস্তত করতে থাকল মার্গারেট, আমাদের মুখের ভাব দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে, জরুরি আলোচনা চলছিল দুজনের মধ্যে। মিসেস গ্র্যান্ট এসে বাঁচাল ওকে।

'ডা. উইনচেস্টার এসেছেন, মিস। আপনার বাবার কামরায় গেছেন, আপনাকে ডেকেছেন ওখানে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে দোতলায় রওনা দিল মার্গারেট, ওর পিছু নিলাম আমি আর ড।

ডা. উইনচেস্টারকে রোগীর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত দেখলাম। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত চুপ রইলাম সবাই, তারপর জানতে চাইলাম মি. ট্রেলনির অবস্থা। জবাবে ডাক্তার জানালেন, আগের মতই আছেন ভদ্রলোক, কোনও উন্নতি হয়নি। মার্গারেটের কাছে অনুমতি চাইলেন, ওর আপত্তি না থাকলে আজ রাতটা তিনি এ-বাড়িতেই কাটাতে চান, নিজের বাড়িতে ফিরবেন না আর। মার্গারেটের তো আপত্তির প্রশ্নই ওঠে না, আমিও খুশি হলাম কথাটা শুনে।

তবে সেই খুশি বেশিক্ষণ টিকল না। এক ফাঁকে ডাক্তার আমার কানে কানে বললেন, 'আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য থেকে গেলাম।'

'কী কথা?'

'আছে একটা ব্যাপার। পরে জানাব। গোপনে কথা হওয়া দরকার। মিস ট্রেলনিকে বিষয়টা জানতে দিতে চাই না।'

সার্জেন্ট ড-র মত হাবভাব ডাক্তারের আচরণে। আবার চিন্তায় পড়ে গেলাম।

বিকেল গড়িয়ে রাত নামল। ডিনারের পর বাবার পাহারায়

চলে গেল মার্গারেট, সঙ্গে মিসেস গ্র্যান্ট। করিডরে থাকছে সার্জেন্ট ড। কফি আর ধূমপানের অজুহাতে আমাকে লাইব্রেরিতে নিয়ে গেলেন ডা. উইনচেস্টার। ওখানে গিয়ে সিগার ধরিয়ে তিনি বললেন, 'যাক, এবার একটু একান্তে কথা বলবার সুযোগ পাওয়া গেল। মিস ট্রেলনি পাহারা ছেড়ে আসবে বলে মনে হয় না, কী বলেন?'

আমিও একটা সিগার ধরিয়েছি। সেটায় টান দিয়ে বললাম, 'সম্ভবত। কিন্তু ব্যাপারটা কী? আপনার আচরণ হেঁয়ালির মত ঠেকছে আমার কাছে।'

'এখন পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, সেসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই আমি আপনার সঙ্গে,' বললেন ডাক্তার। 'হেঁয়ালি করছি না, পুরো ব্যাপারটা এতই রহস্যময় যে ওটারই প্রভাব পড়ছে আমার কথাবার্তায়। কেসটা খুবই জটিল; যত ভাবি, ততই মাথায় সব জট পাকিয়ে যায়। দুটো রেখা... বিপরীতমুখী, দুটোই সমানতালে শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এমন অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি আমার।'

বাধা দিলাম আমি। জানতে চাইলাম, 'কীসের রেখার কথা বলছেন?'

জবাব দেয়ার আগে কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন ডাক্তার। অস্বস্তি বোধ করলাম একটু, সেটা দ্রুত কাটিয়েও নিলাম। পুরো ব্যাপারটায় আমি এখন আর নীরব দর্শক নই। মার্গারেটকে ভালবাসি আমি, ওকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে এরা, কথাটা ওকে জানতে দিতেও চাইছে না। অতএব ওর হয়ে যুক্তিতর্ক আর ব্যাখ্যা দিতে হবে আমাকেই। মুখটা কঠিন করে তুললাম আমি।

সোজা হলেন ডাক্তার। বললেন, 'রেখাদুটো হচ্ছে বাস্তবতা এবং কল্পনার। প্রথমটার কথা ভাবুন: ডাকাতি আর খুনের চেষ্টা

দেখতে পেয়েছি আমরা। মি. ট্রেলনি আর নার্স কেনেডিকে এমনভাবে বেহুঁশ হতে দেখেছি, যা হিপনোটিক সাজেশন কিংবা বিষপ্রয়োগের দিকে নির্দেশ করে। এগুলো হচ্ছে বাস্তবতা। কিন্তু এসবের বাইরে ব্যাখ্যার অতীত কিছু বিষয়ও উদয় হয়েছে আমাদের সামনে। হ্যাঁ, ব্যাপারটা স্বীকার করছি আমি। স্বীকার না করে উপায়ও নেই। শেক্সপিয়ারের *হ্যামলেট* পড়েছেন? ওখানে একটা কথা আছে: *দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ, দ্যান আর ড্রেমট অভ ইন ইয়োর ফিলোসফি!* কথাটার সত্যতা টের পাচ্ছি এখন।

'যাই হোক, আসুন আগে বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করি। এখানে একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে দেখতে পাচ্ছি আমরা। ঘরভর্তি নানা ধরনের চাকর-বাকর আছে, তবে ওরা কোনও সংঘবদ্ধ আক্রমণ চালিয়েছে বলে মনে হয় না, তার পিছনে কোনও উদ্দেশ্য দেখা যাচ্ছে না। ভদ্রলোক অত্যন্ত ধনী, শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান। এখন পর্যন্ত যা বুঝেছি, তিনি একজন দৃঢ় চরিত্রের, সংকল্পবদ্ধ মানুষ। তাঁর একমাত্র মেয়ে ঠিক তাঁর পাশের কামরাতেই থাকে। নির্বিবাদী, ভালমানুষ দুজনেই; এঁদের উপর কোনও ধরনের হামলা হবার কারণ নেই। যে ধরনের পরিবেশে বাস করেন, বাইরের কারও পক্ষে চাইলেও তা সম্ভব নয়। তারপরও হামলা হয়েছে—নিষ্ঠুর, বর্বরোচিত হামলা... রাতের আঁধারে! খুব দ্রুত হামলার ঘটনাটি আবিষ্কৃত হয়েছে... এতই দ্রুত যে, হামলাকারী তার কাজ শেষ করতে পারেনি। অথচ তার পালানোর কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি, কোনও সূত্র পাওয়া যায়নি... পাওয়া গেছে শুধু ভিকটিমকে। তাঁর শরীরেই রয়েছে হামলার একমাত্র আলামত।

'দ্বিতীয় রাতে আবার হামলা করা হলো, তাও কি না ঘরভর্তি সতর্ক মানুষজনের ভিতর! কামরায় দুজন মানুষ ছিল, বাড়িতে

একজন পুলিশ ডিটেকটিভও ছিলেন, তারপরও সব ঝুঁকি অগ্রাহ্য করে হামলা চালানো হলো। নার্সকে বেহুঁশ করে ফেলা হলো, আপনি রেসপিরেটর পরে থাকা সত্ত্বেও জেগে থাকতে পারলেন না। এমনকী ডিটেকটিভ ভদ্রলোকও এতটাই অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন যে, কীসের দিকে গুলি ছুঁড়েছেন, তা বলতে পারলেন না। তবে এতকিছুর পরও একটা জিনিস নিশ্চিত হওয়া গেছে—অজ্ঞান হয়ে যাবার যে-ঘটনা আমরা দেখছি, তা হিপনোসিসের মাধ্যমে নয়, অন্য কোনোভাবে... সম্ভবত বাতাসের মাধ্যমে করা হচ্ছে। আপনার রেসপিরেটরটাই তার প্রমাণ। ওটার কারণেই আপনি অজ্ঞান হয়ে যাননি, ওটাই ফিল্টার করে বিষটাকে দুর্বল করে দিয়েছিল, আপনি তাতে শুধু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন... মি. ট্রেলনি বা নার্স কেনেডির মত দুর্ভাগ্যের শিকার হননি। অবশ্য এই ব্যাখ্যাতেও কিছুটা গলদ আছে। মিস ট্রেলনি ওই রুমে আর সবার চাইতে বেশি সময় কাটিয়েছেন, বলতে গেলে সারাক্ষণই ওখানে আসা-যাওয়া করছেন তিনি, অথচ তাঁর উপর আমরা কোনও বিরূপ প্রভাব দেখতে পাচ্ছি না। এ-থেকে মনে হচ্ছে, জিনিসটা যা-ই হোক না কেন, তা সবার উপর একইভাবে কাজ করে না। মিস ট্রেলনির শরীর হয়তো ওটাকে প্রতিরোধ করতে পারছে, যা অন্যেরা পারছে না। এভাবে ভাবলে কিছুটা গ্রহণযোগ্য হয় ব্যাখ্যাটা। আমরা অনুমান করতে পারি, মিশরীয় আর্টিফ্যাক্টগুলো থেকে বিষাক্ত একটা কিছু নির্গত হচ্ছে; মি. ট্রেলনি যেহেতু ওই রুমে সবার চেয়ে বেশি সময় কাটিয়েছেন, তাই উনি সবচেয়ে সিরিয়াসভাবে আক্রান্ত হয়েছেন বিষটাতে। এজন্যেই কিছুতেই জ্ঞান ফিরছে না ওঁর। তবে তারপরও রহস্যটার সমাধান হচ্ছে না; আমার জানামতে এমন কোনও রাসায়নিক জিনিস নেই... অন্তত আধুনিক বিজ্ঞানে... যা এই ধরনের বিবিধ প্রভাব দেখাতে পারে। মি. ট্রেলনির উপর শারীরিক হামলার যে-ঘটনা ঘটেছে, সেটার

সমাধান যদি করাও যায়, মানে যদি প্রমাণিত হয় যে, এই বাড়ির কেউই তাঁকে আক্রমণ করেছিল; তবু এই রহস্যটার সমাধান হবে বলে মনে হয় না। মিস ট্রেলনিকে সবকিছুর চাবিকাঠি বলে মনে হচ্ছে... কেন তিনি আক্রান্ত হচ্ছেন না বিষটাতে? সবার উপর যেখানে ওই রুমটা বিরূপ প্রভাব ফেলছে, সেখানে তিনি কেন সম্পূর্ণ সুস্থভাবে ঘুরে বেড়াতে পারছেন? কাল রাতে ভয় পাওয়া ছাড়া এখন পর্যন্ত তো কিছুই হয়নি তাঁর। বিষয়টা অস্বাভাবিক নয়?'

চুপচাপ শুনলাম ডাক্তারের কথা। যদিও তাঁর বলার ভঙ্গিতে দোষারোপের কোনও চেষ্টা নেই, তারপরও যুক্তিগুলো ভাবিয়ে তোলার মত। সার্জেন্ট ড-র মত মার্গারেটকে সন্দেহ করছেন না তিনি, কিন্তু তাঁর বক্তব্য মার্গারেটকে বাকি সবার চাইতে আলাদা বলে প্রমাণ করছে। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে ব্যতিক্রম বলে প্রমাণিত হওয়া, আর সন্দেহের তীরে বিদ্ধ হওয়া একই কথা। প্রতিবাদের ইচ্ছে জাগল, তবে চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করলাম। ভাল করে সব জেনে নেয়ার আগে মুখ খুললে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হতে পারে। ডাক্তার নিজেও অবশ্য আমার কাছ থেকে জবাবের আশা করছিলেন না। সিগারটা নিভে গিয়েছিল, ওটায় অগ্নিসংযোগ করে আবার বলতে শুরু করলেন তিনি।

'এবার আসি দ্বিতীয় রেখা... মানে কল্পনার প্রসঙ্গে। এখানে আসলে কী ঘটে চলেছে, সেটা নিয়ে অনেক চিন্তা করেছি আমি... প্রতিবারই সমাধানগুলো যুক্তি আর বাস্তবতা ছেড়ে অবাস্তব, কল্পনার দিকে ছুটে গেছে। জানি না, কারণটা মি. ট্রেলনির রুমের বিষাক্ত বাতাস কি না! হয়তো ওই পুলিশ ভদ্রলোকের মত আমিও কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছি। কোনও কেমিক্যাল, বা ড্রাগ ওখানে ভেসে বেড়াচ্ছে হয়তো। কিন্তু জানাশোনা কোনও ড্রাগের সঙ্গে ওটার উপসর্গের মিল খুঁজে পাচ্ছি না আমি। অবশ্য

মমি-টাইপের গন্ধটার একটা ব্যাখ্যা আছে—পুরো কামরাটাই প্রাচীন মিশরীয় আটিফ্যাক্টে ভর্তি, সত্যিকার একটা মমিও আছে... মানে ওই বেড়ালেরটা, যেটাকে সিলভিও পছন্দ করে না। ভাল কথা, একটা বেড়ালের মমির সন্ধান পেয়েছি আমি, কাল সকালে ওটা নিয়ে আসব, সিলভিওকে নিয়ে পরীক্ষা করব। যা-ই হোক, গন্ধের কথা বলছিলাম। প্রাচীন মিশরের পুরোহিতরা অত্যন্ত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মানুষ ছিল। তারা হয়তো মৃতদেহের পচন ঠেকাতে এমন কোনও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করেছে, যা অমন গন্ধ ছড়াচ্ছে। আমরা হয়তো আজও ওই জিনিস আবিষ্কার করতে পারিনি...'

'ব্যাখ্যাটা কিন্তু খুব একটা অবিশ্বাস্য নয়,' বলে উঠলাম আমি। 'কল্পনার পাল্লায় ফেলছেন কেন একে?'

মলিন হাসি ফুটল ডাক্তারের ঠোঁটে। 'বাস্তবতার ছোঁয়া ওই পর্যন্তই, মি. রস। পরের চিন্তাগুলো একেবারে অবাস্তব। আমার খালি মনে হচ্ছে, মি. ট্রেলনি এই গন্ধ... হামলা... সবকিছুর সম্পর্কে জানতেন। শুধু তা-ই না, তিনি নিজেই পুরো ঘটনার পিছনে কলকাঠি নাড়ছেন।'

'অজ্ঞান অবস্থায়?' অবিশ্বাস ফুটল আমার কণ্ঠে। 'যাহ্, তা কী করে হয়?'

'আমিও ওভাবে ভেবে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে পারলে খুশি হতাম,' বললেন ডাক্তার। 'কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ওঁর লেখা চিঠিটা। ওটাতে যেভাবে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি, করণীয় ঠিক করে দিয়েছেন, তাতে তো মনে হয়—কী ঘটবে, তা আগে থেকেই জানতেন ভদ্রলোক। আমার হাতে নিরেট কোনও প্রমাণ নেই, তারপরও অবস্থাদৃষ্টে প্রতি মুহূর্তে গাঢ় হচ্ছে সন্দেহটা।'

কথা খুঁজে পেলাম না। আসলে এভাবে ভেবে দেখিনি ব্যাপারটা।

ডাক্তার বললেন, 'আমাদেরকে কিছু একটা করতে হবে, মি. রস। এবং খুব শীঘ্রি। এভাবে অনন্তকাল থাকবেন না মি. ট্রেলনি। যদি খারাপ কিছু হয়ে যায়, তা হলে কী ঘটবে, বুঝতে পারছেন? পুলিশ তদন্ত করবে... কোনও সূত্র পাবে না ওরা; যাকেই দোষী সাব্যস্ত করুক, তা করবে স্রেফ মোটিভের কথা ভেবে।'

কথাটার মর্মার্থ বুঝতে অসুবিধে হলো না। সার্জেন্ট ড-র মত সরাসরি না হলেও আভাসে-ইঙ্গিতে মার্গারেটের কথাই বলতে চাইছেন ডাক্তার। মোটিভের কথা ভাবলে ওর নামই সবার আগে আসে। শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি কাউকে সন্দেহ করছেন?'

প্রশ্নটা শুনে একটু থতমত খেয়ে গেলেন ডাক্তার। বললেন, 'সন্দেহ? না, না, সন্দেহ করব কেন? তবে এখানে অস্বাভাবিক কিছু একটার যে প্রভাব আছে, তা বুঝতে পারছি। আপাতত ওটার রহস্য ভেদ করবার দিকেই আমার মনোযোগ। পরে যদি নিরেট কোনও তথ্য-প্রমাণ পাই, তা হলে না হয় সন্দেহ-টন্দেহ করা যাবে।'

কথাটা শেষ করেই ঝট্ করে দরজার দিকে তাকালেন তিনি, হাতল ঘুরতে শুরু করেছে। পরমুহূর্তে রুমে ঢুকল মার্গারেট... ঠিক বিকেলের মত, যখন আমি আর সার্জেন্ট ড কথা বলছিলাম। কাকতালীয় ঘটনা নিশ্চয়ই, কারণ আমাদের দেখে তখনকার মত বিব্রত হয়ে উঠল ও; ঠিক একই ভঙ্গিতে বলল, 'দুঃখিত, আপনারা যে কথা বলছেন, তা জানতাম না। অনুমতি না নিয়ে ঢুকে পড়েছি...'

'কোনও অসুবিধে নেই, মিস ট্রেলনি,' বললেন ডাক্তার। 'বলুন কী ব্যাপার।'

'আপনাকেই খুঁজছিলাম,' বলল মার্গারেট। 'ইয়ে... আমার খুব ক্লান্ত লাগছে। বসে থাকতে পারছি না। আপনার যদি আপত্তি

না থাকে, তা হলে ঘুমোতে যেতে চাই।'

'যান, প্লিজ। সত্যিই ঘুম দরকার আপনার। চেহারা দেখে আগেই সেটা মনে হয়েছিল আমার, নিজ থেকে না আসলে খানিক পরে আমিই জোর করে পাঠাতাম আপনাকে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমার দিকে তাকাল মার্গারেট। বলল, 'আজ রাতে কড়া পাহারা দরকার। তুমি কি ডা. উইনচেস্টারের সঙ্গে থাকতে পারবে? আমি অন্য রুমে ঘুমাব ভাবছি, বাবার পাশের কামরায় থাকলেই টুকটাক শব্দে ঘুম ভেঙে যায়, ভয় করে। নীচতলায় হলঘরের পাশে কয়েকটা কামরা আছে, ওগুলোর একটায় থাকব ঠিক করেছি। কোনও সমস্যা দেখলে ডেকে দিয়ো আমাকে।'

'কিচ্ছু ভেবো না,' আশ্বাস দিলাম আমি। 'তুমি শুয়ে পড়ো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল মার্গারেট। আমি গিয়ে দরজাটা আবার ভিড়িয়ে দিয়ে এলাম। ফিরে আসতেই ডা. উইনচেস্টার বললেন, 'বেচারি বড্ড নার্ভাস হয়ে আছেন। শান্তির ঘুম দরকার। আমাদের দেখে কেমন চমকে উঠলেন, দেখলেন? কথা বলছিলাম, ওটা স্বাভাবিক ব্যাপার... এভাবে চমকে ওঠার তো কিছু ছিল না।'

মার্গারেটের পক্ষ নিয়ে বলতে চাইলাম, বিকেলেও ঠিক একইভাবে স্টাডিতে ঢুকতেই সার্জেন্ট ড আর আমাকে কথা বলতে দেখেছিল ও। একই ব্যাপার দ্বিতীয়বার ঘটলে চমকানোটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু চুপ করে গেলাম আরেকটা ব্যাপার ভেবে। ডাক্তার জানতে চাইতে পারেন, ডিটেকটিভের সঙ্গে কী নিয়ে আলোচনা করেছি আমি... মিথ্যে বলা কঠিন হয়ে যাবে। তারচেয়ে মুখে খিলি এঁটে বসে থাকাই ভাল।

একটু পর উঠে পড়লাম আমরা, রওনা হলাম রোগীর ঘরের দিকে। প্রায়ান্ধকার করিডর ধরে হাঁটতে হাঁটতে একটা বিষয় বিস্ময় জাগাল আমার মনে। আজ দু'বার হঠাৎ করে হাজির

হয়েছে ও, দু'বারই ওকে নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমি সার্জেন্ট ড এবং ডা. উইনচেস্টারের সঙ্গে। ব্যাপারটা কি সত্যি কাকতালীয়, নাকি অন্য কোনও রহস্য আছে এতে?

কী জানি! দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আমি। সময়ই বলে দেবে তা।

সাত

আগন্তুক

কোনও রকম দুর্ঘটনা ছাড়া সেদিন প্রথমবারের মত একটা রাত পার করলাম আমরা। বাড়তি সতর্কতা নিয়ে পাহারা দিলাম আমি আর ডা. উইনচেস্টার, সঙ্গে থাকল মিসেস গ্র্যান্ট আর দুই নার্স। ডিটেকটিভরাও ঘন ঘন আসা-যাওয়ার মাধ্যমে নজর রাখলেন আমাদের উপর। মি. ট্রেলনির অবস্থা অপরিবর্তিত রইল। নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাসের তালে বুকের ওঠানামা দেখা না গেলে হয়তো বা তাঁকে মূর্তি বলেই ভ্রম হতো। রেসপিরেটর ব্যবহার করলাম সবাই, তবে রাতে ভীষণ গরম পড়ায় জিনিসটা খুবই অস্বস্তি সৃষ্টি করল। অবশ্য তারপরও খুললাম না কেউই। রাতভর অশুভ অনুভূতি গ্রাস করে রাখল আমাকে, তবে জানালা গলে ভোরের আলো ঢুকতেই কেটে গেল তা। ধীরে ধীরে বাড়িতে প্রাণের সাড়া ফিরল। ঝাড়পোঁছ আর রান্না শুরুর গন্ধে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে এল। সকাল হতেই নিজের বাড়িতে চলে গেলেন ডা. উইনচেস্টার, আমিও মিসেস গ্র্যান্টকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম রুম

থেকে। তখন সিস্টার ডোরিস এসে মি. ট্রেলনির দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়েছে।

নাশতা শেষে আটটায় দেখা পেলাম মার্গারেটের। এক রাতের ঘুমে আশ্চর্য পরিবর্তন এসেছে ওর মধ্যে। চেহারায় রং ফিরে এসেছে, আচার-আচরণ সপ্রতিভ, হাবভাবে স্বাভাবিক দৃঢ়তা। আমার সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করে বাবার কামরায় চলে গেল ও। রাতভর জেগে থাকায় আমার খুব ঘুম পাচ্ছিল, তাই আর পিছু নিলাম না। নিজের কামরায় গিয়ে সটান শুয়ে পড়লাম বিছানায়।

ঘুমুলাম দুপুর পর্যন্ত। জেগে উঠবার পর শরীর ঝরঝরে লাগল। গোসল আর লাঞ্চ সেরে ঠিক করলাম জারমাইন স্ট্রিটে যাব। টুকটাক জিনিস আনা দরকার বাড়ি থেকে, চেম্বারে গিয়েও মামলা-মোকদ্দমার ফাইলপত্র দেখে আসা দরকার। বেরোতে যাচ্ছিলাম, দরজায় গিয়ে দেখলাম এক নতুন দৃশ্য।

মাঝবয়েসী এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ওখানে, কথা কাটাকাটি করছেন এক চাকরের সঙ্গে। চাকরটির নাম মরিস, বয়স বেশি নয়; সঙ্গী-সাথীদের গৃহত্যাগের পর এখন তাকে খানসামার দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। একেবারেই অনভিজ্ঞ, আগন্তুকের হম্বিতম্বির সামনে কুঁকড়ে গেছে বেচারা।

'পেয়েছ কী তোমরা?' চেঁচাতে শুনলাম নবাগতকে। 'সকাল আটটায় এসেছি, বলেছ মি. ট্রেলনি জাগেননি। এগারোটায় এসেছি, তখনও বলেছ ঘুমাচ্ছেন। এখন আবার তিনটায় এলাম, তাও বুঝি উনি নাক ডাকাচ্ছেন? মিস ট্রেলনিকে চাইলাম, তাকেও ডাকতে চাইছ না... বলছ উনি ব্যস্ত! আরে বাবা, কীসের এত ব্যস্ততা? আমাকে দেখে কী রাস্তার ফকির মনে হচ্ছে নাকি? আমি সস্তা কেউ নই। মি. ট্রেলনির সঙ্গে দেখা হওয়াটা আমার জন্য খুবই জরুরি। তিন বছর ধরে চেষ্টা করছি, অবশেষে আজ পেরেছি আসতে। এখন কি না আমাকে ঢুকতে দিচ্ছ না! সমস্যাটা কী?

মি. ট্রেলনি কি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন না?' হাঁপাতে শুরু করলেন তিনি।

মরিস বলল, 'আপনাকে কোনোভাবে অসম্মান করে থাকলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত, সার। আমি শুধু আমার দায়িত্ব পালন করছি। আমার উপর যেমন নির্দেশ দেয়া আছে, তেমনই কাজ করছি। আপনি চাইলে নাম-ঠিকানাসহ একটা মেসেজ রেখে যেতে পারেন, আমি মিস ট্রেলনিকে দেব। তিনি প্রয়োজন মনে করলে আপনার সঙ্গে পরে যোগাযোগ করবেন।'

কথাটা শুনে একটু শান্ত হলেন আগন্তুক। বললেন, 'না, তোমার উপর আমার কোনও রাগ নেই। বকাঝকা করবার জন্য আমিই বরং দুঃখিত। আসলে মাথা কাজ করছিল না। সময় বড্ড মূল্যবান, আমার হাতে নষ্ট করবার মত একটা মিনিটও নেই। তোমার মনিবও জানেন সেটা। আমি নিশ্চিত, সব শোনার পর তিনিও রেগে যাবেন, এভাবে সময় নষ্ট হয়েছে বলে। ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এর জন্য হাজারবার ওঁর ঘুম ভাঙালেও কোনও অন্যায় হবে না। হা ঈশ্বর! আমার এতদিনের পরিশ্রম বুঝি ওঁর ঘরের দরজায় এসে ব্যর্থ হবে? এ তো তীরে এসে তরী ডোবার মত অবস্থা! বাছা, এ-বাড়িতে কি এমন কেউ নেই, যাঁর সঙ্গে কথা বলে আমি ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারি?'

কৌতূহলী হয়ে উঠলাম লোকটার কথাবার্তা শুনে। এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'মরিস, তুমি বরং মিস ট্রেলনিকে খবর দাও। আমার কথা বোলো।'

'জী সার,' বলে মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল মরিস।

আগন্তুককে আমি বাড়িতে ঢুকতে দিলাম, হলঘর পেরিয়ে বসার ঘরে নিয়ে বসালাম।

'আপনার পরিচয় জানতে পারি?' জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

'আমি মিস ট্রেলনির বন্ধু। আমার নাম ম্যালকম রস।'

'ধন্যবাদ, মি. রস,' বললেন ভদ্রলোক। 'আমার নাম করবেক। ভিজিটিং কার্ড দিতে পারছি না, কারণ আমি যেখান থেকে এসেছি, সেখানে কার্ড-টার্ডের বালাই নেই। অবশ্য থাকলেও লাভ হতো না, কাল রাতে ওটাও খোয়াতাম নির্ঘাত...'

আচমকা থেমে গেলেন তিনি, যেন বেশি বলে ফেলেছেন। চুপ হয়ে গেলেন। আমিও আর আলাপ বাড়াতে চাইলাম না, মার্গারেট এলেই না হয় বাকিটা জানা যাবে। নীরবে ওর জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম দুজনে, এই ফাঁকে ভদ্রলোককে জরিপ করলাম। ছোটখাট মানুষ এই করবেক, গায়ের চামড়া রোদে পুড়ে কালো হয়ে গেছে। শরীরটা এখন শুকনো হলেও আগে সম্ভবত মোটা ছিল—অন্তত থুতনির নীচে ঝুলে থাকা চামড়া সেই কথাই বলছে। বয়সটা ঠিক ধরতে পারলাম না, কারণ মুখে আর গলায় স্বাভাবিকের চাইতে বেশি বলিরেখা দেখা যাচ্ছে—হাড়ভাঙা পরিশ্রমের ইঙ্গিত। চামড়া দেখে বোঝার চেষ্টা করলাম, কোত্থেকে এসেছে সে। মরুভূমি বলে মনে হলো, প্রাচ্য বা বিষুবীয় অঞ্চল থেকে এলে চামড়া আরও কম পুড়ত। চেহারাসুরতে শিক্ষিত ও বিদ্বান মানুষ বলে মনে হচ্ছে। মরুভূমিতে কী করছিলেন?

একটু পরেই চলে এল মার্গারেট। হন্তদন্ত হয়ে রুমে ঢুকল ও, আর ওকে দেখেই করবেক কেন যেন চমকে উঠলেন। তাঁর এই আচরণ অবাক করল আমাকে; ঠিক করলাম, সুযোগ পেলে জেনে নিতে হবে—ভদ্রলোক মার্গারেটকে দেখে অমন চমকে উঠলেন কেন?

করবেক অবশ্য দ্রুত সামলে নিলেন নিজেকে। মার্গারেট উপস্থিত হতেই সরোষে নিজের অভিযোগ পেশ করতে শুরু করলেন—সকাল থেকে বার বার চেষ্টা করবার পরও তাঁকে বাড়িতে ঢুকতে দেয়া হয়নি।

দুঃখ প্রকাশ করল মার্গারেট। বলল, 'বাবা সুস্থ থাকলে

আপনাকে এই ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হতো না, সার। আমিও বাবার দেখাশোনা করছিলাম, তাই খবর পাইনি। নইলে নিশ্চয়ই দেখা করতাম। যা হোক, জরুরি কী কাজ নিয়ে এসেছেন আপনি, জানতে পারি?'

আমার দিকে তাকালেন করবেক। চেহারায় দ্বিধা।

'মি. রসের সামনে আপনি নির্ভাবনায় কথা বলতে পারেন। ওকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। পরিস্থিতি আসলে খুবই গুরুতর। বাবা গত তিনদিন ধরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, কিছুতেই তাকে জাগাতে পারছি না আমরা। বাবার ব্যাপারে আমি বিশেষ কিছু জানিও না, মাত্র বছরখানেক হলো এ-বাড়িতে থাকতে শুরু করেছি। আপনাকেও তাই চিনতে পারছি না।'

কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন করবেক, তারপর বললেন, 'আমার নাম ইউজিন করবেক। মাস্টার অভ আর্টস্, ডক্টর অভ ল, এবং মাস্টার অভ সার্জারি, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। ডক্টর অভ লেটারস্, অক্সফোর্ড; ডক্টর অভ সায়েন্স, এবং ডক্টর অভ ল্যাঙ্গুয়েজ, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়। ডক্টর অভ ফিলসফি, বার্লিন। ডক্টর অভ ওরিয়েন্টাল ল্যাঙ্গুয়েজ, প্যারিস...'

'সর্বনাশ!' বিস্মিত গলায় বলে উঠলাম। 'এসব কী শুনছি! ক'টা ডিগ্রি আপনার?'

'অনেক,' হাসলেন করবেক। 'সবগুলো শুনিয়ে বিরক্ত করতে চাই না, এমনিতেই বেশ ক'টা বলে ফেলেছি। আসলে, লেখাপড়া করতে ভাল লাগত; ক'টা ডিগ্রি হচ্ছে, তা নিয়ে কখনও ভাবিনি। তবে এতসব ডিগ্রি কোনও কাজে লাগেনি আমার, হঠাৎ করে কী ভূত চাপল মাথায়... নাম লেখালাম ইজিপ্টোলজিতে। সমাধি খোঁজার কাজে নেমে পড়লাম। আজও ও-কাজই করছি। টাকাপয়সা তেমন হয়নি, তবে এমন সব অভিজ্ঞতা হয়েছে, যা বই পড়ে কোনোদিন পাওয়া যাবে না। যা হোক, মি. ট্রেলনির

সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে... একটা দুঃসময়ে। দিনকাল খুব খারাপ যাচ্ছিল আমার—এক্সপিডিশন চালানো তো দূরের কথা, খাওয়া-পরাই জোটানো কঠিন হয়ে পড়েছিল। এই অবস্থায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন তিনি, সেই থেকে ওঁর হয়ে মিশরে অনেক কাজ করেছি আমি। শিল্পের একজন সত্যিকার সমঝদার উনি, মন উদার, কৃপণতা বলে কিছু নেই... আমার মত একজন পাগলা-ইজিপ্টোলজিস্টের জন্য তাঁর চেয়ে ভাল পৃষ্ঠপোষক আর কেউ হতে পারে না।'

আবেগ দিয়ে কথা বলছেন করবেক। বুঝতে পারলাম, মি. ট্রেলনির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বাবার প্রশংসা শুনে মার্গারেটকেও খুশি হতে দেখলাম।

করবেক বলে চললেন, 'আপনার বাবার সঙ্গে আমি মিশরে বেশ কয়েকটা অভিযানে গেছি, মিস ট্রেলনি। তাঁর কালেকশনের বেশিরভাগ জিনিস আমিই সংগ্রহ করে দিয়েছি। খুবই জ্ঞানী লোক উনি, কিছুটা খেয়ালিও বলতে পারেন। যদি কোনও জিনিসের উপর মন বসে, তা হলে সেটা হাতে পাবার জন্য সারা দুনিয়া চষে বেড়াতেও দ্বিধা করেন না। এমনই একটা জিনিসের পিছনে এখন ছুটছি আমি।'

এইটুকু বলে থামলেন তিনি। ঠোঁট কামড়ে ভাবলেন কী যেন, তারপর বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, আমার কাজটার ব্যাপারে আপনাদের বিস্তারিত কিছু বলতে পারছি না। গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য মি. ট্রেলনি আমাকে শপথ করিয়েছেন।' বিব্রত একটা ভাব ফুটল চেহারায়। 'মিস ট্রেলনি, আপনি কি নিশ্চিন্ত, আজ আমার সঙ্গে আপনার বাবা দেখা করতে পারবেন-ই না?'

'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?' উঠে দাঁড়াল মার্গারেট। 'আসুন, নিজের চোখে দেখে যান।'

ওকে অনুসরণ করলেন করবেক, আমি তাঁর পিছনে

থাকলাম। তিনজনে গিয়ে ঢুকলাম মি. ট্রেলনির কামরায়। অমন একটা পরিবেশে নতুন কেউ এলে প্রথমেই একটু অবাক হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু করবেকের মধ্যে কোনও বিকার দেখলাম না। চেনাপরিচিত ভঙ্গিতে চারদিকে একবার চোখ বোলালেন, এরপর থেকে তার মনোযোগ আটকে থাকল বিছানার দিকে। তাঁর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখলাম, কেন যেন মনে হচ্ছে—এ-বাড়ির অদ্ভুত ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে লোকটার গভীর সম্পর্ক আছে।

না, করবেককে আমি সন্দেহ করছি না। তাঁর কথাবার্তায় কোনও ভণিতা ছিল না। কোনও ধরনের অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন বলেও মনে হয়নি। কথা বলেছেন দৃঢ় ভঙ্গিতে; যা-গোপন করতে চেয়েছেন, তা সরাসরিই জানিয়েছেন, ছলনার আশ্রয় নেননি। ব্যাপারটা খুব ভাল লেগেছে আমার।

করবেকের চেহারায় করুণা ফুটতে দেখলাম, নীরবে বিছানায় অনড় পড়ে থাকা মানুষটির দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। মি. ট্রেলনির মধ্যে অসুস্থতার কোনও চিহ্ন নেই অবশ্য, তারপরও শুয়ে থাকার ভঙ্গিতে অসহায়ত্ব ফুটে আছে। এককালের অভিজাত, ক্ষমতাবান মানুষটিকে এখন ভঙ্গুর মনে হচ্ছে। সমবেদনার দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন করবেক, তারপর তা সরে গিয়ে চেহারাটা গম্ভীর হয়ে উঠল।

আমাদের দিকে ফিরলেন ভদ্রলোক। বললেন, 'কখন... কীভাবে ঘটল এটা, বলুন আমাকে।'

প্রথম রাতের ঘটনা খুলে বললাম তাঁকে। কথা শেষ হতেই করবেক বললেন, 'হুম! তা হলে আমি জানি আমার দায়িত্ব কী।'

'কী বলতে চাইছেন?' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলাম।

জবাব দিলেন না করবেক। হেঁয়ালির ভঙ্গিতে বললেন, 'মি. ট্রেলনি জানেন, তিনি কী করছেন। গূঢ় একটা উদ্দেশ্য রয়েছে তাঁর, সেটায় বাধা দেয়া উচিত হবে না আমাদের। কী ঘটতে

পারে, তা তিনি জানতেন। সেজন্য নিশ্চয়ই সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন।'

'অসম্ভব!' উত্তেজিত গলায় প্রতিবাদ করলাম। 'প্রস্তুতি থাকলে এ-অবস্থা হবে কেন তাঁর?'

আমার কথার কোনও প্রভাবই পড়ল না করবেকের মধ্যে। হালকা একটু হাসি খেলা করে গেল তাঁর ঠোঁটে। বললেন, 'ঘটনা এখনও শেষ হয়নি, মি. রস। সুনির্দিষ্ট কারণ না থাকলে মি. ট্রেলনি কিছুতেই নিজের এ-অবস্থা হতে দিতেন না। নিশ্চয়ই তিনি জানতেন এমন কিছু ঘটবে, সেজন্যেই মেয়ের কাছে চিঠির মাধ্যমে নির্দেশ রেখে গেছেন।'

'আপনি কি জানেন, কীসে বাবাকে এভাবে আহত করেছে?' জানতে চাইল মার্গারেট।

'না,' মাথা নাড়লেন করবেক। 'আমি শুধু আন্দাজ করতে পারি...'

'কী? কী আন্দাজ করতে পারেন?'

করবেকের চেহারায় কাঠিন্য ভর করল। ভদ্রভাবে বললেন, 'বিশ্বাস করুন, আপনার উদ্বেগ দূর করবার জন্য আমি সব রকম চেষ্টা করতে রাজি আছি। কিন্তু এ-বিষয়টাতে আমার হাত-পা বাঁধা। অনেক বড় একটা দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে আমাকে।'

'কী দায়িত্ব?'

'নীরবতা পালন!' সংক্ষেপে বললেন করবেক।

ফ্যাল ফ্যাল করে ভদ্রলোকের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল মার্গারেট, কথা খুঁজে পাচ্ছে না। একটু পর কাঁধ ঝাঁকাল ও। জিজ্ঞেস করল, 'তা হলে আমার সঙ্গে কী বিষয়ে কথা বলতে চাইছিলেন আপনি?'

সচকিত হয়ে উঠলেন করবেক। 'হায়, হায়! ভুলেই তো গিয়েছিলাম। কত্তো বড় একটা ক্ষতি হয়ে গেল... তাও কিনা এই

সময়টাতে! সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে! মি. ট্রেলনি অচেতন হয়ে পড়ে আছেন, আমারও জিভ বাঁধা... কী করতে হবে এখন, তা-ই তো জানতে পারলাম না!'

'কীসের কথা বলছেন?' উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল মার্গারেট। 'কী ক্ষতি হয়েছে?'

পায়চারি শুরু করলেন করবেক। 'বললাম তো, ব্যাপারটা খুলে বলতে পারব না আপনাকে। মি. ট্রেলনির নিষেধ আছে। আমি আসলে ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছিলাম। কিন্তু অবস্থা যা দেখছি... এদিকে সময়ও পেরিয়ে যাচ্ছে। হা যিশু, দেরি না হয়ে যায়!'

'কী হয়েছে, বলুন দয়া করে! প্লিজ, চুপ করে থাকবেন না। দুশ্চিন্তা আর আতঙ্কে এমনিতেই আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। আর সহ্য হচ্ছে না এসব।'

মার্গারেটের দিকে তাকালেন করবেক। ভাবলেন কী যেন, তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, বলছি আমার ক্ষতির কথা। কিন্তু আর কিছু জানতে চাইবেন না, আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।'

'বলুন, তা-ই বলুন।'

'গত তিন বছর ধরে এবারকার মিশনটা নিয়ে কাজ করছি আমি, সফলও হয়েছি। প্রাচীন এক সেট মিশরীয় প্রদীপ খোঁজার দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমাকে মি. ট্রেলনি। খুব দামি জিনিস না, তবে ওঁর চোখে জিনিসগুলো অমূল্য ছিল। গতকাল রাতে মাত্র আমি লণ্ডনে পৌঁছেছি, সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি প্রদীপগুলো নেই। ঘটনাটা রীতিমত একটা রহস্য! আমি কখন লণ্ডনে আসছি, তা কেউ জানত না। আমার ব্যাগে কী ছিল, তা-ও বলিনি কাউকে। হোটেলে উঠেছি, পাঁচতলায়, ঘরে মাত্র একটা দরজা—ছিটকিনি লাগানো ছিল, তালাও দিয়েছিলাম। জানালাও খোলা রাখিনি, কাল রাতে ঘুমানোর আগে আমি নিজ হাতে বন্ধ

করেছি প্রতিটা পাল্লা। সকালবেলা দরজা-জানালা সব বন্ধই পেয়েছি, তারপরও আমার ব্যাগ থেকে প্রদীপগুলো হাওয়া! কত কষ্ট করেছি আমি ওগুলো জোগাড় করতে, কত বিপদ মোকাবেলা করেছি! নিরাপদে লণ্ডন পর্যন্ত নিয়েও এসেছিলাম, অথচ এখন...' করবেকের চেহারায় তীব্র হতাশা ফুটে উঠল, কথাটা আর শেষ করলেন না তিনি। দুহাতে মুখ ঢাকলেন।

এগিয়ে গিয়ে তার বাহুতে হাত রাখল মার্গারেট। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, ওর চেহারায় দৃঢ়তা ফুটে উঠেছে। শান্ত গলায় ও বলল, 'চিন্তা করবেন না। বাবার ইচ্ছে পূরণ করব আমরা। মি. রস একজন আইনজীবী, তা ছাড়া বাড়িতে লণ্ডনের সেরা পুলিশ ডিটেকটিভও আছেন। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করব, প্রদীপগুলো খুঁজে বের করব।'

অন্য দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন করবেক। বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি মি. ট্রেলনির উপযুক্ত মেয়েই বটে!'

আমার দিকে তাকিয়ে ইশারা কবল মার্গারেট। তাড়াতাড়ি রওনা হলাম সার্জেন্ট ড-কে ডাকতে। দরজার কাছে যেতেই পিছন থেকে ডাকলেন করবেক।

'এক মিনিট, মি. রস। সম্পূর্ণ অচেনা একজনকে এর ভিতর ডেকে আনার আগে দু-একটা বিষয় পরিষ্কার করে নেয়া ভাল। ভদ্রলোককে আমি অবিশ্বাস করছি না, তবে তাঁকে আসল ঘটনা না জানানোই উচিত হবে। শুধু এটুকু বলবেন যে, আমার কয়েকটা জিনিস চুরি গেছে, সেগুলো উদ্ধার করতে চাই। প্রদীপগুলোর কথা বলব অবশ্যই, বিশেষ করে একটার বর্ণনা না দিলেই নয়। ওটা খাঁটি সোনার তৈরি। চোর ওটার গুরুত্ব বুঝতে না পেরে গলিয়ে ফেলতে পারে, কাজেই যত দ্রুত সম্ভব, ওটা ফিরে পেতেই হবে। ডিটেকটিভ ভদ্রলোক এলে দয়া করে আমাকে কথা বলতে দেবেন। আমি শুধু দরকারি তথ্যগুলো ওঁকে

জানাব, আর কিছু নয়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে একমত হলো মার্গারেট, আমিও সায় দিলাম প্রস্তাবটাতে। তারপর একটা চিন্তা মাথায় খেলে যেতেই আমি বললাম, 'আচ্ছা, কাজটা যদি সার্জেন্টকে প্রাইভেট কেস হিসেবে নিতে বলি, কেমন হয়? স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ব্যাপারে জানা আছে আমার, আপনি যতই গোপনীয়তা চান, ওরা একবার কিছুতে জড়িত হলে সেটা আর গোপন থাকে না। কিন্তু কেসটা যদি অফিশিয়াল দায়িত্বের বাইরে ব্যক্তিগতভাবে নেন উনি, তা হলে ওই ভয়টা থাকে না।'

'ভাল প্রস্তাব,' স্বীকার করলেন করবেক। 'কিন্তু যা করার তাড়াতাড়ি করুন। আমার ভয় হচ্ছে, প্রদীপগুলো না নষ্ট করে ফেলা হয়!'

আমাদেরকে বিস্মিত করে দিয়ে গমগমে গলায় মার্গারেট বলল, 'না! ওগুলো নষ্ট হবে না... একটাও না!'

'মানে!' বললাম আমি। 'তুমি কী করে জানলে?'

'জানি না,' মার্গারেট বলল। 'তবে আমি নিশ্চিত, ওগুলোর কিচ্ছু হবে না। সব অক্ষত থাকবে। আমার সমগ্র অস্তিত্ব এ-কথা বলছে।'

কথাটার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারলাম। কাঁধ ঝাঁকিয়ে শুধু বললাম, 'আমি যাচ্ছি সার্জেন্ট ড-র সঙ্গে কথা বলতে।'

boiRboi.net

আট

প্রদীপের খোঁজ

প্রথমে কিছুক্ষণ গাঁইগুঁই করল সার্জেন্ট ড, শেষে আমার পীড়াপীড়িতে কেসটাকে প্রাইভেট হিসেবে নিতে নিমরাজি হলো। তবে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিল, অবস্থা বেগতিক দেখলে হেডকোয়ার্টারে অবশ্যই রিপোর্ট দেবে সে। এরচেয়ে বেশি কিছুতে তাকে রাজি করানো যাবে না বুঝতে পেরে মেনে নিলাম শর্তটা। তারপর তাকে নিয়ে গেলাম স্টাডিতে, মার্গারেট আর মি. করবেকও এসে পড়লেন কিছুক্ষণের মধ্যে।

শান্ত ও সতর্কভাবে পুরো ঘটনার বর্ণনা দিলেন করবেক। ব্যাপারটা চমৎকৃত করল আমাকে। জানা না থাকলে বোঝা কঠিন, কিছু গোপন করছেন ভদ্রলোক। বললেন সবই, কিন্তু প্রদীপগুলোর পিছনে যে-রহস্য আছে, তা ঠিকই এড়িয়ে গেলেন। শুনে মনে হতে পারে, আর দশটা সাধারণ চুরির মতই ঘটনা এটা।

মক্কেলের কথা শেষ হতেই ড বলল, 'পট, নাকি দাঁড়িপাল্লা... সেটাই এখন প্রশ্ন।'

'মানে!' ভুরু কোঁচকালেন করবেক।

ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে হাসল ড। 'বার্মিংহামের পুরনো চোরদের একটা প্রবাদ বললাম। সেই আমলে ছোট ছোট অসংখ্য মেটাল ইণ্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছিল। সোনা আর রূপার কারিগররা

সবার কাছ থেকে ওই দুই ধাতুর জিনিস কিনত... জিনিসটা চোরাই, না বৈধ, তা নিয়ে মাথা ঘামাত না। একটা প্রশ্নই শুধু করত ওরা—পট, নাকি দাঁড়িপাল্লা? মানে... জিনিসটা অক্ষত রাখা যাবে, নাকি গলিয়ে ফেলতে হবে? সারাক্ষণই আগুনের উপর মেল্টিং পট দিয়ে রাখত ওরা, গলাতে হলে সঙ্গে সঙ্গে ওটায় ফেলে দিত জিনিসটা। আর যদি বৈধ মাল হয়, তা হলে চড়াত দাঁড়িপাল্লায়। আজকাল অবশ্য বার্মিংহামের ওই কারিগররা আর নেই। তবে সোনা গলাবার মত অন্য জায়গা আছে। আমাদের এখন জানা দরকার, চোরটার মতলব কী। সে কি আপনার প্রদীপগুলো গলিয়ে বিক্রি করবে, নাকি যেমন আছে তেমনই রেখে আর্টিফ্যাক্ট হিসেবে বিক্রি করবে। আচ্ছা, আপনি ছাড়া আর কেউ ওগুলো চিনতে পারবে?'

'নাহ্।'

'ওগুলোর মত আর কোনও প্রদীপ পাওয়া যাবে?'

'আমার তো মনে হয় না,' মাথা নাড়লেন করবেক। 'তবে হ্যাঁ, কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিল পাওয়া যেতে পারে।'

'হুম, জিনিসগুলো ইউনিক। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কোনও অভিজ্ঞ সদস্য, বা আর্ট-ডিলার, কিংবা মি. ট্রেলনির মত শৌখিন সংগ্রাহকরা নিশ্চয়ই প্রদীপগুলোর শৈল্পিক মূল্য বুঝতে পারবে?'

'অবশ্যই! মাথায় একটু বুদ্ধি থাকলেই যে-কেউ বুঝবে, জিনিসগুলো মূল্যবান।'

সার্জেন্টের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'তা হলে ওগুলো অক্ষত থাকবার একটা সম্ভাবনা আছে। দরজা-জানালা বন্ধ থাকার মানে হচ্ছে, হোটেলের কোনও সুযোগসন্ধানী বয়-বেয়ারা বা চেম্বারমেইড ওগুলো চুরি করেনি। যে করেছে, সে বিশেষভাবে ওগুলোর জন্যই এসেছিল... একজন প্রফেশনাল চোর! এমন লোক ওগুলো ধ্বংস করে দাম কমাবে না। যারা এ-ধরনের

কেনাবেচা করে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেই প্রদীপগুলো উদ্ধার করা যাবে। সামান্য কাজ, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে না-জানালেও চলে। তারমানে কেসটা প্রাইভেটভাবে নিতে কোনও অসুবিধে নেই আমার।'

'চুরিটা কীভাবে করা হয়েছে, সেটা বুঝতে পেরেছেন?' জিজ্ঞেস করলেন করবেক।

'না,' মাথা নাড়ল ড। 'প্রফেশনাল চোরদের অনেক রকম কৌশল থাকে, সেগুলো আমাদের জানবার কথা না। লোকটা ধরা পড়লে হয়তো জানা যাবে; তখন দেখবেন, ব্যাপারটা আসলে পানির মত সরল ছিল।'

বিরক্ত দেখাল করবেককে। বললেন, 'দেখুন সার্জেন্ট, ব্যাপারটা মোটেই সরল নয়। দরজা-জানালা সব ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। ফায়ারপ্লেস ছিল বটে, তবে সেটা ইঁট দিয়ে গেঁথে দেয়া হয়েছে কবে যেন। আমার হোটেলরুমে কোনও ভেন্টিলেটরও ছিল না। লোকটা তা হলে ঢুকল কী করে... বেরুলই বা কীভাবে? তা ছাড়া রাতে আমি একবারও রুম ছেড়ে বেরোইনি, চুরিটা করল কখন চোরটা?'

'শান্ত হোন, মি. করবেক,' বাধা দিয়ে বলল মার্গারেট। 'এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। প্রদীপগুলো শীঘ্রিই পাওয়া যাবে।'

মুখ গম্ভীর করে ওর দিকে তাকাল ড। 'আপনাকে খুব নিশ্চিত মনে হচ্ছে, মিস ট্রেলনি। কারণটা কী?'

'কী জানি!' কাঁধ ঝাঁকাল মার্গারেট। 'আমার মন বলছে, ওগুলো পাওয়া যাবে।'

'হুম!' বলে আমার সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করল ড, তারপর করবেকের দিকে ফিরল। ভদ্রলোক গতকাল কী করেছেন, না-করেছেন, তার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করল; প্রদীপগুলোর বর্ণনা

লিখে নিল, শেষে চলে গেল তদন্ত করতে। করবেকও বিদায় নিলেন, যাবার আগে বলে গেলেন, হাতের টুকটাক কাজ শেষ করে সন্ধ্যায় তিনি ফিরে আসবেন, রাতটা ট্রেলনি হাউসেই কাটাবেন।

দিনের বাকি সময়টা মার্গারেটকে খুব প্রাণচঞ্চলভাবে কাটাতে দেখলাম। প্রদীপের ব্যাপারে ওর দুশ্চিন্তা আছে বটে, তবে কাজেকর্মে সেটার কোনও প্রতিফলন দেখতে পেলাম না। দুজনে মিলে মি. ট্রেলনির সংগ্রহগুলো পরীক্ষা করলাম আমরা। করবেকের কথা থেকে মার্গারেটের বাবার মিশরপ্রীতির গভীরতা আঁচ করতে পেরেছি, তাই আর্টিফ্যাক্টগুলোকে নতুন আলোয় দেখতে শুরু করলাম। ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম, মানুষটা কতটা শ্রম, সময় আর আন্তরিকতা ঢেলে দিয়েছেন তাঁর সংগ্রহের পিছনে।

পুরো বাড়িটাই যেন অ্যান্টিক আর্টের এক বিশাল জাদুঘর। প্রাচীন মিশরীয় কফিন, বা সারকোফাগাস থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিভিন্ন রকমের কিউরিও ভর্তি কেবিনেট সাজিয়ে রাখা হয়েছে মি. ট্রেলনির কামরা, হলঘর, এমনকী সিঁড়ির ল্যাণ্ডিঙেও। এই অমূল্য সংগ্রহ দেখে যে-কেউ শিল্পবোদ্ধারই চোখ চকচক করে উঠবে।

মার্গারেট আমার সঙ্গে আছে, প্রতি মুহূর্তে ওর মধ্যেও আগ্রহ বাড়ছে অ্যান্টিকগুলোর প্রতি। প্রাচীন অ্যামিউলেট-ভর্তি একটা কেবিনেট দেখাশেষে ও বলল, 'শুনে অবাক হবে, আজ পর্যন্ত এসব জিনিসের দিকে ফিরেও তাকাইনি আমি। বাবা অসুস্থ না হলে হয়তো তাকাতামও না। কিন্তু এখন কেন যেন প্রচণ্ড টানছে আমাকে জিনিসগুলো... শরীরে একজন সংগ্রাহকের রক্ত বইছে বলেই কি না জানি না। আগে কখনও এমন টান অনুভব করিনি, অবাক ব্যাপার না?'

হাসলাম আমি। 'কী জানি!'

ঘুরে ঘুরে একেকটা রুম আর প্যাসেজে রাখা কিউরিওগুলো দেখতে থাকলাম আমরা। সংখ্যায় অনেক, ঠিকমত পরীক্ষা করতে গেলে দিনের পর দিন কেটে যাবে। কিছু কিছুর উপর তাই নজর বুলিয়ে সন্তুষ্ট থাকলাম; যেগুলো ব্যতিক্রম দেখায়, সেগুলোই শুধু দেখলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

হলঘরে রাখা একটা ইস্পাতের ফ্রেমওয়ার্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করল আমার। মার্গারেট জানাল, ওটা দিয়ে সারকোফাগাসের ভারি পাথরের ঢাকনা সরানো হয়। জিনিসটার সঙ্গে চাকা লাগানো আছে, ওটা নিয়ে কয়েকটা রুমে গেলাম আমরা, প্রাচীন কফিনগুলোর ডালা সরিয়ে দেখলাম। বেশিরভাগই খালি, নজর দিলাম তাই ভিতরের হায়ারোগ্লিফিক্সগুলোর উপরে। মার্গারেট দেখলাম অনেককিছু জানে ছবিতে লেখা ওসব বর্ণ সম্পর্কে, গত এক বছরে মি. ট্রেলনি শিখিয়েছেন ওকে। ওর স্মৃতিশক্তি ভাল, কিছুই ভোলেনি, আমাকে সাহায্য করল পাঠোদ্ধারে। তবে বিশেষ কিছু জানতে পারলাম না। তবে সময়টা চমৎকার কাটল, প্রাচীন মিশরের পুরাকীর্তি নিয়ে গবেষণা করতে করতে সময়ের কথা ভুলে গেলাম আমরা, ভুলে গেলাম বাড়িতে বিরাজ করতে থাকা অজানা আতঙ্ক আর রহস্যের কথা।

মি. ট্রেলনির কামরায় মোট তিনটে সারকোফাগাস আছে, ওগুলোই সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বলে মনে হলো আমার কাছে। এর মধ্যে নাম না জানা গাঢ় রঙের পাথরের তৈরি একটা, দ্বিতীয়টা তৈরি হয়েছে লোহিতাশ্ম দিয়ে, শেষটা আয়রন-স্টোনের। হায়ারোগ্লিফ আছে সবক'টায়, তবে তৃতীয়টার লেখাগুলো আরগুলোর চেয়ে একেবারেই ব্যতিক্রম। হলদে-খয়েরি রঙের একটা কালিতে লেখা হয়েছে ওটা, জ্বলজ্বল করছে এত বছর পরও। মেক্সিকান অনিক্সের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়, পার্থক্য শুধু

এটুকুই যে, পাক খাওয়ার জায়গাগুলো ঠিকমত চিহ্নিত করা হয়নি। কয়েক জায়গায় প্রায় স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল প্রলেপও আছে। পুরো সারকোফাগাসটাই... ঢাকনার ভিতর-বাহির সহ... ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হায়ারোগ্লিফে ভর্তি, সংখ্যায় এত বেশি যে গোনা সম্ভব না। লেখাগুলো আয়রন-স্টোনের হলদেটে গায়ে ফুটে আছে জ্বলজ্বল করে। কফিনটা আকারেও বেশ বড়—প্রায় নয় ফুট, চওড়ায় এক গজের মত। ভিতর ও বাইরের দিকটা একেবারে মসৃণ, কোণ-টোন নেই একটাও।

'সর্বনাশ!' বলে উঠলাম আমি। 'এটা নিশ্চয়ই কোনও দানবের জন্য তৈরি করা হয়েছিল।'

'কিংবা দানবীর জন্য!' বলল মার্গারেট।

ভুরু কুঁচকে তাকালাম ওর দিকে। 'হঠাৎ দানবীর কথা মনে হলো কেন?'

'এমনিই,' হাসল মার্গারেট। 'সব খালি পুংলিঙ্গে শুনতে ভাল লাগছিল না।'

'হুম!' সারকোফাগাসটার দিকে ইঙ্গিত করলাম। 'এটার বিষয়ে কিছু জানা আছে তোমার?'

'উঁহুঁ। জিনিসটা দেখে প্রথম দিনই আমার কৌতূহল হয়েছিল, তাই ওটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম বাবাকে। তিনি বললেন, "ওটার গল্প কোনও একদিন তোমাকে শোনাব, মা। তবে আজ নয়। এখনও সময় হয়নি। যেদিন হবে, সেদিনই শোনাব তোমাকে সেই আশ্চর্য কাহিনি!" কথাটা শুনে গা শিরশির করে উঠেছিল। বাবাকে প্রশ্ন করেছিলাম, "কবে সেই সময় আসবে?" জবাবে তিনি বললেন, "আসবে... খুব শীঘ্রিই সময় আসবে। যদি বেঁচে থাকি, এ-গল্প তুমি শুনতে পাবে নিশ্চয়ই।" বাবার বলার ভঙ্গিটা এত ভয় পাইয়ে দিয়েছিল যে, পরে আর কখনও ওটার কথা জিজ্ঞেস করবার সাহস হয়নি।'

একটু আশার আলো দেখতে পেলাম। মি. ট্রেলনি নিশ্চয়ই কোনও কারণ ছাড়া সারকোফাগাসটা নিজের শোয়ার ঘরে রাখেননি? কিছু একটা রহস্য আছে এটার মধ্যে, নিজের মেয়ের কাছেও গোপন রেখেছেন তা। পুরো রহস্যটার সঙ্গে জিনিসটার সম্পর্ক থাকা অসম্ভব কিছু নয়। ঠিক করলাম, পরে এ-বিষয়ে আরও খোঁজখবর নিতে হবে।

সারকোফাগাসটার পাশে সবুজ পাথরে গড়া একটা নিচু টেবিল আছে, ভিতরে লাল শিরা... অনেকটা ব্লাডস্টোনের মত। পায়াগুলো শেয়ালের পায়ের আদলে করা হয়েছে, প্রতিটাকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে রেখেছে একটা করে সোনালি সাপ। ওটার উপরে রাখা হয়েছে একটা অদ্ভুত, সুন্দর বাক্স। পাশ থেকে আকৃতিটা ঠিক একটা সপ্তভুজের মত। গোড়াটা গাঢ় সবুজ, উপরদিকে ধীরে ধীরে হালকা হয়ে ডালাতে গিয়ে হলদেটে রঙে পরিণত হয়েছে। এমন কোনও পাথর আমি আগে দেখিনি, নতুন কোনও মাদারস্টোন অথবা সংকর বলে ধারণা করলাম ওটাকে। ছোট্ট বাক্সটার সারা শরীর হায়ারোগ্লিফিক্সে ভর্তি, ঠিক সারকোফাগাসে যেমন দেখেছি, সেই রঙে। লম্বায় আড়াই ফুট বাক্সটা, চওড়ায় অর্ধেক, উচ্চতা প্রায় এক ফুট। ডালাতে সরাতে চাইলাম, কিন্তু পারলাম না। ওটা শক্তভাবে আটকানো। বাধ্য হয়ে সরে এলাম।

সারকোফাগাসের অন্যপাশে রয়েছে আরেকটা ছোট টেবিল—অ্যালাব্যাস্টারে তৈরি। ওটার শরীর খোদাই করে স্থায়ীভাবে বসানো হয়েছে বিভিন্ন দেব-দেবী, আর জন্তুরাশির প্রতীক। টেবিলের উপর রাখা হয়েছে এক বর্গফুট আকৃতির একটা পাথুরে ক্রিস্টালের স্বচ্ছ বাক্স, তাতে সারকোফাগাস আর ছোট বাক্সটার মত একই রঙ আর নকশায় হায়ারোগ্লিফিক্স আঁকা হয়েছে। জিনিসটা বেশ আধুনিক, বানানো হয়েছে বেশিদিন

হয়নি সম্ভবত। তবে ওটার ভিতরে যা রাখা হয়েছে, তা মোটেই আধুনিক নয়। মখমলের কাপড়ের একটা স্তূপের উপর শোভা পাচ্ছে একটা মমির হাত। নিখুঁত, হঠাৎ দেখলে চমকে যেতে হয়। হাতটা নারীর—পেলব, দীর্ঘ... প্রায় অবিকৃতই বলা চলে। মমি-করার প্রক্রিয়ায় হাতটার আকৃতি বা সৌন্দর্য বিন্দুমাত্র নষ্ট হয়নি। কবজির কাছটায় যেখানে কাটা হয়েছে হাতটা, সেখানটাও শুকিয়ে যায়নি। চামড়াটা আজও উজ্জ্বল ফর্সা, দেখতে মাখনের মত মোলায়েম। এত চমৎকারভাবে কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংরক্ষণ করা যায়, তা আমার ধারণাতে ছিল না। একটামাত্র খুঁত দেখলাম হাতটায়, তবে তা সংরক্ষণের খুঁত নয়। হাতটাতে পাঁচটার জায়গায় সাতটা আঙুল! কবজির কাটাটাও এবড়ো-থেবড়ো, যেন তাড়াহুড়ো করে কাটা হয়েছিল ওটা। লালচে-খয়েরি একটা দাগ রয়েছে ওখানটায়—হাজার বছরের পুরনো রক্তের! হাতটার পাশেই একটা গুবরে পোকার অলঙ্কার আছে, মূল্যবান পাথর বসানো।

'এ হলো বাবার আরেক রহস্য,' বলে উঠল মার্গারেট। 'বলত, হাতটা নাকি তার সংগ্রহশালার সবচেয়ে দামি জিনিস। এটার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাকি আর একটামাত্র জিনিস আছে। অন্য সেই জিনিসটা কী, জিজ্ঞেস করেছি অনেকবার; কিছুতেই বলেনি। শুধু বলেছে, সময় হলেই নাকি জানতে পারব সব... যদি বাবা বেঁচে থাকে!'

যদি বেঁচে থাকেন মি. ট্রেলনি! আবার শুনলাম কথাটা। এর কি বিশেষ কোনও গুরুত্ব আছে? বার বার কথাটা বলেছেন কেন ভদ্রলোক? আনমনে চোখ বোলালাম—সারকোফাগাস, সপ্তভুজ-বাক্স, আর মমির হাত... জিনিস তিনটে মিলে একটা বিরাট রহস্যে পরিণত হচ্ছে বটে।

একজন চাকর এসে ডাক দিল মার্গারেটকে, কী যেন কাজ

আছে। চলে গেল ও। একা একা আমি আরও কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম ঘরের ভিতর, কিউরিওগুলো দেখলাম। তবে মার্গারেটের অনুপস্থিতিতে কেন যেন কাজটাতে আর আগ্রহ পেলাম না।

ঘণ্টাখানেক পর নীচতলায় গিয়ে দেখা পেলাম আবার মার্গারেটের, মিসেস গ্র্যান্টের সঙ্গে ইউজিন করবেকের থাকার ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করছে। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না ওরা, লোকটাকে মি. ট্রেলনির কামরার কাছাকাছি, নাকি দূরে কোথাও থাকতে দেবে। আমাকে দেখতে পেয়ে পরামর্শ চাইল। আমি জানিয়ে দিলাম, আপাতত ভদ্রলোককে দূরের কোনও রুমে থাকতে দেয়া হোক। প্রয়োজন হলে পরে নাহয় কাছাকাছি কোনও রুমে নিয়ে আসা যাবে। আমার কথা শুনে মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল মিসেস গ্র্যান্ট।

কথা বলছিলাম আমরা নীচতলার একটা সাজঘরে, ওটার ফার্নিচারগুলো বাড়ির বাকি সব আসবাবপত্রের চেয়ে একেবারেই আলাদা। কাল রাতে মার্গারেট এর পাশের রুমেই থেকেছে। ওকে জিজ্ঞেস করলাম এই ব্যতিক্রমের কারণ।

'বাবার খেয়াল,' হেসে বলল মার্গারেট। 'প্রথম যখন এ-বাড়িতে এলাম, তখন ওঁর মনে হয়েছিল, পুরনো আমলের মমি-টমির মধ্যে থাকতে গেলে আমি ভয় পাব; তাই সাজঘর আর পাশের রুমটা অন্যভাবে সাজিয়েছিলেন। এখানকার একটা জিনিসও মিশরীয় নয়। ওই যে, কেবিনেটটা দেখছ? ওটা নেপোলিয়নের ছিল।'

'হুম, কিছুই মিশরীয় নয়?' চোখ বোলালাম ঘরের ভিতর। কেবিনেটটা দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'ওটা একটু ভাল করে দেখব?'

'নিশ্চয়ই!' উৎসাহী গলায় বলল মার্গারেট। 'দারুণ জিনিস। বাবার মতে ওটার ভিতর-বাইরের ফিনিশিং হচ্ছে একেবারে

নিখুঁত।'

কাছে গিয়ে কেবিনেটটা ভাল করে দেখলাম। টিউলিপ কাঠে তৈরি, নকশাকাটা; পায়াগুলো গিলটি-করা ব্রোঞ্জের। একটা ড্রয়ার খুললাম, ভিতরটা দেখার ইচ্ছে... কিন্তু ওটা টানতেই ভিতরে কী যেন ঝন ঝন করে উঠল।

'কী যেন আছে এটাতে,' বললাম আমি। 'খুললে অসুবিধে নেই তো?'

'না, না, অসুবিধে কীসের?' এগিয়ে এসে বলল মার্গারেট। 'জরুরি কিছু থাকার কথা না। হয়তো চাকরানীদের কেউ অদরকারি জিনিস ফেলে রেখেছে ভিতরে। খোলো।'

টান দিয়ে খুললাম ড্রয়ারটা, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হলাম দুজনেই। ড্রয়ারের মধ্যে অনেকগুলো প্রাচীন মিশরীয় প্রদীপ দেখা যাচ্ছে—নানা ধরনের, নানা আকৃতির। ঝুঁকে গেলাম ওগুলোর উপর, কাছ থেকে দেখতে শুরু করলাম। উত্তেজনায় বুক ঢিব ঢিব করছে, আড়চোখে মার্গারেটেরও একই অবস্থা লক্ষ করলাম।

ঠিক তখুনি সদর দরজার বেল বাজতে শুনলাম। একটু পরেই রুমে উদয় হলেন মি. করবেক; সঙ্গে সার্জেন্ট ড-ও আছে। সাজঘরের দরজা খোলা দেখে ঢুকে পড়েছে দুজনেই। সোজা হয়ে ঘুরলাম ওঁদের দিকে।

'ভাল খবর,' বললেন করবেক। 'আমার জিনিসপত্র পাওয়া গেছে, কিছুই খোয়া যায়নি...' চেহারা বিমর্ষ হয়ে আছে তাঁর, 'শুধু প্রদীপগুলো ছাড়া। ওগুলোই সবচেয়ে দামি জিনিস ছিল...' বলতে বলতে থেমে গেলেন তিনি। খোলা ড্রয়ারটার দিকে নজর পড়েছে। পরমুহূর্তে একটা চিৎকার বেরিয়ে এল ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে—বিস্ময় এবং আনন্দের! কেবিনেটের দিকে ছুটে গেলেন তিনি।

'আমার প্রদীপ! আমার প্রদীপ!! এই তো ওগুলো!!! ক্... কিন্তু এখানে এল কী করে?'

জবাব দিতে পারলাম না কেউ, নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম। আড়চোখে একবার সার্জেন্ট ড-র দিকে তাকালাম, একদৃষ্টে মার্গারেটের দিকে তাকিয়ে আছে সে—চোখে সন্দেহের ছায়া।

নয়

জানার প্রয়োজনীয়তা

প্রদীপগুলো ফিরে পেয়ে আনন্দে আটখানা হয়ে গেছেন মি. করবেক। একটা-একটা করে তুলছেন, আর জড়িয়ে ধরছেন বুকে। যেন আদরের ধন ওগুলো। বয়স্ক একজন মানুষের জন্য আচরণটা ছেলেমানুষির পর্যায়ে পড়ে। বিস্মিত হয়ে তাই আমরা সবাই দেখতে থাকলাম তাঁর কাণ্ডকারখানা।

সার্জেন্ট ড জিজ্ঞেস করল, 'এগুলোই আপনার চুরি যাওয়া প্রদীপ? চিনতে ভুল হচ্ছে না তো?'

ঝট্ করে তার দিকে তাকালেন মি. করবেক। 'অবশ্যই। ভুল হবার প্রশ্নই ওঠে না। সারা দুনিয়ায় এমন প্রদীপের সেট এই একটাই আছে...'

'...আপনার জানামতে।' যোগ করল ড। তার গলায় থমথমে ভাব। 'ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এই ধরনের প্রদীপ থাকতে পারে। থাকতে পারে মি. ট্রেলনির কাছেও। আর্টিফ্যাক্ট নকলও হয় বলে

শুনেছি। কিছু মনে করবেন না, মি. করবেক, কিন্তু এই ড্রয়ারের প্রদীপগুলো যে আপনার, তার কোনও প্রমাণ দেখাতে পারবেন? এগুলো যে মি. ট্রেলনির সম্পত্তি নয়, তা কী করে বুঝব? আপনারগুলো হয়তো এই সেটেরই নকল ছিল!'

খেপে গেলেন করবেক। শিষ্টাচার ভুলে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন সরোষে। 'প্রমাণ! নকল! ব্রিটিশ মিউজিয়াম! নিকুচি করি আপনার! যত্তোসব উদ্ভট কথা শোনাতে এসেছেন। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে দেখছি ইজিপ্টোলজির একটা শাখা খুলতে হবে। তা হলে যদি আপনাদের একটু বুদ্ধিশুদ্ধি হয়! বলতে চাইছেন আমি ভুল করছি? শুনুন সার্জেন্ট, মরুভূমির মধ্যে তিন মাস ধরে বয়ে বেড়িয়েছি আমি প্রদীপগুলো, রাতের পর রাত জেগেছি ওগুলো চোখে চোখে রাখতে। আতশ কাঁচের তলায় রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখেছি প্রতিটা প্রদীপকে, চোখ ব্যথা করে ফেলেছি... ওগুলোর প্রতিটা বাঁক, প্রতিটা দাগ আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত ওগুলোকে চিনি আমি। দেখুন... দেখুন আপনি!' দুটো প্রদীপ তুলে ধরলেন ভদ্রলোক। 'এমন আকৃতির কোনও প্রদীপ আপনারা কেউ কোনোদিন চোখে দেখেছেন? এগুলোর গায়ে খোদাই-করা প্রতিকৃতিগুলো দেখুন... সাধারণ মনে হচ্ছে? হ্যাথর দেবীর সাতটা রূপ রয়েছে এখানে, প্রাচীন এক রাজকন্যার অবয়ব আছে—ওসাইরিস আর রা-র মাঝখানে, মৃতের নৌকায় দাঁড়িয়ে আছে... সামনে রয়েছে ঘুমের চোখ, পায়ে ভর দিয়ে নুয়ে আছে রাজকন্যার সামনে; উত্তরে উদয় হয়েছে হারমোচিস! কী নিখুঁত একটা ছবি! কী ধারণা আপনার? এ-জিনিস ব্রিটিশ মিউজিয়াম বা বাউ স্ট্রিটে পাওয়া যাবে? নাকি গিজা মিউজিয়াম, ফিযউইলিয়াম, প্যারিস, লেইডেন, বা বার্লিনে গবেষণা করে এসেছেন আপনি... ওই অভিজ্ঞতায় এই হায়ারোগ্লিফ-টাকে বিচার করছেন, ভাবছেন এমন জিনিস সহজেই

নকল করা যায়। আচ্ছা, বলুন দেখি, প্যাপিরাসে মোড়ানো *টেট* হাতে নিয়ে *টাহ্-সেকার-অসার* কী করছে এই ছবিটায়? এই জিনিস নিশ্চয়ই আগেও ব্রিটিশ মিউজিয়াম, বা গিজা, বা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে দেখেছেন আপনি?'

জবাব দিতে পারল না ড, আমতা আমতা করতে থাকল। তার এই অবস্থা দেখে হঠাৎই যেন পানি পড়ল মি. করবেকের আগুনে। পারিপার্শ্বিকতার বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠলেন তিনি, শান্ত গলায় বললেন, 'আমি অত্যন্ত লজ্জিত, সার্জেন্ট। মাথা গরম করে ফেলেছি, কাজটা ঠিক হয়নি। আসলে... প্রদীপগুলো আমি চিনতে পারছি কি না, এ-ধরনের সন্দেহের কথা শুনে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। কিছু মনে করবেন না।'

মুচকি হাসি ফুটল ডিটেকটিভের ঠোঁটে। বলল, 'আমি কিছুই মনে করিনি। জেরার সময় লোকে খেপে গেলে আমি বরং খুশি হই। তাতে সত্যি কথাটা বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে। খেয়াল করেছেন কি না জানি না, তবে গত দু'মিনিটে আপনি প্রদীপগুলো সম্পর্কে এমন অনেককিছু বলে ফেলেছেন, যা আমার জানা ছিল না।'

মি. করবেকের চেহারায় তিক্ততা ফুটল, বোকা বনেছেন তিনি। ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফিরলেন আমার আর মার্গারেটের দিকে। বললেন, 'এবার বলুন, কীভাবে খুঁজে বের করলেন প্রদীপগুলো।'

'আমরা খুঁজে বের করিনি তো!' বলে উঠলাম বিস্মিত কণ্ঠে।

ভুরু কোঁচকালেন মি. করবেক। 'ঠাট্টা করছেন নাকি? খুঁজে বের করেননি মানে! তা হলে এগুলো আপনাদের হাতে এল কোত্থেকে?'

বিস্ময়টা সামলে বললাম, 'যা দেখছেন, তা-ই। এইমাত্রই এগুলো ড্রয়ারের মধ্যে পেলাম আমরা... তাও দুর্ঘটনাক্রমে।'

অবাক হয়ে আমাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালেন করবেক। 'বলতে চাইছেন, এগুলো কেউ ফিরিয়ে আনেনি? আপনারা স্রেফ খুঁজে পেয়েছেন ড্রয়ারের মধ্যে?'

'কেউ তো এনেছে নিশ্চয়ই,' বললাম আমি, 'প্রদীপগুলোর তো আর পা নেই যে হেঁটে হেঁটে আসবে। কিন্তু কে এনেছে, কখন... কীভাবে এনেছে, তা আমরা দুজন জানি না। চাকরদের জিজ্ঞেস করে দেখা যেতে পারে, ওরা হয়তো বলতে পারবে।'

কিছুক্ষণ নীরব রইলেন করবেক। আমি আর মার্গারেটও বলার মত কিছু খুঁজে পেলাম না। শেষে নীরবতা ভেঙে ড বলল, 'রহস্যটা ভেদ করা দরকার। মিস ট্রেলনি, চাকরদের ডাকতে পারি?'

'প্লিজ!'

একে একে ডাকা হলো চাকরদের। জিজ্ঞেস করা হলো, ড্রয়ারে প্রদীপগুলো এল কীভাবে, তা জানে কি না। কিন্তু কেউই কিছু বলতে পারল না। শেষে উপায়ান্তর না দেখে হাল ছেড়ে দিলাম আমরা। ট্রেলনি হাউসের ব্যাখ্যাহীন ঘটনাপ্রবাহের নতুন এক অধ্যায় হয়ে রইল প্রদীপগুলো।

নিষ্ফল জিজ্ঞাসাবাদ শেষে নরম কাপড়ে মুড়ে প্রদীপগুলো একটা টিনের বাক্সে ভরে ফেললেন করবেক। সেটা তাঁর কামরায় নিয়ে যাওয়া হলো। পাঠকদের জানিয়ে রাখি, রাতভর ওটা সশস্ত্র পাহারা দিল দুই ডিটেকটিভ। পরদিন বাড়িতে একটা ছোট সেফ আনা হলো, সেটায় ঢুকিয়ে রাখা হলো প্রদীপগুলো। সেফটার তালা খুলতে দুটো চাবি প্রয়োজন হয়, একটা আমাকে রাখতে দেয়া হলো, অন্যটাও আমার ব্যাঙ্কের সেফটি ডিপোজিট বক্সে রেখে দিয়ে এলাম। এভাবেই প্রদীপগুলোর চুরি ঠেকাতে নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা নিলাম আমরা।

যা হোক, প্রদীপ খুঁজে পাবার ঘণ্টাখানেক পর বাড়িতে হাজির

হলেন ডা. উইনচেস্টার, হাতে একটা বড়সড় প্যাকেজ। ওটা খুলতেই একটা বেড়ালের মমি বেরুল। মার্গারেটের অনুমতি নিয়ে ওটা নীচতলার শোবার ঘরে রাখলেন ডাক্তার, তারপর সিলভিওকে নিয়ে এলেন মমিটার কাছে। অবাক হয়ে সবাই লক্ষ করলাম, নতুন মমিটার দিকে মোটেই নজর নেই পোষা বেড়ালটার। শান্ত-স্বাভাবিক ভঙ্গিতে রুমের ভিতর ঘুরে বেড়াতে থাকল সে। ডা. উইনচেস্টারের মধ্যে কোনও বিস্ময় দেখলাম না, তিনি সম্ভবত এমনটাই আশা করছিলেন। পরীক্ষা শেষ হতেই জানালেন, এবার সিলভিওকে আবার মি. ট্রেলনির বেডরুমে নিয়ে যাবেন। আমরা সবাই তাঁকে অনুসরণ করলাম তীব্র কৌতূহল নিয়ে।

মার্গারেটের বাবার রুমে পা দিতেই ডাক্তারের কোলে সিলভিও অস্থির হয়ে উঠল। *ম্যাঁও* করে ডেকে উঠেই ঝটকা দিল বেড়ালটা, নিজেকে মুক্ত করে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেঝেতে, তারপর ছুটে মিশরীয় বেড়ালের মমি রাখা টেবিলটার দিকে। কাছে গিয়ে গরগর করে উঠল, খামচি দিতে থাকল টেবিলের গায়ে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল মার্গারেট, রীতিমত যুদ্ধ করে সিলভিওকে তুলে নিল কোলে, বেরিয়ে গেল রুম থেকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শান্ত হয়ে গেল বেড়ালটা।

সিলভিওকে নিজের রুমে রেখে ও যখন ফিরল, তখন নানা রকমের মন্তব্য ভাসতে শুরু করল।

'ঠিক যেমনটা ভেবেছিলাম!' বললেন ডা. উইনচেস্টার।

'মানে কী এর?' বোকা বোকা কণ্ঠে জানতে চাইল মার্গারেট।

'অদ্ভুত... খুবই অদ্ভুত!' বললেন করবেক।

'অদ্ভুত বটে, তবে এ থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না,' বলল ড।

আমি অবশ্য কিছু বললাম না... বলার মত কিছু পেলাম না বলেই।

boiRboi.net

বিষয়টা নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করলাম আমরা, তবে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত আলোচনাটা মুলতবি রাখব বলে ঠিক করলাম সবাই মিলে। নতুন কোনও তথ্য পাওয়া গেলে পরে এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা যাবে।

সেদিন সন্ধ্যায় নিজের কামরায় খাতা নিয়ে একাকী বসে ছিলাম আমি, সারাদিনের ঘটনাগুলো লিখে রাখছি। এমন সময় দরজায় মৃদু করাঘাত শুনলাম। গলা চড়িয়ে অনুমতি দিতেই সার্জেন্ট ড এসে ঢুকল ভিতরে, সাবধানে ভিড়িয়ে দিল দরজাটা।

'বসুন সার্জেন্ট,' চেয়ার দেখিয়ে বললাম। 'কী ব্যাপার?'

'প্রদীপগুলোর বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার কথা হওয়া দরকার,' গলার স্বর খাদে নামিয়ে বলল ড। 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন, ওগুলো যেখানে পাওয়া গেল, তার ঠিক পাশের কামরাতেই কাল রাতে মিস ট্রেলনি থেকেছেন।'

'হ্যাঁ। তাতে কী হয়েছে?'

'কাল রাতে বাড়ির কোথাও একটা জানালা খোলা এবং বন্ধ করা হয়েছিল, আমি শব্দ শুনতে পেয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়েছিলাম, ওটা কোথায় দেখার জন্য, যদিও শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাইনি।'

'হ্যাঁ, অমন শব্দ আমিও শুনেছি বটে,' স্বীকার করলাম।

'ব্যাপারটা আপনার কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়নি?'

'অস্বাভাবিক!' ভুরু কোঁচকালাম। 'এই বাড়িতে আসার পর থেকে এত বেশি অস্বাভাবিক জিনিস দেখেছি যে, স্বাভাবিক বলে যে কিছু আছে, তা-ই ভুলতে বসেছি। আর আপনি বলছেন কিনা জানালা খোলার কথা! এর ভিতর অস্বাভাবিক কী আছে?'

একটু চুপ করে থাকল সার্জেন্ট, যেন কথা গুছিয়ে নিচ্ছে। তারপর বলল, 'দেখুন সার, অনেক লোক জাদু আর তন্ত্র-মন্ত্রে বিশ্বাস করে; তবে আমি তাদের দলে নই। নিরেট তথ্য-প্রমাণে

আমি বিশ্বাস করি, কারণ অভিজ্ঞতায় দেখেছি, সবকিছুর পিছনে একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। নতুন ভদ্রলোক বলছেন যে, জিনিসগুলো তাঁর হোটেল-কক্ষ থেকে চুরি হয়েছে। ওঁর কথাবার্তায় এটাও বুঝতে পেরেছি, ওগুলোর আসল মালিক মি. ট্রেলনি নিজে! মিস ট্রেলনির কথা ভাবুন এবার, কাল রাতে নিজ থেকে রুম বদলালেন উনি, নীচতলায় চলে গেলেন। রাতে আমরা জানালা খোলা-বাঁধার শব্দ পেলাম, আর দিনের বেলায় চুরির মালগুলো পাওয়া গেল তাঁরই পাশের কামরার কেবিনেটে! কী বলতে চাইছি, বুঝতে পারছেন?'

কেন যেন শীত শীত করে উঠল শরীরটা। সার্জেন্টের কণ্ঠে স্পষ্ট অভিযোগের সুর। মার্গারেটকে কীভাবে নির্দোষ প্রমাণ করব আমি? ডিটেকটিভের চোখে চোখ রাখলাম। শান্ত গলায় বললাম, 'আপনি কি বলতে চাইছেন, মার্গারেটই চুরি করেছে প্রদীপগুলো?'

'ঠিক তা না,' বলল ড। 'আমার ধারণা, আদতে কোনও চুরির ঘটনাই ঘটেনি হোটেলে। প্রদীপগুলো এ-বাড়িতে নিয়ে এসেছিল কেউ, নীচতলার জানালা খুলে সেগুলো হাতবদল করেছে ভিতরের কারও সঙ্গে। কেবিনেটের মধ্যে জিনিসগুলো রাখা হয়েছিল যথাসময়ে উদ্ধারের জন্য।'

কিছুটা স্বস্তি পেলাম কথাটা শুনে। যাক, সরাসরি মার্গারেটকে চোর বলছে না লোকটা। চেহারায় স্বস্তিটা ফুটতে দিলাম না অবশ্য, মুখে গাম্ভীর্য ধরে রেখে প্রশ্ন করলাম, 'ওগুলো কে নিয়ে এসেছিল বলে মনে হয় আপনার?'

'আমার ধারণা, করবেক নিজেই। তৃতীয় কাউকে এ-ধরনের কাজে বিশ্বাস করবার কথা নয়।'

'এর মানে হচ্ছে ইউজিন করবেক একজন মিথ্যেবাদী ও ধাপ্পাবাজ। মিস ট্রেলনির সঙ্গে মিলে ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে সে,

আমাদের সবাইকে প্রদীপগুলোর ব্যাপারে ধোঁকা দিতে চাইছে... এটাই বোঝাতে চাইছেন তো?'

'কথাগুলো বড্ড রূঢ় হয়ে গেল। তবে... যুক্তি এবং প্রমাণ আমাকে যেদিকে নিয়ে যায়, সেদিকেই যাব আমি। হতে পারে, মিস ট্রেলনির বদলে বাড়ির অন্য কেউ এর সঙ্গে জড়িত। সেটা মাথায় আছে আমার। তবে ওই ইজিপ্টোলজিস্টকে মোটেই বিশ্বাস করতে পারছি না আমি। ওকে এই বাড়িতে থাকতে দেয়াটা উচিত হয়নি আপনাদের। আমার আর জনি রাইটের কাজ বাড়িয়েছেন, লোকটার উপর সারাক্ষণই একটা চোখ রাখতে হবে। অবশ্য তাতে যে অসুবিধে হবে, এমন নয়। আমরা খুশিমনেই গ্রহণ করছি বাড়তি দায়িত্বটা।'

'ভদ্রলোক এখন কোথায়?'

'নিজের কামরায়, প্রদীপগুলো যখের ধনের মত আগলে রেখেছে। জনি রাইট আছে ওর সঙ্গে। একটু পর ও অবশ্য পাহারায় যাবে, তখন আমি নিজে করবেকের সঙ্গে থাকব। চিন্তা করবেন না, আমরা থাকতে এ-বাড়িতে ও কোনও চুরিচামারি করতে পারবে না।'

'শুনে খুশি হলাম,' বললাম শুকনো গলায়।

উঠে দাঁড়াল ড। 'যা কথা হলো, তা কিন্তু শুধু আপনার-আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলাম। চলে গেল সার্জেন্ট। তবে শান্তি পেলাম না। একটু পর হাজির হলেন ডা. উইনচেস্টার—রাতের মত রোগীকে দেখা শেষ হয়েছে তাঁর, বাড়ি ফেরার আগে আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন।

চেয়ারে বসেই বলতে শুরু করলেন তিনি, 'পুরো ব্যাপারটাই অদ্ভুত। মিস ট্রেলনি আমাকে এইমাত্র হারানো প্রদীপগুলোর কথা বললেন। ওগুলো নাকি চুরি গিয়েছিল, তারপর আবার পাওয়া

গেছে নীচতলার নেপোলিয়ন কেবিনেটে। রহস্যের আরেকটা জট এটা, তবে আমি অখুশি হইনি। কেসটার বাস্তব সমস্ত সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা প্রায় শেষ আমার, এখন নজর দিচ্ছি অতিপ্রাকৃতের উপর। আশা করছি ওভাবে খুব শীঘ্রি একটা সমাধানে পৌঁছুতে পারব। মি. করবেকের সঙ্গে সেজন্য কথা বলব কি না ভাবছি। মিশর সম্পর্কে ভদ্রলোক অনেককিছু জানেন, সামান্য একটু হায়ারোগ্লিফ অনুবাদ করে দিতে নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না? কাজটা ওঁর জন্য ছেলেখেলা। কী বলেন আপনি, মি. রস? ওঁর সঙ্গে আলাপ করব?'

জবাব দিতে এক মুহূর্ত দেরি করলাম না। সার্জেন্ট ড-র কথা আমি এক কান দিয়ে শুনেছি, অন্য কান দিয়ে বের করে দিয়েছি। করবেককে মোটেই মন্দ লোক বলে মনে হয়নি আমার, যে যা-ই বলুক না কেন। তা ছাড়া এ-মুহূর্তে যত ধরনের সাহায্য পাওয়া যায়, সবই প্রয়োজন আমাদের। তাই বলে উঠলাম, 'আলাপ করবেন না মানে! অবশ্যই করবেন। ভদ্রলোক ইজিপ্টোলজির উপর একজন বিশেষজ্ঞ, এসবের ব্যাপারে তাঁর সীমাহীন আগ্রহ রয়েছে। তবে একটা ব্যাপার... উনি যা যা বলবেন, তা অন্যদের সামনে প্রকাশ করার বিষয়ে একটু সতর্ক থাকতে হবে আপনাকে।'

'আমি তো ভাবছি কাউকেই কিছু বলব না,' বাধা দিয়ে বললেন ডাক্তার। 'শুধু আপনি ছাড়া। লোকে আমার কথা শুনে কোনও রকম ভুল ধারণা নিয়ে বসে থাকুক, তা আমি কখনোই চাই না।'

'ভাল বলেছেন। এক কাজ করুন, এখানেই বসুন। আমি মি. করবেককে পাইপ খাওয়ার কথা বলে নিয়ে আসছি।'

রাজি হলেন ডা. উইনচেস্টার।

করবেকের রুমে গিয়ে দেখলাম, তিনি দুই ডিটেকটিভের

সঙ্গে গল্প জুড়েছেন। যথাসম্ভব অভিনয় করে তাঁকে ধূমপানের আমন্ত্রণ জানালাম। ডিটেকটিভরা আপত্তি করল না, বরং মনে হলো—ভদ্রলোক তাদেরকে ছেড়ে বেরিয়ে আসায় হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে।

'প্রদীপগুলো ওভাবে রেখে আসা বোধহয় ঠিক হলো না,' হাঁটতে হাঁটতে বললেন করবেক। 'পুলিশের লোক, ক'টাকাই বা মাইনে পায়? ওগুলো তো অমূল্য জিনিস।'

দেখা যাচ্ছে, শুধু সার্জেন্ট ড-ই করবেককে সন্দেহ করছে না, তিনিও সার্জেন্টকে সন্দেহ করছেন। তাড়াতাড়ি বললাম, 'চিন্তা করবেন না, ড-কে আমি আগে থেকে চিনি। অত্যন্ত সৎ, ক'টা প্রদীপ চুরি করে দুর্নাম কামাবে না।'

কাঁধ ঝাঁকালেন করবেক।

রুমে ফিরতেই এগিয়ে এলেন ডাক্তার। করবেকের সঙ্গে করমর্দন করে সাহায্য চাইলেন। আন্তরিক কণ্ঠে ইজিপ্টোলজিস্ট জানালেন, তিনি কিছু করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবেন। তবে যা-ই তিনি জানান, সেটা মি. ট্রেলনির দেয়ার শর্তের মধ্যে থেকে করবেন। কথাটা শুনে দমে গেলাম একটু।

ডাক্তার অবশ্য নির্বিকার। বললেন, 'শর্তের মধ্যেই করতে পারবেন। আমি আপনার কাছে দুটো হায়ারোগ্লিফের অনুবাদ চাই। অসুবিধে আছে?'

'মনে হয় না,' বললেন মি. করবেক। 'কোথায় ওগুলো?'

'আনছি।' বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার, ফিরে এলেন একটু পর। হাতে সন্ধ্যায় আনা নতুন বেড়ালের মমিটা। ওটা করবেকের হাতে তুলে দিলেন তিনি।

মমির গায়ে লেখা কথাগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন ইজিপ্টোলজিস্ট। তারপর বললেন, 'খুব সাধারণ জিনিস। এখানে একটা আবেদন লেখা আছে। বাস্ট, মানে লেডি অভ বুবাসটিসের

কাছে মৃত্যুর পরে, এলিসিয়ান মাঠে নিয়মিত দুধ আর রুটির জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। ভিতরে আরও কিছু লেখা থাকতে পারে, আপনি যদি মমির আবরণটা খোলেন, তা হলে ওটাও পড়ে দিতে পারি। তবে ওখানেও বিশেষ কিছু পাবেন বলে মনে হয় না। চেহারাসুরত দেখে মনে হচ্ছে, এটা মিশরীয় সভ্যতার শেষযুগের জিনিস। সে-আমলে মমি বানানো অনেক সস্তা হয়ে গিয়েছিল। বেড়ালটা গুরুত্বপূর্ণ কারও পোষা জীব ছিল বলে মনে হয় না।'

'হুম, তা হলে আর খুলে লাভ নেই।'

'দ্বিতীয় লেখাটা কোথায়?'

'মি. ট্রেলনির ঘরে,' বললেন ডাক্তার। 'ওঁর মমি-বেড়ালটার গায়ে।'

মি. করবেকের চোয়াল ঝুলে পড়ল। 'না!' বললেন তিনি। 'তা আমি করতে পারব না। ও-ঘরের গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি এক অর্থে দায়বদ্ধ।'

একসঙ্গে ভুরু কুঁচকে ফেললাম আমি আর ডাক্তার। উইনচেস্টার থমথমে গলায় বললেন, 'দায়বদ্ধ! কী বলতে চান আপনি?'

'আমাকে ভুল বুঝবেন না,' শান্ত গলায় বললেন করবেক। 'আমার দায়টা লিখিত কোনও দলিলে নেই, ওটা সম্পূর্ণই আত্মমর্যাদার ব্যাপার। আমাকে বিশ্বাস করতেন মি. ট্রেলনি, এখন আপনাদেরকে ওঁর ঘরের জিনিসপত্রের পিছনের কাহিনি বলে দিয়ে সেই বিশ্বাসের অমর্যাদা করতে পারব না। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে রুমটার প্রত্যেকটা জিনিস রেখেছেন তিনি; সেই উদ্দেশ্যটাতে ব্যাঘাত ঘটানো ঠিক হবে না। মি. ট্রেলনি অত্যন্ত জ্ঞানী একজন মানুষ, বছরের পর পর তিনি একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য সাধনা করে যাচ্ছেন। এর জন্য শ্রম, অর্থ, ব্যক্তিগত সময়... কোনও কিছুই ব্যয়ে দ্বিধা করেননি। শুধু এটুকু বলতে

পারি, সাধনাটা সফল হলে আজকের যুগের সেরা গবেষকদের একজন হিসেবে স্বীকৃতি পাবেন তিনি নিঃসন্দেহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় একটাই—শেষ মুহূর্তে এসে এভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন... সাফল্যের এত কাছে এসে!'

আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন করবেক। আমি সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পেলাম না। ডা. উইনচেস্টারও চুপ করে আছেন। নিজেকে সামলে ইজিপ্টোলজিস্ট আবার বলতে শুরু করলেন, 'আবার বোধহয় বিভ্রান্ত করছি আপনাদের। দয়া করে ভুল বুঝবেন না, মি. ট্রেলনি আমাকে বিশ্বাস করেন ঠিকই, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, নিজের সমস্ত গোপন কথা খুলে বলেন আমাকে। সত্যি বলতে কী, ওঁর পরিকল্পনা, বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। মিশরীয় সভ্যতার কোন্ সময়টা নিয়ে গবেষণা করছিলেন তিনি, তা জানি; বিশেষ কোন্ মানুষটিকে নিয়ে তিনি কৌতূহলী ছিলেন, তা-ও বলতে পারব। তবে তার চেয়ে বেশি কিছু আমার জানা নেই। শেষ পর্যন্ত কী করতে চাইছিলেন, তা বড়জোর আন্দাজ করতে পারি; তবে অনুমানের ভিত্তিতে কিছু বলা ঠিক হবে না। তা ছাড়া, আমাকে গোপনীয়তা বজায় রাখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন মি. ট্রেলনি, সেটাও মাথায় রাখতে হবে।'

দৃঢ়তার সঙ্গে কথা বলছেন করবেক, চেহারায় প্রত্যয়ের ছাপ ফুটে আছে। কথা শেষ হয়নি ভদ্রলোকের, তাই চুপ থাকলাম আমরা।

তিনি বলে চললেন, 'অনেক কিছু বলে ফেলেছি, আর কিছু বলতে চাই না। আমি জানি, আমার কথায় আপনারা যদি সামান্যতম কোনও আভাসও পেয়ে যান, তা হলে মি. ট্রেলনির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। তবে আমি বুঝতে পারছি, আপনারা দুজনেই তাঁর মঙ্গল চান—সৎ এবং নিঃস্বার্থভাবে। মি. ট্রেলনির যে অবস্থা হয়েছে, তা সম্ভবত তাঁর কাজেরই কারণে—আমার সেরকমই

ধারণা। হা ঈশ্বর! বড্ড অসময়ে ঘটল ব্যাপারটা! ইংল্যাণ্ডে ফিরেছি আমি অনেক আনন্দ নিয়ে—মি. ট্রেলনির দেয়া দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পেরে। গবেষণাটা সম্পূর্ণ করতে শেষ যে-জিনিসগুলো দরকার, সেগুলো সংগ্রহ করতে পেরেছি আমি; আভাসে-ইঙ্গিতে যে-এক্সপেরিমেণ্টের কথা আমাকে বলেছিলেন তিনি, সেটা এবার শুরু করা যেত। কিন্তু এখন... ডা. উইনচেস্টার, আপনি তো একজন ঝানু চিকিৎসক, কোনোভাবেই কি মি. ট্রেলনিকে জাগিয়ে তোলা যায় না?'

'সাধারণ কোনও পদ্ধতির কথা আমার জানা নেই,' বললেন ডাক্তার। 'অন্য কোনও ব্যতিক্রমী চিকিৎসায় হয়তো সেটা করা সম্ভব। তবে তার জন্য বিশাল একটা ঘাটতি রয়েছে আমার।'

'কীসের কথা বলছেন?' জানতে চাইলেন করবেক।

'জ্ঞানের। প্রাচীন মিশর সম্পর্কে কিছুই জানি না আমি। ওদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, ইতিহাস, চিকিৎসাশাস্ত্র, জাদুবিদ্যা... এসবের বিষয়ে আমি একেবারেই অজ্ঞ। মি. ট্রেলনির রোগ, বা অবস্থা... যা-ই বলি না কেন, ওটার সঙ্গে যে প্রাচীন মিশরের সম্পর্ক আছে, এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। এতদিন স্রেফ সন্দেহ করছিলাম, আজ আপনার কথা শুনে সন্দেহটা সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। আপনি তো জানেন না, গত কয়েকদিনে কী ঘটেছে এ-বাড়িতে। একের পর এক রহস্যময় কাণ্ড, হামলা... ওগুলো এখন শোনাতে চাই আপনাকে... যদি ওগুলো বাইরে কোথাও প্রকাশ না করার ব্যাপারে কথা দেন; তা হলেই বুঝতে পারবেন সব। এরপর নিজেই সিদ্ধান্ত নিন, মুখ বন্ধ রাখবেন, নাকি দু-একটা জরুরি বিষয় আমাদের বলে মি. ট্রেলনিকে সুস্থ করে তোলার কাজে সাহায্য করবেন।'

'আমার উপর আপনার আস্থা আছে দেখে খুশি হলাম, সার,' বললেন করবেক। 'কথা দিচ্ছি, এ-বাড়ির একটা কথাও বাইরের

কেউ জানতে পারবে না। আর মুখ খোলার ব্যাপারে... যদি দেখি সেটা মি. ট্রেলনির মঙ্গলের স্বার্থে, তাঁর কাজের ক্ষতি না করে করা সম্ভব, তা হলে অবশ্যই বলব আমি!'

আমার দিকে তাকালেন ডাক্তার। 'মি. রস, বলবেন নাকি ঘটনাগুলো? আমার চেয়ে আপনি গল্প বলায় বেশি দক্ষ, সেটা লক্ষ করেছি ইতোমধ্যে। নিজের অভিজ্ঞতায় যা দেখেছেন-শুনেছেন, তা-ই বলুন। কোথাও কিছু যোগ করতে হলে আমি বলে দেব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বলতে শুরু করলাম আমি—সেদিন রাতে জারমাইন স্ট্রিটে আমার বাড়ির দরজায় টোকা পড়া থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সব। বললাম না শুধু মার্গারেটের প্রতি আমার অনুভূতি, আর সার্জেন্ট ড-র সঙ্গে আলোচনার কথা; ওগুলো গোপন রইল।

রুদ্ধশ্বাসে সব শুনলেন মি. করবেক। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়লেন উত্তেজনায়, পায়চারি করলেন... তারপর আবার নিজেকে সামলে বসে পড়লেন আমার সামনে। কয়েকবার কী যেন বলতে চাইলেন, আবার নিয়ন্ত্রণ করলেন নিজেকে, মুখ বন্ধ করে রাখলেন। শেষ পর্যন্ত আমার কাহিনি যখন শেষ হলো, তখন তাঁর ভিতর আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে।

গমগমে গলায় তিনি বললেন, 'আমার দ্বিধা দূর হয়ে গেছে, মিস্টার রস। আপনার বর্ণনা শুনে বুঝতে পারছি, এ-বাড়িতে ভয়ঙ্কর একটা শক্তি অশুভ-জাল বিছিয়েছে, এখুনি তার বিহিত করা দরকার। কিছু না জেনে যার-যার মত চেষ্টা করে আমরা শুধু পরস্পরের কাজে বাধাই সৃষ্টি করব, ইতিবাচক কোনও ফল পাব না। তার চেয়ে আসুন একসঙ্গে হাত মেলাই।'

'আমরাও সেটাই চাই,' বললেন ডা. উইনচেস্টার।

'শুনে খুশি হলাম। আমাদের প্রথম কাজই হবে মি. ট্রেলনিকে ওই অস্বাভাবিক ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা। কাজটা একেবারে

অসম্ভব নয়, বিশেষ করে নার্স কেনেডি যখন সুস্থ হয়ে উঠেছে, মি. ট্রেলনিও সুস্থ হতে পারবেন। অবশ্য নার্সের চেয়ে অনেক বেশি সময় ধরে ওই রুমে আছেন তিনি, অচেনা শক্তিটার প্রভাব ওঁর উপর বেশি হতে পারে, তারপরও আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে। আজ তো রাত হয়ে গেছে, আগামীকাল থেকে মাঠে নামব আমরা। ডাক্তার সাহেব, আপনি আপাতত চলে যেতে পারেন। ভালমত ঘুমিয়ে শরীরটাকে বিশ্রাম দিন, সকালে চলে আসবেন এখানে।' আমার দিকে ফিরলেন করবেক। 'আজ রাতে তো আপনার পাহারা দেবার কথা মি. ট্রেলনির রুমে, তাই না? আমি আপনাকে একটা বই দেব... যদি পাই আর কী! মি. ট্রেলনির লাইব্রেরিতে গতবার দেখেছিলাম বইটা। ওটা রাতের ভিতর পড়ে ফেলবেন, তা হলে চিকিৎসার জন্য ডাক্তার সাহেবকে প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য দিতে পারবেন আপনি। পুরো বই অবশ্য পড়তে হবে না, দরকারি অংশটা ছোট্ট... আমি চিহ্ন দিয়ে দেব... তবে পুরোটা পড়ে ফেলতে পারলে ভাল হয়। আর হ্যাঁ, আমাদের কাজের বিস্তৃতি বাড়বে... দায়িত্ব ভাগ করে দেব আমি যথাসময়ে, যে-যার অংশটা ঠিকঠাকমত পালন করবেন; তা হলেই আশা করি সমস্যাটা সমাধান করে ফেলতে পারব।'

আর কিছু ব্যাখ্যা করলেন না ইজিপ্টোলজিস্ট। হাবভাবে বুঝলাম, জিজ্ঞেস করে লাভও নেই। ডা. উইনচেস্টার উঠে দাঁড়ালেন, হাত মেলালেন করবেকের সঙ্গে, তারপর বিদায় নিলেন। পিছু পিছু করবেকও বেরিয়ে গেলেন—বই আনতে যাচ্ছেন। রুমে একাকী বসে রইলাম আমি। এলোমেলো চিন্তায় ডুবে গেলাম।

একটু পরেই ফিরে এলেন করবেক, হাতে একটা পুরনো বই। আমার সামনে বসেই দ্রুত কয়েকটা কাগজ গুঁজে দিলেন বিভিন্ন পাতায়—ওই অংশগুলো পড়তে হবে আমাকে। কাজশেষে বইটা

বাড়িয়ে ধরলেন আমার দিকে।

'এই নিন,' রহস্যময় কণ্ঠে বললেন তিনি। 'এটা দিয়েই শুরু করেছিলেন মি. ট্রেলনি, আমার শুরুটাও এটা দিয়েই। আপনিও... নিঃসন্দেহে... এটার মাধ্যমে অদ্ভুত এক জগতে প্রবেশ করবেন, সেটার পরিণতি যা-ই হোক না কেন। তবে পরিণতি দেখার সৌভাগ্য যে হবে, এমন কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারছি না।'

আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন করবেক, দরজার কাছে গিয়ে উল্টো ঘুরলেন। বললেন, 'একটা ভুল ধারণা ভেঙে গেছে আমার। আপনার কথা শুনে ওই ডিটেকটিভ ভদ্রলোককে অন্য আলোয় দেখতে শুরু করেছি। মনে হচ্ছে লোকটা ভাল, তার জিম্মায় প্রদীপগুলো রেখে আজ রাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারব।'

চলে গেলেন ইজিপ্টোলজিস্ট। খানিক পরে উঠে দাঁড়ালাম আমিও। রেসপিরেটর আর বই নিয়ে রওনা হলাম পাহারায় যোগ দিতে।

দশ

জাদুকরের উপত্যকা

মি. ট্রেলনির পড়ার টেবিলের উপর বইটা রেখে রিডিং ল্যাম্প জ্বাললাম আমি; শেডটা এমনভাবে রাখলাম, যাতে শুধু বইয়ের উপর আলো পড়ে। চেয়ার টেনে বসার জায়গা ঠিক করলাম, এখন রোগীর বিছানা, নার্স আর ঘরের দরজা... সবই আমার

দৃষ্টিসীমার ভিতরে। পরিবেশটা পড়াশোনার জন্য পুরোপুরি আদর্শ হলো না, তবে করার কিছু নেই। আপাতত এ-অবস্থাতেই মানিয়ে নিলাম নিজেকে, উল্টাতে শুরু করলাম পাতা।

বইটা বেশ পুরনো, প্রথম পাতার লেখা বলছে—১৬৫০ সালে অ্যামস্টারডামে ছাপা হয়েছে। ভাষাটা ডাচ, কে যেন হাতে অনুবাদ করেছে পুরোটা; প্রতিটা লাইনের তলায় খুদে অক্ষরে লিখে রেখেছে ইংরেজি ভাষান্তর। অনুবাদের মান ভাল নয়, লাইনে-লাইনে এগোনোয় বাক্যগুলো ভীষণ খটমটে, আগে-পিছে পড়ে ভাবার্থ বুঝে নিতে হয়। প্রথমে খুব কষ্ট হলো, তবে কিছুদূর এগোতেই অভ্যস্ত হয়ে গেলাম এই অদ্ভুত ভাষা আর ব্যাকরণে, এরপর এগোতে পারলাম তর তর করে।

শুরুতে একটু শঙ্কা অনুভব করছিলাম, মার্গারেট হঠাৎ এসে আমাকে বইটা পড়ে ফেলতে দেখে কি না! ডা. উইনচেস্টার চলে যাবার আগে আমরা আলোচনা করে ঠিক করেছি, ওকে এই নতুন অনুসন্ধানের ব্যাপারে কিছু জানাব না। আচার-আচরণে দৃঢ়তা থাকলেও মনটা ওর খুব নরম, অতিপ্রাকৃত শক্তির কথা শুনে ভয় পেয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া আমাদের তদন্ত থেকে ও দূরে থাকলেও ভাল হয়; ওর বাবার নির্দেশের বিরুদ্ধে আমরা যদি কিছু করতে বাধ্য হই, তাতে বাধা দিতে পারবে না।

রাত দুটো বাজার পরও মার্গারেট যখন এল না, তখন নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে, জেগে থাকলে এর ভিতর একবার আসতই। আরও প্রায় তিন ঘণ্টা সময় আছে আমার হাতে, বইয়ের পাতায় ফিরে যাবার আগে নজর বোলালাম রুমের ভিতর। নিয়মিত তালে বিছানায় শ্বাস ফেলছেন মি. ট্রেলনি, নার্স কেনেডি চেয়ার নিয়ে বসে আছে পাশে—সুস্থ হয়ে আবার পাহারায় ফিরে এসেছে সে। হাবভাব সতর্ক, স্নায়ু টানটান করে রেখেছে। ল্যাণ্ডিঙের ঘড়িতে দুটো বাজার সঙ্কেত শুনলাম, ওটার

সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেজে উঠল বাড়ির বাকি ঘড়িগুলোও। আবছাভাবে শুনতে পেলাম সমন্বিত ধ্বনির রেশ। দূর থেকে রাতের নগরীর হালকা শব্দও শোনা যাচ্ছে... ভেসে আসছে বাতাসে ভর করে। এতকিছুর পরও কেন যেন নৈঃশব্দ্যের রাজত্ব কাটছে না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে চোখ ফেরালাম বইয়ের দিকে। এতক্ষণ অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ছিলাম, রিডিং ল্যাম্পের আলোয় সবকিছু তাই সাদা দেখাল প্রথমে। একটু পরেই অবশ্য মানিয়ে নিলাম চোখকে, পড়তে থাকলাম বইটা।

জনৈক নিকোলাস ভ্যান হাইন অভ হুরন্ লিখেছেন বইটা। ভূমিকায় ব্যাখ্যা করেছেন, কীভাবে তিনি মার্টন কলেজের পিরামিডোগ্রাফিয়া বিভাগের সদস্য জন গ্রিভসের গবেষণার প্রতি আকৃষ্ট হন। লেখক পরে মিশরে গিয়েছিলেন বেড়াতে, কিন্তু ওখানকার আশ্চর্য সব পুরাকীর্তি দেখে এতই বিমোহিত হয়ে পড়েন যে, কয়েক বছর কাটিয়ে দেন দেশটাতে। মিশরের অসংখ্য পিরামিড, মন্দির আর সমাধি পরিদর্শন করেন তিনি; পিরামিড সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে আরব ইতিহাসবেত্তা *ইবনে আবদ্ আলোকীন*-এর তত্ত্বের নানা রকম ব্যাখ্যা শুনতে পান। এর মধ্যে কিছু ব্যাখ্যা তুলে দেয়া হয়েছে বইটাতে। ওগুলো এড়িয়ে গিয়ে মি. করবেকের চিহ্ন দেয়া অংশগুলোতে চলে গেলাম।

পড়তে শুরু করতেই অশুভ একটা প্রভাব অনুভব করলাম নিজের উপর। কয়েকবার নার্স কেনেডির দিকে তাকালাম, নিশ্চিত হয়ে নিতে চাইলাম তার অবস্থান; কারণ কেন যেন মনে হচ্ছিল কেউ আমার খুব কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছে। তবে প্রতিবারই নার্সকে তার নিজের জায়গায় দেখলাম, তাই অস্বস্তিটা চাপা দিয়ে পড়তে থাকলাম বইটা।

বর্ণনা এগিয়ে চলল, আসওয়ানের পূর্বদিকের পাহাড়শ্রেণীর মাঝ দিয়ে বেশ কয়েকদিন চলার পর লেখক কীভাবে একটি

বিশেষ জায়গায় পৌঁছুলেন—শুরু হলো সেই কাহিনি। নিজের ভাষায় লিখেছেন ভদ্রলোক, পাঠকদের সুবিধার্থে সহজ করে সেটা তুলে দিচ্ছি নীচে, লেখকের নিজের ভাষায়।

'...সন্ধ্যার দিকে সংকীর্ণ ও গভীর এক উপত্যকার প্রবেশপথে পৌঁছুলাম আমরা, ওটা পূর্ব থেকে পশ্চিমদিকে বিস্তৃত। অস্তায়মান সূর্যের আলোয় উপত্যকার অন্যপাশে বের হবার পথটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল, তাই আমি চাইলাম তখুনি জায়গাটা পেরিয়ে যেতে। কিন্তু আমার সঙ্গী স্থানীয় কুলিরা কিছুতেই রাজি হলো না। একটাই কথা তাদের—সময় বেশি নেই, রাত নামার আগে উপত্যকা থেকে বেরুতে না পারলে বিপদ হবে। আগে কখনও ওদেরকে এমন আচরণ করতে দেখিনি, যখন-যেখানে যেতে চেয়েছি, নির্দ্বিধায় গেছে। আজ এমন করছে কেন, বুঝতে পারলাম না। শুরুতে ওদের ভয়ের কারণটাও খুলে বলল না আমাকে। চাপাচাপি করে শেষ পর্যন্ত শুধু এটুকু জানতে পারলাম, ওটা জাদুকরের উপত্যকা; ওখানে রাতের বেলা যাবার ব্যাপারে নিষেধ আছে। জাদুকর সম্পর্কে জানতে চাইলাম, কিন্তু মুখে যেন কুলুপ এঁটে বসে রইল কুলিরা। বলল, জাদুকরের কোনও নাম নেই, তার ব্যাপারে কেউ কিছু জানে না। বিশ্বাস হলো না কথাটা।

'পরদিন সকালে সূর্য উঠতেই সবার ভয় কেটে গেল, স্বাভাবিক আচরণ করতে শুরু করল কুলিরা। সুযোগ বুঝে আবার জানতে চাইলাম উপত্যকা সম্পর্কে। জবাবে কুলি সর্দার বলল, হাজার হাজার বছর আগেকার এক জাদুকরকে কবর দেয়া হয়েছে ওই উপত্যকায়। মানুষটা এক রাজা কিংবা রানী ছিল... ঠিক কোন্‌টা তা জানে না ওরা। নামটাও বলতে পারল না, ওদের ধারণা—জাদুকরের নাম মুখে নিলে বিরাট অমঙ্গল হবে,

ইহকাল-পরকাল... সবই খোয়াতে হবে ওই অশুভ নাম উচ্চারণ করলে।

'উপত্যকায় নেমে এলাম আমরা, কুলিরা সবাই জটলা করে আমার সামনে এগোতে থাকল। কেউ পিছে থাকতে চাইছে না। আমাকে বলল, ওই মৃত-জাদুকরের হাত নাকি অনেক লম্বা; কেউ পিছে পড়লে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। বাধ্য হয়ে আমাকেই তাই থাকতে হলো সবার শেষে।

'উপত্যকার সবচেয়ে সরু অংশটার দক্ষিণে পাহাড়ের একটা খাড়া পাথুরে পাঁচিল আছে। শরীর একেবারে মসৃণ ও সমতল ওটার—মুখ করে আছে ঠিক উত্তরদিকে। ওখানে পৌঁছুতেই পাঁচিলটার গায়ে খোদাই করা নানা রকম ছবি আর প্রতীক দেখতে পেলাম। মানুষ, পশু-পাখি, মাছ, সরীসৃপ, সূর্য-তারা থেকে শুরু করে অস্পষ্ট-অচেনা অসংখ্য সব জিনিস। কিছু কিছু জায়গায় মানব-শরীরের বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরও ছবি চোখে পড়ল—হাত, পা, আঙুল, চোখ, নাক, কান, ঠোঁট... এসব আর কী। অদ্ভুত... রহস্যময় সব ছবি—আগামাথা কিছুই বুঝতে পারলাম না। ওগুলোর প্রতি ভীষণ কৌতূহল জাগল, কুলিদের থামতে বলে দিনের বাকি অংশটা ওখানেই কাটালাম; টেলিস্কোপ দিয়ে ছবিগুলো যদ্দূর সম্ভব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলাম। আমার মিশরীয় সঙ্গীরা ভয়ে-আতঙ্কে আধমরা হয়ে গেল, উপত্যকা ছেড়ে চলে যাবার জন্য আমাকে নানাভাবে পীড়পীড়ি করতে থাকল। কিন্তু আমি ওদের কথায় কান দিলাম না। বিকেল পর্যন্ত ওখানে থাকলাম আমরা, এর ভিতর তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনও কিছু আবিষ্কার করতে পারলাম না। ছবিগুলো দেখে মনে হচ্ছিল, ওখানে জাদুকরের সমাধিটা থাকতে পারে, তবে সেটার মুখ খুঁজে পেলাম না কিছুতেই। ততক্ষণে কুলিরা বিদ্রোহ করবার মত অবস্থায় পৌঁছে গেছে; আমাকে ফেলেই না

চলে যায়, সে-ভয়ে উপত্যকা থেকে বেরোতে রাজি হয়ে গেলাম, নইলে ওই কঠিন পরিবেশে সম্পূর্ণ একা হয়ে যাব। ওখান থেকে চলে এলাম ঠিকই, কিন্তু মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম—সুযোগ বুঝে পরে আবার যাব ওখানে, সমাধিটা খুঁজে বের করব।

'উপত্যকা ছেড়ে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে আরও দিনকয়েক চলার পর দেখা পেলাম এক বেদুঈন আরব শেখের। তাকে সব কথা খুলে বলতেই আমাকে সাহায্য করতে রাজি হলো। লক্ষ করলাম, আরবরা মিশরীয়দের মত কুসংস্কারে বিশ্বাস করে না। কুলিদের বিদায় করে দিলাম, তারপর বেদুঈনদের নিয়ে ফিরে গেলাম জাদুকরের উপত্যকায়।

'খাড়া পাহাড়টায় চড়ার চেষ্টা করলাম আমি, তবে সফল হলাম না। পাঁচিলটা এমনিতেই মসৃণ, তার ওপর হাতুড়ি আর ছেনি দিয়ে কোন্‌কালে যেন একেবারে সমান করে দেয়া হয়েছে। তবে এক সময়ে ওটার গায়ে পাথরের সিঁড়ি ছিল, এমন চিহ্ন দেখতে পেলাম... বুঝতে পারলাম, উপরে কিছু একটা আছে। এমনিতে পাঁচিলটা বেয়ে ওঠা সম্ভব নয়, সঙ্গে মই-ও ছিল না, তাই বিকল্প বুদ্ধি বের করলাম। কয়েকজন বেদুঈনকে নিয়ে ঘুরপথে গিয়ে উঠলাম পাহাড়টার চূড়ায়, সেখান থেকে দড়িতে বেঁধে ওরা আমাকে নীচে নামিয়ে দিল।

'ছবিগুলো পরীক্ষা করতে গিয়ে পেয়ে গেলাম সমাধিতে ঢোকার প্রবেশপথটা—একটা বড় পাথর দিয়ে ঢাকা ছিল ওটা, চারপাশটা ছবি খোদাই করে এমনভাবে ঢেকে দেয়া হয়েছে, যাতে ওটার অস্তিত্ব বোঝা না যায়। জায়গাটা উপত্যকার মেঝে থেকে প্রায় একশো ফুট উপরে, পাহাড়ের দুই-তৃতীয়াংশ উচ্চতায়। মোটামুটি এক-মানুষ উচ্চতার ফোকর ওটা, কিছুদূর গেলেই পাথরের তৈরি একটা দরজা পড়ে। নিখুঁতভাবে বন্ধ ছিল ওটা, সামান্যতম ফাঁক-ফোকর ছিল না। হাতল-টাতল চোখে

পড়ল না, তাই কাঁধ ঠেকিয়ে ঠেলা দিতে শুরু করলাম। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর আমি যখন ঘেমে-নেয়ে উঠেছি, তখনই বিকট শব্দ করে ভিতরদিকে পড়ে গেল পাথরের দরজাটা। ওটা টপকে ভিতরে ঢুকলাম; একটা শেকলের কয়েল চোখে পড়ল, ওটার সাহায্যে টেনে দরজাটা বন্ধ করতে হয়।

'সমাধিটা অবিকৃত অবস্থায় পেলাম, ভিতরের সাজ খুবই উন্নত মানের। কয়েকটা চেম্বার আর করিডর আছে, সবগুলো গিয়ে মিলেছে মমি-পিট, মানে মমি রাখার গর্তে। প্রচুর চিত্রলিপি রয়েছে ভিতরে, মনে হলো ইতিহাস সংরক্ষণ করা হয়েছে ওগুলোর মাধ্যমে, তবে ওগুলো বোঝার সাধ্য নেই আমার। উৎফুল্ল মনে শুধু ঘুরে ঘুরে দেখলাম পাথরের গায়ে আঁকা অদ্ভুত প্রতীকগুলো।

'প্রত্যেকটা চেম্বার আর করিডরের দেয়ালে একই রকম লিপি চোখে পড়ল আমার। মমি-পিটে রাখা সারকোফাগাসটার শরীরও ভর্তি ওই অদ্ভুত চিহ্নগুলো দিয়ে। আরব শেখ আর তার দুই সঙ্গী খানিক পরে এসে যোগ দিল আমার সঙ্গে, সবাই মিলে ধরাধরি করে খুলে ফেললাম ডালাটা। কাজটাতে ওদেরকে খুব দক্ষ মনে হলো, দেখলাম সারকোফাগাসটা দেখে ওরা আফসোসও করছে—এমন সুন্দর জিনিসটা নিয়ে যেতে পারলে অনেক দাম পাওয়া যেত। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ভারী কফিনটা নিয়ে যাবার মত কোনও ব্যবস্থা নেই সঙ্গে। শুধুমাত্র ছোটখাট জিনিসই নেয়া সম্ভব আমাদের পক্ষে।

'যা-ই হোক, সারকোফাগাসের ভিতর একটা দেহ পেলাম আমরা, দেখে নারীর মনে হলো... আর সব মমির মত বেশ কয়েক পরত লিনেনে মোড়ানো। কাপড়ে করা এমব্রয়ডারি দেখে বুঝলাম, মেয়েটি বেশ উঁচু পদের কেউ ছিল। বুকের কাছে একটা হাত ভাঁজ করে রাখা আছে মমিটার—ওটায় কোনও

আবরণ নেই। বিসদৃশ ব্যাপার, আগে কখনও কোনও মমির হাত এভাবে উন্মুক্ত থাকতে দেখিনি। আরও বিস্ময় জাগাল হাতটার চেহারা। একেবারে অবিকৃত রয়েছে ওটা এত বছর পরেও—মমি তৈরির উৎকৃষ্টতম প্রক্রিয়ার নমুনা! দুধসাদা রঙ চামড়াটার, একটুও টোল খায়নি কোথাও; নখগুলো বড় বড়, রঙিন। চোখে ধাঁধা লাগে, দেহটাকে একেবারে নতুন মনে হয়।

'হাতটা ধরে নেড়েচেড়ে দেখলাম, বেশ সাবলীলভাবে নড়ানো যাচ্ছে... ঠিক জ্যান্ত মানুষের হাতের মত! সামান্য যেটুকু আড়ষ্টতা আছে, তা দীর্ঘদিন একভাবে পড়ে থাকার জন্য। অবাক হলাম, হাজার বছরের পুরনো লাশের কোনও অঙ্গই এভাবে নড়ানো যাবার কথা না। বিস্ময়ের আরও বাকি ছিল, ভাল করে তাকাতেই হাতটাতে পাঁচটার জায়গায় সাতটা আঙুল দেখতে পেলাম। তবে আঙুলগুলো চোখে বাজে না একটুও, প্রতিটাই একই রকম নিখুঁত ও সুন্দর। স্বীকার করতে দোষ নেই, অজানা ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠল আমার; হাতটার স্পর্শ হাজার বছরের পুরনো লাশের মত লাগেনি, লেগেছে জীবন্ত একটি মানুষের স্পর্শের মত।

'যা হোক, ভাঁজ করা হাতটার মুঠোর তলায় একটা বিরাট রুবি পাথর পেলাম আমরা। মমিটা যেন ওটাকেই নিজের হাত দিয়ে রক্ষা করছিল। রুবি পাথর কখনও এত বড় হতে দেখিনি, তা ছাড়া ওটার রঙটাও অদ্ভুত সুন্দর—ঘন... রক্তের মত লাল। বুঝতে অসুবিধে হলো না, অমূল্য এক রত্ন ওটা; তবে অস্বাভাবিক আকৃতি, বা রঙের জন্য নয়; ওটার দুষ্প্রাপ্যতার জন্য। আলো পড়লেই ওটা থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছিল আকাশের সপ্তর্ষি... মানে সাতটা তারার দ্যুতি, সাতটা আলাদা রশ্মি হয়ে। ছোট ছোট সাতটা বিন্দু আছে পাথরটার ভিতরে... দেখে মনে হচ্ছিল, ওগুলো যেন বন্দি হয়ে থাকা সাতটি তারা! মমির হাতটা

সরাতেই অপার্থিব দৃশ্যটা দেখে আমি কিছুক্ষণের জন্য স্থবির হয়ে গেলাম। সংবিৎ ফিরতেই বুঝতে পারলাম, ওখানে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না। আরবদের চোখে ইতোমধ্যে লোভের দৃষ্টি ফুটে উঠেছে, কখন কী করে বসে, কোনও ঠিক নেই। ওদেরকে দেখতে না-দিয়ে পাথরটা তাড়াতাড়ি ঢুকিয়ে ফেললাম পকেটে, টুকটাক অন্যান্য পুরাকীর্তির সঙ্গে... শঙ্কিতভাবে! সম্পূর্ণ বিরান এক পরিবেশে আমি তখন একা, দাঁড়িয়ে আছি মাটি থেকে একশো ফুট উঁচুতে এক গোপন গুহায়... এখানে আমাকে খুন করে ফেলে রাখলেও কেউ কোনোদিন জানতে পারবে না। বেরিয়ে যেতে চাইলাম, কিন্তু আরবরা চলে যাবার জন্য খুব একটা উতলা হলো না, ফলে আমাকে আরও কিছুক্ষণ থাকতে হলো সমাধিটাতে।

'নানা রকম আরও জিনিস দেখতে পেলাম বাড়তি সময়টাতে। অচেনা এক পাথরে তৈরি অন্য একটা শবাধার দেখলাম, সেটার ভিতরে আরও রত্ন থাকতে পারে বলে সন্দেহ হলো, যদিও শেষ পর্যন্ত কিছুই পাওয়া গেল না। এ ছাড়া ছোট্ট একটা সিন্দুক দেখলাম, যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ওটা পাথরে গড়া, ডালাটা এমনভাবে বন্ধ করা ছিল, যাতে ভিতরে কোনও বাতাস না ঢোকে। জিনিসটা দেখে অস্থির হয়ে উঠল আরবরা। ওদের মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মাল, ওটার ভিতর নিশ্চয়ই মণিমুক্তো আছে, নইলে ডালাটা এভাবে বন্ধ করে রাখা হবে কেন? অনুমতির তোয়াক্কা করল না ওরা, ঝটপট সীল ভেঙে ডালাটা খুলে ফেলল। সেই সঙ্গে হতাশও হলো। ভিতরে দামি কিছু ছিল না, ছিল স্রেফ চারটা নকশাকাটা জার, তাতে চার রকম মাথা আঁকা। একটা হলো মানুষের... একজন পুরুষের; দ্বিতীয়টা কুকুরের, তৃতীয়টা শেয়ালের; আর শেষটা হলো বাজপাখির। ভিতরে সত্যি সত্যি কাটা মুণ্ডু রাখা আছে কি না,

কেটে নিয়েছিল মমি-পিট থেকে আমি আর শেখ বেরিয়ে আসার পর। বেদুঈন লোকটাকে আরও বলতে শুনলাম, হাতটা সে সুতো দিয়ে বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে রাখবে, তাতে মমির আত্মাটা নাকি তার বশ হবে। কথাটা কেউ উড়িয়ে দিল না, কারণ হাতটা যে আর দশটা মমির হাতের মত নয়, তা সবাই বুঝতে পারছে। আমি নিজেও বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম, কবজির উপরে কাটা জায়গাটা টকটকে লাল হয়ে আছে... যেন একটু আগেই জ্যান্ত কারও শরীর থেকে কেটে আনা হয়েছে ওটা।

'সে-রাতটা তীব্র আতঙ্কে কাটল আমার। সামান্য একটা মমির হাত যদি অশিক্ষিত বেদুঈনদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ হয়, তা হলে হাতের তলায় পাওয়া রত্নটাকে না-জানি কী ভাববে! যদিও শুধু বেদুঈনদের সর্দার ওই শেখ ছাড়া আর কেউ জানে না রত্নটার কথা, কিন্তু গোমর ফাঁস হতে আর কতক্ষণ! লোকটা নিজেও লোভী হয়ে উঠতে পারে যে-কোনও মুহূর্তে। সারারাত তাই জেগে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি, নিজেই নিজেকে পাহারা দেব। ঠিক করলাম, সকাল হলেই যত দ্রুত সম্ভব এই দলটাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে আমাকে। নীল নদের তীরে গিয়ে নতুন কোনও গাইড খুঁজে নেব। আমার সঙ্গে থাকা অমূল্য রত্নটার কথা জানাব না কাউকে, চলে যাব আলেকজান্দ্রিয়ায়... সেখান থেকে জাহাজে চেপে দেশে ফিরব।

'জেগে থাকার প্রচণ্ড ইচ্ছে সত্ত্বেও রাত গভীর হতেই ঘুম ভর করল চোখে, কিছুতেই চোখের পাতা খোলা রাখতে পারলাম না। সবার অলক্ষে রত্নটা পকেট থেকে বের করে আনলাম আমি, মুঠোর মধ্যে ওটা লুকিয়ে শুয়ে পড়লাম। এখন আমার জামা-কাপড় তল্লাশি করে ওটা আর পাবে না কেউ; হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইলে আমার ঘুম ভাঙাতে হবে। এখানে একটা ব্যাপার বলে রাখি, পাথরটা হাতে নিতেই উত্তাপ অনুভব করেছি

আমি, মুঠোর ভিতর জ্বলজ্বল করছিল ওটা, সাতটা তারার দ্যুতি ছড়াতে শুরু করেছিল। ওটার পিছনদিকে খোদাই করা প্রতীকগুলো তখনই প্রথমবারের মত চোখে পড়ল... সমাধিতে এই একই প্রতীকগুলো দেখেছি আমি, তবে অর্থ বের করতে পারিনি। যা হোক, মুঠোটা শক্ত করে ফেললাম, যাতে দ্যুতিটা দেখতে না-পায় আমার সঙ্গীরা। তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম আগুনের পাশে।

'পরদিন যখন ঘুম ভাঙল, তখন বেলা চড়ে গেছে। সূর্যের কড়া রোদ অত্যাচার শুরু করে দিয়েছে মুখের উপর। উঠে বসে চারপাশে তাকাতেই চমকে গেলাম। ক্যাম্পের আগুন নিভে গেছে অনেকক্ষণ আগে, বেদুঈনরা সবাই অদৃশ্য... রয়ে গেছে শুধু একটা মৃতদেহ! আমার খুব কাছে পড়ে আছে মানুষটা—বেদুঈনদের সর্দার... আরব শেখ! চিত হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। মুখটা কালো হয়ে আছে, চোখদুটো খোলা... শূন্য দৃষ্টি মেলে রেখেছে আকাশের দিকে। দৃষ্টিতে আতঙ্কের ছাপ, যেন মরার আগে অবিশ্বাস্য কিছু দেখতে পেয়েছিল। গলা টিপে মারা হয়েছে শেখকে, কণ্ঠার উপর লাল হয়ে বসে গেছে আঙুলের ছাপ। দাগগুলো অস্বাভাবিক লাগল, তাই গুনে দেখলাম—মোট সাতটা। ছ'টা দাগ বসেছে সমান্তরালভাবে, বুড়ো আঙুলেরটা আলাদা। শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল—মমির হাতটাতে সাতটা আঙুল ছিল!

'রত্নটা তখনও ধরে রেখেছি হাতে, কী ভেবে যেন মুঠিটা খুললাম... পাথরটা টুপ করে খসে পড়ল; আর পড়ল গিয়ে মৃত লোকটার খোলা মুখে। অবিশ্বাসের চোখে দেখলাম, সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণ প্রস্রবণের মত রক্তের ধারা বেরিয়ে এল লাশের মুখ দিয়ে... ঘন, লাল রক্ত... তাতে হারিয়ে গেল রত্নটা। তাড়াতাড়ি চমক সামলে লাশটাকে উপুড় করলাম ওটাকে খুঁজে বের করতে,

তখনই চোখে পড়ল শেখের ডান হাতটা... শরীরের পিছনে ওটা ভাঁজ হয়ে ছিল, মুঠোয় বড় একটা ভোজালি ধরা। জিনিসটা ভীষণ ধারালো; ধরার ভঙ্গি দেখে মনে হলো, ওটা দিয়ে চুপিসারে আমাকে খুন করতে এসেছিল লোকটা, কিন্তু কাজ শেষ হবার আগেই অচেনা আততায়ীর শিকার হয়েছে। এই আততায়ী কি মানুষ, না অন্য কোনও শক্তি—তা জানি না। কৌতূহলটা নিবৃত্ত করবার কোনও চেষ্টা করলাম না, তাড়াতাড়ি রক্তের পুকুর ঘেঁটে খুঁজে বের করলাম রত্নটা—ওটা তখন দ্বিগুণ উজ্জ্বলতা নিয়ে ঝলমল করছে। জিনিসটা পেতেই পালিয়ে এলাম উপত্যকা ছেড়ে।

'মরুভূমির মাঝ দিয়ে কয়েকদিন হাঁটতে হলো আমাকে, পানির অভাবে নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হলো। মরেই যেতাম, কিন্তু হঠাৎ দেখা পেয়ে গেলাম এক আরব গোত্রের। ওরা আমাকে উদ্ধার করল, চিকিৎসা দিল। সুস্থ হয়ে আমি ফিরে এলাম বাড়িতে।

'মমির হাতটার কী হয়েছে, তা জানি না আমি। জানি না, ওটা যার কাছে ছিল, তার ভাগ্যে-ই বা কী ঘটেছে। শুধু এটুকু অনুমান করতে পারি, সে-রাতে আমি যখন ঘুমিয়ে ছিলাম, তখন ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটে গেছে ক্যাম্পে; নইলে বেদুঈনরা ওভাবে পালিয়ে যেত না। হাতটা ওরা সঙ্গে নিয়ে গেছে কি না, কে জানে! হয়তো ওটা এখন কারও গলায় মাদুলি হয়ে ঝুলছে।

'যা হোক, দেশে ফিরে প্রথম সুযোগেই রুবি-পাথরটা পরীক্ষা করে দেখলাম আমি; জানার চেষ্টার করলাম, ওটার গায়ে খোদাই করা প্রতীকগুলোর কী অর্থ হতে পারে। সফল হলাম না। প্রতীকগুলো ছিল এরকম...'

থেমে গিয়ে চোখ তুললাম বই থেকে, বুক ঢিব ঢিব করছে।

পড়বার সময় কেন যেন কয়েকবারই মনে হয়েছে, বইটার উপর মনুষ্য-হাত আকৃতির একটা ছায়া দেখতে পাচ্ছি। প্রথমে ভেবেছিলাম, ওটা চোখের ভুল—রিডিং ল্যাম্পের শেডের কারসাজি। কিন্তু এখন আর তা মনে হচ্ছে না। দুরুদুরু বুকে নজর বোলালাম ক্রিস্টালের ডিসপ্লে-টার দিকে, জানালা গলে আসা চাঁদের আলোয় আবছাভাবে আলোকিত হয়ে আছে ওটা; ভিতরে শুয়ে থাকা মমির হাতটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না, ওটার কথাই বইয়ে লিখে গেছেন নিকোলাস ভ্যান হাইন। বিছানার দিকে তাকালাম, নার্স কেনেডি সজাগ আছে দেখে স্বস্তি পেলাম। এমন পরিবেশে... এমন একটা ভয়াল কাহিনি পড়ার সময় দ্বিতীয় একজন মানুষের উপস্থিতি খুবই প্রয়োজন।

পড়তে পারলাম না আর, বইয়ের পাতায় চোখ রেখে মূর্তির মত বসে রইলাম। মাথার ভিতরে নানা রকম চিন্তা পাক খেতে শুরু করেছে। হঠাৎ একটা হাত দেখতে পেলাম সামনে... ফর্সা, নারীর হাত... ল্যাম্পের আলোয় শিরাগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তীব্র আতঙ্কে আঁতকে উঠলাম, চিৎকার করতে চাইলাম... পারলাম না। শরীরটা যেন আর নিজের নেই।

নিজেকে সামলে নিলাম দ্রুত, লক্ষ করেছি—হাতটাতে সাতটা আঙুল নেই, কবজির উপরেও কাটা নয় ওটা। জীবন্ত একজন মানুষের হাত ওটা, আমার অতি-চেনা একজন মানুষ! মার্গারেট ট্রেলনির হাত দেখে খুশি হওয়া উচিত আমার, আতঙ্কিত নয়। আস্তে আস্তে মুখ তুললাম। ও দাঁড়িয়ে আছে টেবিলের সামনে।

'কী হয়েছে তোমার?' জিজ্ঞেস করল মার্গারেট। 'বইটার দিকে ওভাবে তাকিয়ে আছ কেন? আমি তো ভাবলাম, অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে গেলে নাকি!'

উঠে দাঁড়িয়ে আশ্বস্ত করবার ভঙ্গিতে হাসলাম। 'খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলাম কি না! পুরনো একটা বই... লাইব্রেরি থেকে এনেছি।' সাবধানে বইটা বন্ধ করে বগলের তলায় গুঁজলাম। 'পড়া শেষ হয়েছে, এখুনি আবার রেখে আসছি এটা। তোমার বাবা নিশ্চয়ই বইপত্র এলোমেলো দেখলে খুশি হবেন না?'

অম্লানবদনে মিথ্যে বলে বেরিয়ে এলাম রুম থেকে, ওকে বইটার ব্যাপারে আগ্রহী করতে চাইছি না। লাইব্রেরিতে গেলাম না, বইটা নিজের রুমে রেখে ফিরে এলাম। নার্স কেনেডি তখন ঘুমাতে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে, মার্গারেট ওর জায়গা নেবে। এখন আর বই নিয়ে বসা সম্ভব নয়, দুজনে পাশাপাশি বসে গল্পে মেতে গেলাম। আমাদের কথাবার্তায় মি. ট্রেলনির অসুস্থতার বিষয় রইল না; রইল না মিশর, মমি, কাটা হাত, রত্ন বা সমাধি... কোনও কিছুই। নিজেদের নিয়ে আলোচনা করলাম আমরা, ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বললাম। সময় যে কীভাবে কেটে গেল, তা টেরই পেলাম না। হঠাৎ যখন জানালায় ভোরের আলো দেখলাম, তখন অবাকই লাগল। ততক্ষণে বইটার কথা প্রায় ভুলে গেছি আমি, মগ্ন হয়ে গেছি মার্গারেটের সান্নিধ্যে।

সকালে ডা. উইনচেস্টার যখন এলেন, আমি তখন ডাইনিং রুমে—ঘুমাতে যাবার আগে নাশতা সারছি। রোগীকে দেখে আমার কাছে চলে এলেন তিনি। প্রায় একই সময়ে মি. করবেকও উদয় হলেন। তিনজনে মিলে গতরাতের আলোচনার খেই ধরলাম। আমি জানালাম, বইয়ের একটা অধ্যায় পড়ে শেষ করেছি, ওটা ডা. উইনচেস্টারকেও পড়ে দেখতে অনুরোধ করলাম আমি। রাজি হলেন ভদ্রলোক, জানালেন—বিশেষ একটা কাজে ইপস্‌উইচে যেতে হচ্ছে তাঁকে একটু পরেই, বইটা দিয়ে দিলে ট্রেনে বসে পড়ে ফেলতে পারবেন। সন্ধ্যায় আবার ফিরিয়েও

দিতে পারবেন।

রুমে গিয়ে বইটা খুঁজে পেলাম না। বিছানার পাশে ছোট্ট টেবিলটার উপর রেখেছিলাম ওটা, এখন নেই। অবাক লাগল, ওটা চাকররা কেউ নেবে বলে মনে হয় না, মার্গারেটও রাতভর আমার সঙ্গেই ছিল। পুরো রুম তন্নতন্ন করে খুঁজলাম, কিন্তু কিছুতেই পেলাম না ওটা। হতোদ্যম হয়ে ফিরে গেলাম ডাইনিং-রুমে, ডাক্তারকে জানালাম ঘটনাটা। আফসোস প্রকাশ করলেন উইনচেস্টার, তারপর বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে—ইপস্‌উইচের ট্রেন ধরবেন।

ডাক্তার চলে গেলে মি. করবেকের সঙ্গে আলোচনায় বসলাম আমি। ভ্যান হাইনের বইটা তাঁর নখদর্পণে, জিনিসটা হাতের কাছে না-থাকলেও আলোচনা করতে অসুবিধে হলো না। কতদূর পড়েছি, তা জানালাম আমি। বললাম, মার্গারেট এসে না-পড়লে প্রতীকগুলো সম্পর্কে আরও কিছু জানতে পারতাম। এখন তো বইটাই গায়েব, ওখানে কী লেখা ছিল—তা খুলে বলতে অনুরোধ করলাম মি. করবেককে।

মুচকি হাসলেন ইজিপ্টোলজিস্ট। 'হতাশ হবার কিছু নেই। ওখানে প্রতীকগুলোর অনুবাদ পেতেন না। ভ্যান হাইনের সময় তো নয়ই, পরবর্তী দুই শতাব্দীতেও খোদাইগুলোর অর্থ বের করতে পারেনি কেউ। শেষে আধুনিক যুগে এসে ইয়াং, চ্যাম্পোলিয়ন, বার্চ আর মেরিয়েট বে-র মত প্রতিভাবান ভাষাবিদরা যখন মিশরীয় চিত্রলিপির গবেষণায় যোগ দিলেন, ভাষাটার অর্থ বের করলেন... তখনই শুধু জানা গেল রত্নটায় আসলে কী লেখা আছে। অর্থটা আমি পরে কখনও আপনাকে বলব... যদি মি. ট্রেলনির অনুমতি পাই আর কী! আপাতত এটুকু জানুন, ভ্যান হাইনের বইয়ে ওটার বর্ণনা, এবং হল্যাণ্ডে রত্নটা তিনি কীভাবে নিয়ে এলেন—সেই গল্প পাবেন। বইটা ওখানেই

শেষ।'

ভুরু কোঁচকালাম। 'শুধু এটুকু জানার জন্য ওটা পড়তে দিয়েছিলেন আমাকে? তাতে লাভটা কী? আমাদের তো জানা দরকার, কাটা হাতটা এ-বাড়ি পর্যন্ত এল কী করে?'

হাত তুলে আমাকে আশ্বস্ত করলেন করবেক। 'জানবেন সবই। বইটা আপনাকে পড়তে দিয়েছিলাম আগ্রহ জাগাবার জন্য। ভ্যান হাইনের লেখাটার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো, ওটা পাঠককে চিন্তার খোরাক দেয়, কৌতূহলী করে তোলে; যেমন হয়েছিলাম আমি আর মি. ট্রেলনি। প্রায় একই সময় বিষয়টা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে শুরু করি আমরা। মি. ট্রেলনি প্রাচীন মিশরের পুরাকীর্তি সংগ্রহের এক পর্যায়ে পুরনো বুকসেলারদের ক্যাটালগের মাধ্যমে ভ্যান হাইনের বইটার সন্ধান পান... যেটা আপনাকে পড়তে দিয়েছিলাম। লেইডেন ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে বইটার আরেকটা কপি পাই আমি, ওটা পড়তে শুরু করি। গোপন সমাধিটার বর্ণনা আমাদের দুজনকেই অভিভূত করে। করবে না-ই বা কেন, পাহাড়ের একশো ফুট উপরে তৈরি করা হয়েছে ওটা, মুখ ঢেকে দেয়া হয়েছে, পাহাড়ের শরীর পর্যন্ত এমনভাবে মসৃণ করে দেয়া হয়েছে, যাতে ওটার কাছে পৌঁছুতে না পারে কেউ। এতসব গোপনীয়তার পর পাহাড়ের গায়ে বিভিন্ন রকম প্রতীক খোদাই করা হলো কেন, সেটাও বিস্ময় জাগাল আমাদের মনে। প্রতীকগুলো তো মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে! যে-সমাধি লুকানোর জন্য এত পরিশ্রম করা হয়েছে, সেটার দিকে আবার চোখ পড়বার মত জিনিস কেন আঁকা হয়েছে বাইরে? আরেকটা বিস্ময়ের ব্যাপার আছে। ভ্যান হাইনের সময় আর আমাদের সময়ের মাঝে ইজিপ্টোলজি অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে; প্রাচীন মিশরের বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ সমাধির রেকর্ড-ই সংগ্রহ করা গেছে; কিন্তু কোথাও ওই বিশেষ সমাধিটির বর্ণনা নেই কেন?

জাদুকরের উপত্যকা নামটাও কম আগ্রহী করল না আমাদের।

'কৌতূহল মেটাতে অন্যান্য ইজিপ্টোলজিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করেছিলেন মি. ট্রেলনি, সেই সূত্রেই পরিচয় হয় আমাদের। খাতির জমতে বেশি সময় লাগেনি, কারণ দুজনের মনেই একই উদ্দেশ্য, একই লক্ষ্য বিরাজ করছিল। একসঙ্গে কাজ করবার সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা; ঠিক করলাম, রহস্যময় ওই উপত্যকা আর সমাধি খুঁজে বের করব।

'মি. ট্রেলনি অভিযানের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন, এই ফাঁকে আমি চলে গেলাম হল্যাণ্ডে—ভ্যান হাইনের গল্পের সত্যতা যাচাই করবার জন্য। সরাসরি হুরন্ প্রদেশে চলে গেলাম আমি, জায়গাটা খুবই অনুন্নত, গত দেড়-দু'শতাব্দীতে বাহ্যিক কোনও পরিবর্তন হয়নি। লেখক ভদ্রলোকের বাড়ি আর বংশধরদের খুঁজে বের করবার চেষ্টা করলাম। আমার সেই খাটাখাটনির বর্ণনা দিয়ে বিরক্ত করব না আপনাকে। শুধু ফলাফলটা বলছি—বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর জানতে পারলাম, ভ্যান হাইন পরিবারের সমস্ত সদস্য বহুদিন আগে মারা গেছে, কেউ জীবিত নেই। খবরটা শুনে মিশর থেকে ভ্যান হাইনের আনা পুরাকীর্তিগুলোর খোঁজে বের হলাম আমি। প্রচুর জিনিস ছিল ভদ্রলোকের কাছে—বেশ কয়েকটার হদিস পেলাম লেইডেন, ইউট্রেখ্‌ট, আর অ্যামস্টারড্যামের জাদুঘরে; ধনী সংগ্রাহকদের কাছেও পেলাম কিছু কিছু। কিন্তু আসল জিনিসটা আমি পেলাম গিয়ে হুরনের এক বৃদ্ধ ঘড়িনির্মাতা কাম জুয়েলারের কাছে—গুবরে পোকা আকৃতির একটা রক্তলাল রুবি... ভিতরে সাতটি তারা, পিছনদিকে খোদাই করা হায়ারোগ্লিফিক্স! বুড়ো দোকানদার জিনিসটার আসল মূল্য জানত না, স্রেফ অদ্ভুত একটা পাথর ভেবে আগলে রেখেছিল। মোটাসোটা একটা দাম দিতেই রত্নটা আমার হয়ে গেল, সেটা নিয়ে আমি ফিরে এলাম

লণ্ডনে।

'ব্যস, ভ্যান হাইনের অবিশ্বাস্য কাহিনির একটা বাস্তব প্রমাণ পেয়ে গেলাম আমরা। রত্নটা মি. ট্রেলনির বিশাল সেফটায় রেখে আমরা অভিযানে বেরুবার জন্য তৈরি হলাম। অল্পবয়েসী স্ত্রীকে রেখে অমন একটা অভিযানে যেতে মি. ট্রেলনির অবশ্য খুব খারাপ লাগছিল, কিন্তু তাঁর স্ত্রী ছিলেন অন্যধাতের মহিলা। স্বামীর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে খুবই গুরুত্ব দিতেন তিনি; জানতেন, অভিযানটার জন্য ভদ্রলোক কতটা উতলা হয়ে ছিলেন। তাই সমস্ত দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগকে চাপা দিয়ে স্বামীকে উৎসাহ জোগালেন তিনি, সাহস দিলেন। মন থেকে দ্বিধা দূর হয়ে গেল মি. ট্রেলনির, কয়েকদিন পরই মিশরের উদ্দেশে রওনা দিলাম আমরা... এক বুক আশা নিয়ে।'

এগারো

রানীর সমাধি

কাহিনি বলে চলেছেন মি. করবেক। 'অভিযানটার সাফল্যের ব্যাপারে আমার চেয়ে কোনও অংশে কম আশাবাদী ছিলেন না মি. ট্রেলনি। পিছিয়ে ছিলেন শুধু অভিজ্ঞতার দিক থেকে—আশা-নিরাশার দোলাচলে তাই ঘন ঘন আক্রান্ত হতেন তিনি। তবে লক্ষ্যে অবিচল থাকবার বিরাট একটা গুণ ছিল তাঁর ভিতর; আশা এবং স্বপ্নকে বিশ্বাসে পরিণত করতে জানতেন।

কখনও কখনও রত্নটার বিষয়ে সন্দেহ জাগত আমার মনে; ভাবতাম, অমন জিনিস তো দুটোও থাকতে পারে; যেটা পেয়েছি, সেটাকে অকাট্য প্রমাণ ভাবাটা উচিত হচ্ছে না। ভ্যান হাইনের গল্পটা তো বানোয়াটও হতে পারে। সস্তা খ্যাতির জন্য হয়তো ভদ্রলোক অমন অদ্ভুত কাহিনির অবতারণা করেছেন। কিন্তু এসব চিন্তা কোনোদিনই আসেনি মি. ট্রেলনির মাথায়, নিজের বিশ্বাসে অটল থেকেছেন তিনি।

'লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হবার মত অনেক সম্ভাবনাই ছিল আমাদের সামনে। যখনকার কথা বলছি, সেটা *উরাবি পাশা**-র বিদ্রোহের পরের সময়... পর্যটকদের জন্য মিশর ভাল জায়গা নয়, বিশেষ করে ব্রিটিশদের জন্য তো দেশটা খুবই বিপজ্জনক। তবে এসব টলাতে পারল না মি. ট্রেলনিকে। বিশ্বস্ত কিছু আরবকে নিয়ে দল গড়লেন তিনি, ব্রিটেনের প্রতি তখনও-বিশ্বস্ত সরকারি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে অভিযানের অনুমতি আদায় করলেন, তারপর বেরিয়ে পড়লেন জাদুকরের উপত্যকার খোঁজে।

'অসীম ধৈর্য আর অসহনীয় কষ্ট নিয়ে দিনের পর দিন খাটলাম আমরা। যত ধরনের পাহাড়-জঙ্গল আছে, সবখানে ঢুঁ মারলাম। শেষ পর্যন্ত একদিন রাতে খুঁজে পেলাম বহু-আকাঙ্ক্ষিত সেই উপত্যকা। ঠিক ভ্যান হাইনের বর্ণনার মত—পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত, খাড়া পাহাড়ি পাঁচিলে ঘেরা, মাঝখানটা সরু, আর দু'পাশে চওড়া। দিনের আলো ফুটতেই প্রাচীন নকশাগুলোও দেখতে পেলাম।

'ভ্যান হাইন তাঁর অভিযানে প্রতীকগুলোর অর্থ বের করতে পারেননি, তবে আমাদের জন্য তা সমস্যা হলো না। দুশো বছরে

---

* বিখ্যাত মিশরীয় সমরনায়ক, ১৮৭৯ সালে প্রচলিত শাসনব্যবস্থা ও ইয়োরোপীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করে বসেন, যা *উরাবি-বিদ্রোহ* নামে পরিচিত। এই বিদ্রোহের ফলে মিশরে ইয়োরোপীয়দের কর্তৃত্ব এক অর্থে শেষ হয়ে যায়।

অনেক এগিয়েছে ভাষাতত্ত্ব আর ইজিপ্টোলজি। পরিষ্কার পড়তে পারলাম আমরা পাঁচ হাজার বছর আগে থিবের পুরোহিতদের খোদাই করা কথাগুলো। সেটা এরকম:

'এখানে দেবতারাও আসেন না। "নামহীন সে" তাঁদের অসম্মান করেছে, তাই অনন্তকালের জন্য সে একা। সাবধান পথিক! তুমিও যেও না তার কাছে, নইলে দেবতাদের ক্রোধের শিকার হবে!

'খুবই কঠোর সতর্কবাণী, দীর্ঘস্থায়ী হবার জন্য পাথর কুঁদে লেখা হয়েছে। ভাষাটাও অত্যন্ত কড়া, অনন্তকাল বোঝানোর জন্য যে-প্রতীকটা ব্যবহার করা হয়েছে, তার আক্ষরিক অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—কয়েক লক্ষ বছর। মোট ন'বার উল্লেখ করা হয়েছে ওটা, মানে অভিশপ্ত মানুষটির প্রায়শ্চিত্ত করবার কোনও সুযোগ নেই। আকাশের স্বর্গ আর পাতালের নরকের দুটো প্রতীকের মাঝখানে আটকে আছে *নামহীন*-এর প্রতীক। অর্থ দাঁড়ায়, মৃত্যু-পরবর্তী কোথাও জায়গা নেই তার... অনন্তকাল আটকে থাকতে হবে মাঝামাঝি।

'প্রাচীন মিশরের প্রায় সমস্ত সমাধিতে এ-ধরনের সতর্কবাণী পাওয়া যায়, তাই ওটাকে গুরুত্ব দিলাম না আমি বা মি. ট্রেলনি। তবে সঙ্গের কুলিগুলোকেও অর্থটা বলবার সাহস হলো না। অত্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ওরা, ভয় পেয়ে আমাদের ফেলে পালিয়ে যেতে পারে। পাহাড়ি দেয়ালটা থেকে দূরে ক্যাম্প করলাম আমরা, যাতে অদ্ভুত প্রতীকগুলো সারাক্ষণ চোখের সামনে না-ভাসে। অবশ্য তারপরও পুরোপুরি নিশ্চিন্ত রাখতে পারলাম না অশিক্ষিত লোকগুলোকে, *"জাদুকরের উপত্যকা"* নামটা শুরু থেকেই ঘাবড়ে দিয়েছে তাদের।

'যা হোক, থাকার ব্যবস্থা হতেই পাহাড়ে চড়বার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। সঙ্গে কাঠ নিয়ে এসেছিলাম, সেগুলোর

সাহায্যে মই বানানো হলো; পাহাড়ি পাঁচিলের চুড়ো থেকে একটা বিমের সাহয্যে পুলিও ঝোলানো হলো, যাতে সেফটি লাইন বাঁধা যায়... কেউ পা হড়কালে যেন তাকে দড়ির সাহায্যে টেনে তোলা যায়। সবকিছু তৈরি হবার পর পাহাড়ে চড়লাম আমরা, ফোকর গলে ঢুকলাম সমাধির প্রবেশপথে। ভ্যান হাইনের বর্ণনা মোতাবেক পাথরের দরজাটা পেলাম, সেটা খুলে আমি আর মি. ট্রেলনি প্রবেশ করলাম সমাধির ভিতর।

'সঙ্গে প্রচুর বাতি ছিল, সেগুলোর সাহায্যে অভ্যন্তরটা আলোকিত করে ফেলতে অসুবিধে হলো না। পূর্ব-পরিকল্পনা মোতাবেক প্রথমে সার্ভে শুরু করলাম, পরে সমস্ত জিনিসপত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করব। যতই এগোলাম, ততই বিস্ময় আর আনন্দ ভর করল আমাদের মধ্যে। সমাধিটা সত্যিই অসাধারণ, এমন সৌন্দর্য, বা প্রাচুর্য আমরা আগে কোনও সমাধিতে দেখিনি। নিখুঁত ভাস্কর্য আর পেইন্টিং দেখে বুঝতে পারলাম, এখানে শায়িত মানুষটির জীবদ্দশায়... তার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তৈরি করা হয়েছিল সব। দীর্ঘ পাঁচ হাজার বছর পেরিয়ে গেলেও প্রতিটা চিত্রলিপি অবিকৃত রয়েছে; রঙগুলো এতই জ্বলজ্বলে, যেন গতকালই আঁকা হয়েছে সব। সমাধির ভিতর কোনও ধরনের আর্দ্রতা না-থাকার কারণেই বিকৃত হয়নি ওগুলো।

'একটা জিনিস আমরা দুজনেই বুঝতে পারলাম—বাইরের খোদাইগুলো যদিও পুরোহিতদের করা, তবে পাহাড়ের দেয়ালটা ওরা মসৃণ করেনি। ওটা সম্ভবত সমাধির নকশাকারীর ডিজাইনেই ছিল। ভিতরের দেয়ালগুলোতেও একই ধরনের মসৃণতা আমাদের এই ধারণা দিল। পুরো সমাধিটাই উৎকৃষ্ট নির্মাণশৈলীর প্রমাণ দিচ্ছে। প্রবেশমুখের কাছে একটা অ্যান্টিচেম্বার আছে—আংশিক প্রাকৃতিক, আর আংশিক মনুষ্য-নির্মিত; ওটার শেষ প্রান্তে পাথর কেটে বানানো হয়েছে

পিলারঅলা একটা বিশাল পোর্টিকো—এই জিনিস আর কোনও সমাধিতে আছে বলে জানা নেই আমাদের। স্তম্ভগুলো বিশাল, সপ্তভুজ-আকৃতির, গায়ে ছবি আঁকা। ওখানে চাঁদের নৌকা দেখলাম আমরা, তাতে গরু-মুখী দেবী *হ্যাথর* বসা—মাথায় পবিত্র চক্র আর পালকের মুকুট পরা। সঙ্গে আছে উত্তরের দেবতা... কুকুরমুখো *হাপি*। সপ্তর্ষিমণ্ডল-খচিত উত্তরদিকে যাচ্ছে নৌকা, চালাচ্ছে *হারপোক্রেটিস*। সপ্তষিমণ্ডলের সাতটা তারাকে আঁকা হয়েছে অস্বাভাবিক বড় করে, প্রশ্নবোধকের আকৃতির ফাঁকা জায়গাটা এমনভাবে সোনালি রঙ করা হয়েছে যে, আমাদের মশালের আলোয় ঝলমল করে উঠল।

'পোর্টিকো পেরুতেই সনাতন মিশরীয় সমাধির দুটো স্থাপত্য-বৈশিষ্ট্য দেখতে পেলাম—চেম্বার, বা চ্যাপেল; এবং মমি-পিট। ভ্যান হাইনের বর্ণনার সঙ্গে মিলে গেল সব। তবে ওগুলো পরখ করবার আগে আমাদের চোখ আটকে গেল পশ্চিমের দেয়ালে। লাপিস লাজুলি পাথরে গড়া ওই অংশটা একটা দলিল—সমাধির ইতিবৃত্ত লেখা আছে ওতে। আর্কিয়োলজির ভাষায় এ-ধরনের দেয়ালকে *স্টিল* বলে। জিনিসটা আমাদেরকে এতই আকৃষ্ট করল যে, আসল উদ্দেশ্য ভুলে গেলাম... মমি খুঁজে বের করবার পরিবর্তে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম ওটা নিয়ে। খুদে খুদে চিত্রলিপিতে ভরা বর্ণনাটা পড়তে শুরু করলাম। ওটার শিরোনাম ছিল:

'*টেরা—মিশরের রানী, আন্তেফের কন্যা, উত্তর ও দক্ষিণের সম্রাজ্ঞী, সূর্যের সন্তান, ডায়াডেমের সর্বাধিকারী।*

'এরপর ছিল ওই রানীর জীবনবৃত্তান্ত ও শাসনকালের বিবরণ। সার্বভৌমত্বের যে-প্রতীক দেখলাম আমরা, তা ছিল নারীত্বের প্রাচুর্যে ভরা। উত্তর ও দক্ষিণ মিশরের যৌথ মুকুটের ছবিটাও দেয়া হয়েছে নিখুঁতভাবে। ব্যাপারটা আমাদের দুজনের

জন্যই নতুন, কারণ শুধু পুরুষরাই প্রাচীন মিশরে মুকুট পরত; দেবীরাও পরত বটে, তবে সমাধিটা কোনও দেবীর হতে পারে না। দেব-দেবী হচ্ছে কাল্পনিক, তা ছাড়া তারা অমর... মমি হবার প্রয়োজন নেই। ব্যাপারটার একটা ব্যাখ্যা অবশ্য পরে পেয়েছিলাম আমরা, সেটা যথাসময়ে বলব।

'যা হোক, দেয়ালের গায়ে ওই লেখাটা দেখে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম আমরা—বিভ্রান্ত বোধ করছিলাম। খানিক পরে নিজেদের সামলে নেমে পড়লাম মমি-পিটে। বেশ গভীর ওটা... প্রায় সত্তর ফুট। সঙ্গে দড়ি এনেছিলাম, সেটা বেয়ে নামলাম ওখানে—প্রথমে মি. ট্রেলনি, তারপর আমি। গর্তের তলা থেকে একটা সরু প্যাসেজ গেছে সারকোফাগাস-চেম্বারে, মুখে কোনও দরজা নেই। ওটা ধরে চেম্বারে ঢুকতেই দেখা পেলাম আয়রন-স্টোনে তৈরি বিশাল সারকোফাগাসটার। জিনিসটার বর্ণনা দেয়ার প্রয়োজন মনে করছি না, ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই ওটাকে মি. ট্রেলনির কামরায় দেখতে পেয়েছেন আপনি।

'সারকোফাগাসের ডালাটা মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখলাম আমরা, ভ্যান হাইনের বেদুঈন সঙ্গীরা সম্ভবত ওটা না-তুলেই বেরিয়ে গিয়েছিল মমি-পিট থেকে। আমাদের জন্য এক অর্থে ভাল হলো ব্যাপারটা, নইলে ভারী ডালাটা আমাদের দুজনকেই সরাতে হতো সারকোফাগাসের উপর থেকে। ওই ঝামেলা না-থাকায় সরাসরি এগিয়ে গেলাম শবাধারটার দিকে, উঁকি দিলাম ভিতরে। আমি অবশ্য মনে মনে একটু হতাশা বোধ করছিলাম, কারণ ভ্যান হাইনের মত উত্তেজনাকর কিছু ঘটতে যাচ্ছে না আমাদের বেলায়। সারকোফাগাসে উঁকি দিয়ে আমরা মমিটার অবিকৃত হাত দেখতে পাব না। তবে আমার জানা ছিল না, নতুন একটা চমক ওখানে অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য।

'মমিটার দিকে তাকাতেই চোখ বড় বড় হয়ে গেল আমাদের। উন্মুক্ত হাতটা কবজির পর থেকে অদৃশ্য, সেটা ঠিক আছে; কিন্তু আমরা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে লক্ষ করলাম, কাটা জায়গাটাতে রক্ত শুকিয়ে আছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, হাতটা কেটে নেবার পর গলগল করে রক্ত বেরিয়েছে ক্ষত থেকে; হাতের তলায়... মমির লিনেনের আবরণেও রয়েছে শুকানো রক্তের বিশাল এক ছোপ। এ অসম্ভব... জীবন্ত মানুষ ছাড়া আর কারও শরীর থেকে এভাবে রক্ত বেরুতে পারে না! ব্যাপারটার কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পেলাম না আমরা।

'এবার আসি রানী টেরার জীবনবৃত্তান্তের বিষয়ে। ওসব আমরা জানতে পেরেছি সমাধির দেয়াল আর সারকোফাগাসে আঁকা হায়ারোগ্লিফিক্স থেকে, সেইসঙ্গে পুরনো ইতিহাস ঘেঁটে। টেরা ছিল মিশরীয় সাম্রাজ্যের একাদশ রাজবংশের এক রানী; ওটাকে আমরা থিবান ডাইন্যাস্টি বলে জানি, যার সময়কাল ছিল খ্রিস্টপূর্ব দু'হাজার নয়শো থেকে দু'হাজার পাঁচশো অব্দ পর্যন্ত... মোট চারশো বছর। সম্রাট আন্তেফের একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে সিংহাসনে বসে সে। অত্যন্ত দৃঢ় চরিত্রের মেয়ে ছিল টেরা, সহজাত ক্ষমতা ছিল নেতৃত্বের; বাবার মৃত্যুর পর খুব অল্প বয়সেই দেশের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল তাকে। মিশরীয় পুরোহিতরা সুযোগটার সদ্ব্যবহার করতে চাইল; সংখ্যা আর শিক্ষার জোরে এমনিতেই তারা তখন অত্যন্ত শক্তিশালী... বিশেষ করে উত্তর মিশর তাদের হাতের মুঠোয়। ওদের পরিকল্পনা ছিল, রাজ-শাসনের অবসান ঘটিয়ে পুরো সাম্রাজ্যে ধর্মীয় শাসন-ব্যবস্থা কায়েম করবার। কিন্তু বেচারাদের সেই পরিকল্পনা সফল হয়নি। সম্রাট আন্তেফ আগেই টের পেয়ে গিয়েছিলেন পুরোহিতদের গোপন ইচ্ছের ব্যাপারে, তাই সেনাবাহিনীকে এমনভাবে গড়েছিলেন, যাতে ওরা টেরার অনুগত

থাকে। মেয়েকে তিনি রাজনীতি শিখিয়েছিলেন, সেইসঙ্গে শিখিয়েছিলেন পুরোহিতদের বিভিন্ন বিদ্যাও... বিশেষ করে শিল্পকর্ম। টেরা ছিল জাতশিল্পী, অল্প সময়েই বিভিন্ন রকম শিল্পে দক্ষ হয়ে উঠেছিল ও। সমাধির দেয়ালে এ-ব্যাপারে প্রচুর তথ্য দেয়া আছে। আমার আর মি. ট্রেলনির তো ধারণা, ওখানকার অনেক চিত্রলিপি ও নিজেই এঁকেছে! স্টিলের বর্ণনায় ওকে *শিল্পের রক্ষাকারী* বলে আখ্যা দেয়ায় সন্দেহটা আরও দৃঢ় হয়।

'মেয়েকে শুধু শিল্প শিখিয়ে ক্ষান্ত হননি আন্তেফ, তাকে জাদুও শিখিয়েছিলেন, যাতে ঘুম ও ইচ্ছেশক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ খাটাতে পারে ও। এই জাদু ছিল কালো জাদু—লোক-দেখানোর জিনিস নয়, সত্যিকারের শক্তিশালী ক্ষমতা। এই বিষয়টাতেও টেরা অত্যন্ত দক্ষ হয়ে ওঠে, শিক্ষকদেরকে ছাড়িয়ে যায়। প্রকৃতির গোপন রহস্য আয়ত্ত করে, জেনে নেয় আরও অনেক কিছু। নিজের ক্ষমতার দৌড় পরখ করবার জন্য মাঝে মাঝে সমাধি তৈরি করত সে, তাতে মমির মত লিনেন জড়িয়ে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিত... মৃত্যুকে জয়ের কৌশল খুঁজত ওভাবে। পুরোহিতরা কয়েকবারই তার এই স্বভাবকে নিজেদের হাতিয়ার বানাতে চেয়েছে; গুজব ছড়িয়েছে—আসল রানী সমাধির ভিতর মারা গেছে, তার জায়গা নিয়েছে এক বহুরূপী। কিন্তু প্রতিবারই তাদের ওসব গুজবকে মিথ্যে প্রমাণিত করেছে টেরা। এ-সমস্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পেয়েছি আমরা সমাধির দেয়ালে আঁকা হায়ারোগ্লিফে। সারকোফাগাসের চেম্বারে আঁকা চিত্রলিপিতে বলা হয়েছে, শেষ পর্যন্ত সব ধরনের নিদ্রাকে জয় করতে পেরেছিল টেরা।

'বলে রাখা ভাল, সমাধির প্রতিটা হায়ারোগ্লিফে অদ্ভুত সুন্দর রূপক দেখেছি আমরা। ওগুলো থেকে বোঝা যায়, পুরুষশাসিত সমাজ-ব্যবস্থাতে নারী হওয়া সত্ত্বেও একজন সম্রাটের সমতুল্য

ক্ষমতা ও সম্মান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল টেরা। একটা ছবিতে তাকে পুরুষের পোশাকে দেখেছি আমরা—সম্রাটের সাজে সাদা ও লাল রঙের মুকুট পরে আছে। পরের ছবিগুলোতে সে মেয়েলি পোশাক পরলেও মুকুট ঠিক রেখেছে... এর মানে, উত্তর ও দক্ষিণ মিশরের কর্তৃত্ব ঠিকমতই ছিল তার হাতে। তার সামনে অনেক ছবিতেই পুরুষদের নতজানু হয়ে থাকতে দেখা গেছে। যেখানেই আশা, লক্ষ্য, বা পুনরুত্থানের বিষয় এসেছে, সেখানেই উত্তরের প্রতীক আঁকা হয়েছে। অতীত, বর্তমান, বা ভবিষ্যতের কোনও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এলেই আঁকা হয়েছে আকাশের সপ্তর্ষিমণ্ডলের চিহ্ন। ওই নক্ষত্রমণ্ডলকে কেন যেন নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত ভাবত টেরা।

'সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং যে-তথ্যটা আমরা ওই চিত্রলিপিতে পেয়েছি, তা হলো—দেবতাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করবার মত ক্ষমতা ছিল রানী টেরার। এ-ধরনের বিশ্বাস প্রাচীন মিশরের ইতিহাসে নতুন কিছু নয়; তবে দেবতাদের উপর খবরদারির যে-পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, তা আগে শুনিনি আমরা। গুবরেপোকার আকৃতিতে একটা রুবিপাথর কাটিয়েছিল টেরা—ভিতরে সাতটা প্রান্তে সাতটা তারা... আর পিছনে মন্ত্র খোদাই-সহ। ওটার সাহায্যে দেবতাদের উপর হুকুম চালাত সে।

'বর্ণনাটা পড়ে জানা যায়, পুরোহিতদের মনে রানীর প্রতি কী পরিমাণ ঘৃণা জমা হয়েছে, তা ভাল করেই জানত টেরা। জানত, ওর মৃত্যুর পর সেই ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে তারা রানীর নাম-নিশানা মুছে দিয়ে। সেই আমলে ওটা ছিল ভয়ানক একটা প্রতিশোধ... কারণ নাম না থাকলে কারও জন্য প্রার্থনা করা যায় না; আর প্রার্থনা করা না হলে মৃত্যুর পর কারও পক্ষে স্বর্গে যাওয়া সম্ভব নয়। এসব ভেবে একটা বিকল্প ঠিক করল টেরা, সিদ্ধান্ত নিল—মরার পর অন্যজগতে যাবে না সে, ঘুমিয়ে

থাকবে... লম্বা একটা সময় পর আবার জেগে উঠবে এই পৃথিবীতেই... মিশর থেকে উত্তরের কোনও দেশে, সপ্তর্ষিমণ্ডলের আরও কাছে। এই উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য অনুচরদের নির্দেশ দিল, মৃত্যুর পর ওর মমির একটা হাত উন্মুক্ত রাখতে হবে... সেটায় ধরা থাকবে তার ক্ষমতার উৎস—সপ্তর্ষির রত্ন। সপ্তভুজ-আকৃতির একটা বাক্সের কথাও দেখলাম আমরা চিত্রলিপিতে—ওটায় নাকি দেব-দেবী, নিদ্রা এবং ইচ্ছেকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। বাক্সটা পাওয়া গেল সারকোফাগাসের ভিতর, মমির পায়ের নীচে। ওটা সম্ভবত মি. ট্রেলনির কামরায় দেখেছেন আপনি। বাক্সটা বের করে আনলাম আমরা, আর তখন মমির দু'পায়ে... লিনেনের উপর আরও দুটো প্রতীক দেখলাম—একটা হচ্ছে পানির, অন্যটা মাটির। রত্নের গায়ের খোদাই, আর ও'দুটো মিলিয়ে বিশ্লেষণ করলাম আমরা। বুঝলাম, রানী টেরার অসীম ক্ষমতার কথা বলছে ওগুলো—নিজেকে অমর ভাবত সে, ইচ্ছে করলেই আত্মাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন বা জোড়া দিতে পারত; মাটি, পানি, আগুন, বায়ু... সবকিছুর উপরই তার শাসন ছিল।

'যা হোক, বলছিলাম অদ্ভুত বাক্সটার কথা। ওটা আমরা সারকোফাগাস থেকে বের করলাম ঠিকই, কিন্তু কিছুতেই খুলতে পারলাম না। ডালাটা এমনভাবে আটকে দেয়া হয়েছে যে, না-ভেঙে কিছুতেই বোঝা সম্ভব নয়। সমাধির ভিতর তেমন কোনও ধন-রত্ন পাইনি আমরা; তাই ধরে নিলাম, পরজগতে রানীর প্রয়োজনীয় মূল্যবান জিনিসগুলো ওটার ভিতর রাখা হয়েছে; জিনিসগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য হয়তো ওভাবে আটকানো হয়েছে ডালাটা। লিনেনের আবরণের তলায়... লাশটার শরীরেও সম্ভবত দামি অলঙ্কার রয়েছে।

'আপনাকে সবকিছু ধারাবাহিকভাবে বলছি, মি. রস; যাতে

পরে সবকিছু নিয়ে কাজ করতে গেলে বুঝতে সুবিধে হয়। একটা কথা বলে রাখি, এই কেসটায় কাজ করতে গেলে সাধারণ বিচার-বুদ্ধি এবং বিশ্বাসকে জলাঞ্জলি দিতে হবে আপনার। মমিটাকে ঘিরে ইতোমধ্যেই এতসব অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেছে যে, বিশ্বাস-অবিশ্বাসকে নতুন পাল্লায় মাপা ছাড়া উপায় নেই। কিছু কিছু ঘটনা আছে, যা স্বাভাবিক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব!

'ফিরে আসি আবার আমাদের কাহিনিতে। জাদুকরের উপত্যকায় কয়েকদিন কাটালাম আমরা, সমাধির সমস্ত ড্রয়িং আর হায়ারোগ্লিফের প্রতিলিপি তৈরি করলাম। লাপিস লাজুলির প্রস্তরখণ্ডটা নামিয়ে আনলাম, সেই সঙ্গে নামালাম সারকোফাগাস-সহ মমি, সপ্তভুজ-বাক্স, তেলের জার-সহ পাথরের সিন্দুক, ব্লাডস্টোন আর অ্যালাবেস্টারে তৈরি কয়েকটা টেবিল, হাতির দাঁতে তৈরি একটা চক্র... সোজা কথায় নামানোর মত যা-যা আছে, সব। চ্যাপেল, মমি-পিট, আর পোর্টিকো পুরোপুরি খালি করে ফেললাম আমরা।

'জিনিসপত্র অনেক বেশি হয়ে গিয়েছিল, শেষবার সমাধি থেকে নেমে আসার পর মইটা আর বইতে চাইলাম না। ওটা মাটি খুঁড়ে চাপা দিয়ে রাখলাম আমরা, যাতে পরে আবার কখনও এলে উঠিয়ে কাজ করা যায়। সঙ্গে একটা ঠেলাগাড়ি ছিল আমাদের, ওটায় সমস্ত মালামাল লোড করে এরপর আমরা রওনা হলাম ফিরতি পথে... নীল নদের দিকে। কাজটা খুবই কঠিন, সঙ্গে যথেষ্ট লোক থাকা সত্ত্বেও মরুভূমির মাঝ দিয়ে ঠেলাগাড়িটা নিয়ে যেতে খুব কষ্ট হলো আমাদের, এগোতে থাকলাম শামুকের গতিতে। নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় মাথা খারাপ হবার অবস্থা হলো আমার আর মি. ট্রেলনির—ভয় শুধু বেদুঈন দস্যুদল নিয়ে নয়; দলের স্থানীয় লোকদের উপরও বিশ্বাস রাখতে পারছি না কেউ।

অমূল্য সব গুপ্তধন আবিষ্কার করেছি আমরা, কে যে কখন লোভী হয়ে ওঠে, কিছুই বলা যায় না। বাস্তবেও তা-ই ঘটল, প্রথম রাতে দু'বার চেষ্টা চালানো হলো ঠেলাগাড়ি থেকে মালামাল চুরির; সকালে আমরা দলের দুজন লোককে মৃত অবস্থায় পেলাম।

'দ্বিতীয় রাতে ভয়ানক এক মরুঝড়ের কবলে পড়লাম আমরা। প্রকৃতির ওই অবিশ্বাস্য রোষের মুখে কিছুই করার ছিল না, পুরোপুরি অসহায় হয়ে গেলাম আমরা। ঝড় শুরু হতেই দলের বেশ কিছু কুলি সবকিছু ফেলে পালিয়ে গেল নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে, আমরা বাকিরা সারা শরীর কম্বলে মুড়ে মুখ গুঁজে পড়ে রইলাম বালিতে। সকাল নাগাদ যখন ঝড় থামল, তখন রীতিমত কবর হয়ে গেছি, অন্তত দু'ফুট বালির ভিতর ঢুকে গেছি সবাই। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে বালির তলা থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা, তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম আমাদের মহামূল্য আবিষ্কারগুলোর অবস্থা দেখতে। সৌভাগ্যক্রমে সবই অক্ষত পেলাম... শুধু মমিটা বাদে। বইতে সুবিধের জন্য ওটা সারকোফাগাস থেকে বের করে আলাদা একটা কাঠের বাক্সে রেখেছিলাম আমরা—বাক্সটা ভাঙা অবস্থায় পেলাম, ভিতরে মমিটা নেই। তন্নতন্ন করে খুঁজলাম আমরা চারপাশে, বালি খুঁড়ে অসংখ্য গর্ত বানিয়ে ফেললাম, কিন্তু কিছুতেই পেলাম না ওটা। একটা গোটা দিন আমরা অপেক্ষা করলাম পালিয়ে যাওয়া আরবদের ফিরে আসবার জন্য, যদি তাতে মমিটা ফিরে পাওয়া যায়—হয়তো ঝড়ের সময় ওরাই ওটা সরিয়ে রেখেছে। তবে এতসব চেষ্টা ব্যর্থ হলো—কুলিরা যেমন ফিরল না, তেমনি রানী টেরার দেহটারও সন্ধান মিলল না। মি. ট্রেলনির চেহারা কালো হয়ে গেল—যে-জিনিসের জন্য এত খাটলাম আমরা, সেটাই যদি গায়েব হয়ে যায়, তা হলে কারই বা ভাল লাগে?

'সে-রাতে ঘুমোতে যাবার আগে মি. ট্রেলনি আমার কানে কানে বললেন, "জাদুকরের উপত্যকায় ফিরে যেতে হবে আমাদেরকে। সকালে আমি যখন কুলিদেরকে আদেশ দেব, তখন দ্বিধা দেখিয়ো না। ব্যাটারা তা হলে মাথায় চড়ে বসবে, কিছুতেই যেতে চাইবে না ওখানে।"

'"ঠিক আছে," বললাম আমি। "কিন্তু ওখানে যেতে চাইছেন কেন, জানতে পারি?"

'রহস্যময় কণ্ঠে মি. ট্রেলনি বললেন, "মমিটা ওখানেই আবার খুঁজে পাব আমরা... আমি নিশ্চিত!"

'কথাটা শুনে বিভ্রান্ত বোধ করলাম। ভদ্রলোকের মনে এমন একটা বিশ্বাস জন্মাল কেন, তা জানতে চাইলাম। কিন্তু জবাব না দিয়ে তিনি শুধু বললেন, 'অপেক্ষা করো। নিজের চোখেই দেখবে, আমার কথাটা ঠিক কি না।" আমাকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি।

'পরদিন সকালে আমরা যখন উল্টোপথ ধরলাম, তখন বিস্মিত হলো কুলিরা। অসন্তোষ দেখা দিল ওদের ভিতর। আমাদের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি শুরু করে দিল, বেশ কয়েকজন চলে গেল দল ছেড়ে। অবশিষ্ট কুলিদের নিয়ে এগিয়ে চললাম আমরা, তখন পর্যন্ত গন্তব্যের কথা জানাইনি ওদের। কিন্তু জাদুকরের উপত্যকায় পৌঁছুতেই বেঁকে বসল কুলি-সর্দার, কিছুতেই ওখানে ঢুকতে রাজি হলো না। অনেক অনুনয়-বিনয় করবার পর মইটা এনে পাহাড়ের গায়ে লাগাতে রাজি হলো সে, তবে কাজটা সেরেই দলবল নিয়ে চলে গেল উপত্যকার বাইরে। বলে গেল, আমাদের জন্য তিনদিন অপেক্ষা করবে সে, যদি তার মধ্যে না ফিরি, তা হলে চলে যাবে এলাকা ছেড়ে।

'কী আর করা, দড়ি আর মশাল নিয়ে শুধু আমি আর মি. ট্রেলনি গিয়ে ঢুকলাম সমাধিতে। আমাদের অনুপস্থিতিতে কেউ

যে ওখানে গেছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল পাহাড়ের চূড়া থেকে ঝুলতে থাকা দড়ি, এবং সমাধিতে ঢোকার দরজাটা খোলা দেখতে পেয়ে। তাড়াহুড়ো করে মশাল জ্বাললাম আমরা, ছুটে গেলাম মমি-পিটে। সারকোফাগাস চেম্বারে ঢুকতেই থমকে গেলাম দুজনে।

'সারকোফাগাসের জায়গাটায় মাটির উপর পড়ে থাকা মমিটা দেখতে পেলাম আমরা, পাশে পড়ে আছে তিনজন আরব কুলির মৃতদেহ—ঝড়ের সময় আমাদের ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল এরা। নির্মম, ভয়ঙ্কর মৃত্যু ঘটেছে ওদের, মুখগুলো কালো হয়ে আছে, নাক-মুখ থেকে বেরিয়ে আসা রক্তের ছিটেয় ভরে আছে দেহের সামনের অংশ। প্রত্যেকের গলায় ফুটে আছে সাতটা আঙুলের চিহ্ন, যেন গলা টিপে ধরা হয়েছিল ওদের।

'আতঙ্ক আর অবিশ্বাসে পাথর হয়ে গেলাম আমি আর মি. ট্রেলনি, ধীরে ধীরে তাকালাম মমিটার দিকে। বিস্ফারিত চোখে দেখলাম, ধবধবে সাদা একটা হাত পড়ে আছে রানী টেরার বুকের উপর—কবজির কাছ থেকে কাটা, রক্ত শুকিয়ে আছে ওখানে!'

boiRboi.net

বারো

জাদুর বাক্স

রুদ্ধশ্বাস এক গল্প শুনছি আমি মি. করবেকের কাছে। এক গ্লাস

পানি খেয়ে তিনি খেই ধরলেন, 'কতক্ষণ ওভাবে ছিলাম আমরা, জানি না। সংবিৎ ফিরতেই পরস্পরকে সাহস জোগালাম, তারপর নেমে পড়লাম কাজে। প্রথমে কাটা হাতটা বুক-পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন মি. ট্রেলনি। তারপর দুজনে ধরাধরি করে সারকোফাগাস চেম্বার থেকে বের করে আনলাম মমিটা। দড়িতে বেঁধে তুললাম মমি-পিট থেকে, সমাধির প্রবেশপথে গিয়ে আবার নামিয়ে দিলাম একেবারে নীচে... উপত্যকার মেঝেতে। আরবদের লাশ নিয়ে আর মাথা ঘামালাম না, ওগুলো যেমন পড়ে আছে, থাকুক। মই বেয়ে পাহাড় থেকে নেমে এলাম আমরা, মমিটা নিয়ে চলে গেলাম উপত্যকার মুখে—ওখানে আমাদের কুলিদের অপেক্ষা করবার কথা। ওদের পেলাম ঠিকই, কিন্তু আরেকটু দেরি করলেই আর পাওয়া যেত না। কুলিদের ক্যাম্পে গিয়ে আমরা দেখি, ওরা তল্পি-তল্পা গুটিয়ে চলে যেতে বসেছে।

'রাগান্বিত ভঙ্গিতে কুলি-সর্দারকে জিজ্ঞেস করলাম এর কারণ। জবাবে সে জানাল, শর্ত মোতাবেক কাজ করেছে ওরা... তিনদিন অপেক্ষা করেছে। আমরা না-ফেরায় চলে যাচ্ছিল। প্রথমে ভাবলাম, মিথ্যে বলছে লোকটা; আমাদের ফেলে পালিয়ে যাবার মতলব ঢাকতে ছলচাতুরি করছে। সমাধিতে খুব বেশি হলে কয়েক ঘণ্টা ছিলাম আমরা, তিনদিন হবার প্রশ্নই ওঠে না। মি. ট্রেলনিও দেখলাম একই ধারণা পোষণ করছেন। তবে কায়রো পৌঁছার পর আমরা টের পেলাম, কুলি-সর্দার ঠিক কথাই বলেছিল। টেরার সমাধিতে আমরা যেদিন দ্বিতীয়বার ঢুকি, সেদিন ছিল তেসরা নভেম্বর, ১৮৮৪। তারিখটার একটা বিশেষত্ব আছে, বলব খানিক পরেই... দয়া করে মনে রাখুন ওটা।

'তো যা বলছিলাম... কায়রো পৌঁছানোর পর তারিখ মিলিয়ে আমরা বুঝতে পারি, আমাদের জীবন থেকে তিনটি দিন হারিয়ে

গেছে। ওটা সম্ভবত ঘটেছে আতঙ্কিত হয়ে মমি আর কাটা হাতটার দিকে তাকিয়ে থাকবার সময়টাতেই... যদিও তা বিশ্বাস হয় না। তবে আমি আগেই বলেছি, এই মমির বিষয়টাতে জড়িত হতে গেলে আপনাকে সমস্ত সাধারণ বিশ্বাস আর যুক্তিতর্ক ভুলে যেতে হবে। আমি ভুলেছি, কারণ বুঝতে পেরেছি, চেনাজানা জগতের বাইরের অন্য একটা জগতের একটা ভয়ানক শক্তির মুখোমুখি হয়েছি আমি। ওই শক্তির পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। জানি না, মরার পরেও শক্তিটার কবল থেকে মুক্তি পাব কি না।'

কথা থামিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ হয়ে গেলেন মি. করবেক। আনমনা হয়ে গেছেন। একটু পরেই ধ্যান ভাঙল তাঁর, বলতে থাকলেন কাহিনিটা।

'কায়রো থেকে আলেকজান্দ্রিয়ায় গেলাম আমরা। প্ল্যান ছিল, জাহাজে করে মার্সেই যাব, ওখান থেকে রেলে চেপে লণ্ডনে। ওভাবে গেলে সমস্ত গুপ্তধন সঙ্গে রাখা যাবে, চোখের আড়াল হবে না ওগুলো। তবে মানুষ ভাবে এক, হয় আরেক। আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছুতেই একটা টেলিগ্রাম পেলাম আমরা—*মিসেস ট্রেলনি একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেছেন।*

'খবরটা শুনে পাগলের মত হয়ে গেলেন মি. ট্রেলনি, সবকিছু ফেলে চলে গেলেন লণ্ডনে। আমার একার উপর দায়িত্ব চাপল গুপ্তধনগুলো নিয়ে যাবার। কপাল ভাল, পথে বড় ধরনের কোনও ঝামেলায় পড়লাম না। একটু সময় লাগলেও নিরাপদেই পৌঁছুতে পারলাম ইংল্যাণ্ডে। লণ্ডনে যখন আমি পৌঁছুলাম, ততদিনে মিসেস ট্রেলনির শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়ে গেছে, মি. ট্রেলনিও শোক কাটিয়ে উঠেছেন কিছুটা, কাজে ফিরে গেছেন। বাচ্চাটাকে লালনপালনের জন্য দিয়েছেন এক আত্মীয়ের কাছে। তবে ভদ্রলোক যে মানসিকভাবে প্রচণ্ড একটা আঘাত পেয়েছেন,

তা বোঝা যাচ্ছিল খুব ভাল করে। মাথার চুল পেকে গিয়েছিল রাতারাতি, চেহারায় ভর করেছিল কাঠিন্য। স্ত্রীর মৃত্যুর পর কোনোদিন আর হাসতে দেখিনি তাঁকে।

'এ-ধরনের পরিস্থিতিতে সবচেয়ে ভাল ওষুধ হচ্ছে—কাজ। ব্যস্ত থাকলে দুঃখকষ্ট ভুলে থাকা যায়—মি. ট্রেলনি জানতেন সেটা। তাই মন-প্রাণ ঢেলে দিলেন গবেষণায়। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে একই সঙ্গে পাওয়া এবং হারানোর অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁর। স্ত্রী মারা গেছেন, কিন্তু জন্ম দিয়ে গেছেন একটি সন্তানের! সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হলো, দুটোই ঘটেছে আমরা ওই সমাধিতে ঢোকার পর। তেসরা নভেম্বরের কথা বলছিলাম... ওই দিনটাতেই জন্ম হয়েছিল মিস ট্রেলনির। ব্যাপারটা কাকতাল হতে পারে; কিন্তু কেন যেন মি. ট্রেলনির মনে হয়েছিল, এর পিছনে রানী টেরার কোনও না কোনও ভূমিকা আছে। মেয়ের সম্পর্কে খুব কম কথা বলতেন তিনি; পরিষ্কার বুঝতে পারতাম, সন্তানের বিষয়ে দ্বিমুখী অনুভূতি কাজ করত তাঁর ভিতর। মেয়েকে ভালবাসতেন তিনি, কিন্তু এ-কথাও ভুলতে পারতেন না—মেয়ের জন্ম দিতে গিয়ে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী মারা গেছেন। আরও কিছু একটা তাঁকে বিচলিত করত নিজের মেয়ের ব্যাপারে, তবে তা কী, সেটা কখনোই বলেননি আমাকে।

'একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "আমার মেয়ে মোটেই ওর মায়ের মত হয়নি। তুলনা করতে গেলে ওর সঙ্গে বরং রানী টেরার ছবিগুলোর অনেক মিল আছে।" কী বোঝাতে চেয়েছিলেন এ-কথার মাধামে, তা জানি না।

'মেয়ের লালনপালন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, এ-কথা বহুবার বলেছেন আমাকে মি. ট্রেলনি। তাই একমাত্র সন্তানকে পাঠিয়ে দিয়েছেন দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছে, যাতে জীবনের স্বাভাবিক বিকাশে ব্যাঘাত না ঘটে ওর। আমি প্রায়ই মিস

ট্রেলনির প্রসঙ্গ তুলে এটা-ওটা জিজ্ঞেস করতাম, কিন্তু মুখ খুলতেন না তিনি। শেষে একদিন বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, "মার্গারেটের বিষয়ে প্রয়োজনের বাইরে কেন আমি কথা বলি না, তার একটা কারণ আছে, ইউজিন! কোনও একদিন তুমি সেটা জানবে... বুঝতে পারবে।" ওঁর ইচ্ছে-অনিচ্ছে-কে আমি সম্মান করতাম, তাই পরে আর কখনও মিস ট্রেলনির প্রসঙ্গ ওঠাইনি। সত্যি বলতে কী, গতকালের আগে আমি কোনোদিন ওঁকে চোখেও দেখিনি।

'অনেক কথা বললাম মিস ট্রেলনির ব্যাপারে। এবার তা হলে গুপ্তধনের কথা বলি। সমাধি থেকে উদ্ধার করা সমস্ত পুরাকীর্তি মি. ট্রেলনি নিজ হাতে সাজিয়ে রেখেছিলেন এ-বাড়িতে। আয়রনস্টোনের সারকোফাগাসটা থিবের প্রধান পুরোহিত ইউনি-র নির্দেশে তৈরি করা হয়েছিল, ওটার গায়ের হায়ারোগ্লিফে বলা আছে তা, সেই সঙ্গে প্রাচীন বিভিন্ন দেবদেবীর অনেক প্রতীকও আছে। খুবই আকর্ষণীয় শবাধারটা, তাই মমি-সহ ওটাকে প্রথমে তিনি রেখেছিলেন হলঘরে, সবার দেখার জন্য। পরে অবশ্য নিজের রুমে নিয়ে গিয়েছিলেন... তবে শুরুতে সারকোফাগাস আর মমি ছাড়া বাকি জিনিসগুলো শুধু ছিল ওঁর শোবার ঘরে। ওসবের মাঝখানে তিনি রেখেছিলেন মমির হাতটা... জিনিসটাকে তিনি তাঁর সংগ্রহের অন্যতম সেরা আইটেম বলে ভাবতেন। আর একটা মাত্র জিনিস ওর চেয়ে মূল্যবান ছিল তাঁর কাছে—লাল রঙের রুবিটা... ওটাকে তিনি *সপ্তর্ষির রত্ন* বলে ডাকতেন। ওঁর রুমের বড় সেফটাতে সবসময় রাখতেন পাথরটা।

'সবকিছু অনেক বিস্তারিতভাবে বলছি, দয়া করে অধৈর্য হবেন না। বর্তমান পরিস্থিতিটা বুঝতে হলে এসব জানতে হবে আপনাকে।

'রানী টেরার মমি-সহ লণ্ডনে ফেরার পর বহুদিন বিষয়টা নিয়ে আর আলোচনা হয়নি আমাদের মধ্যে। মি. ট্রেলনি অবশ্য পরে বেশ কয়েকবার মিশরে গেছেন—কখনও একা, কখনও বা আমার সঙ্গে। আমাকেও যেতে হয়েছে বহুবার—হয় নিজের, নয়তো মি. ট্রেলনির কাজে। তবে এতসবের পরও কোনোদিনই তিনি নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া বিষয়টা তোলেননি আমাদের মাঝে। এভাবে প্রায় ষোলো বছর পেরিয়ে যাবার পর হঠাৎ একদিন প্রথমবারের মত বিষয়টা নিয়ে মুখ খোলেন মি. ট্রেলনি। বলছি সে-কাহিনি।

'একদিন সকালে জরুরি তলব পেলাম আমি। তখন হার্ট স্ট্রিটে থাকি, গবেষণা করি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। খবর পেয়ে আমি তড়িঘড়ি করে চলে এলাম এ-বাড়িতে, দেখলাম—উত্তেজনায় মি. ট্রেলনির মুখ ঝলমল করছে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর কখনও তাঁকে এমন অবস্থায় দেখিনি, কাজেই কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। কিন্তু কিছুই বললেন না ভদ্রলোক, আমাকে টেনে নিয়ে গেলাম নিজের রুমে। ওখানে ঢুকে দেখি, সবক'টা জানালা বন্ধ, পর্দা টানা—একবিন্দু আলো ঢুকছে না ঘরে। দেয়ালের বাতিগুলো নেভানো, তবে পঞ্চাশ ক্যাণ্ডেল-পাওয়ারের কয়েকটা ফ্লোর-ল্যাম্প জ্বলছে এক কোণে। ব্লাডস্টোনে গড়া ছোট্ট টেবিলটাকে দেখলাম নিয়ে আসা হয়েছে রুমের মাঝখানে, ওটা উপরে রয়েছে সপ্তভুজ আকারের বাক্সটা। বাতির মৃদু আলোতে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে ওটাকে, মনে হলো যেন ভিতর থেকে আভা বেরুচ্ছে।

'"দেখে কী মনে হচ্ছে, বলো তো?" জিজ্ঞেস করলেন মি. ট্রেলনি।

'"রত্ন-পাথরের মত," বললাম আমি। "*জাদুর বাক্স* বলতে পারেন ওটাকে, ওরকমই লাগছে। মনে তো হচ্ছে, প্রাণ আছে

জিনিসটার!"

'"অমন লাগছে কেন, বলতে পারো?"

'"আভা বেরুচ্ছে বলে?"

'"অনেকটা ওরকমই," বললেন ট্রেলনি। "তবে এর পিছনে আলোর ফেলার প্রভাব আছে।" রুমের সমস্ত বাতি জ্বেলে দিলেন তিনি। চোখের পলকে বাক্স থেকে আভা-টাভা অদৃশ্য হয়ে গেল। সাধারণ একটা পাথুরে বাক্সে পরিণত হলো ওটা।

'রুমের কোণে রাখা ফ্লোর-ল্যাম্পগুলোর দিকে ইশারা করলেন মি. ট্রেলনি। "ওগুলো কীভাবে সাজিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ?"

'"না তো!"

'"সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতটা তারার আকৃতিতে। রুবিটার ভিতরেও কিন্তু তারাগুলো একইভাবে আছে।" কথাটা শুনে ভাল করে তাকালাম। বুঝলাম ঠিকই বলছেন মি. ট্রেলনি।

'ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন তিনি, "গত ষোলোটা বছরে এমন একটাও দিন যায়নি, যেদিন আমি আমাদের সেই অভিযানটার কথা ভাবিনি। রহস্যময় যেসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি, সেগুলোর সমাধান খুঁজেছি... পাইনি। কাল রাতে হঠাৎ পেলাম সমাধান। স্বপ্নেই পেয়েছি বোধহয়, কারণ যখন ঘুম ভাঙল, তখন উত্তেজনায় কাঁপছি... বুঝতে পারছি, কী করতে হবে। সমাধির সবখানে আমরা সপ্তর্ষিমণ্ডল আর উত্তরদিকের উল্লেখ দেখেছি, তোমার এই জাদুর বাক্সেও প্রতীকগুলো আছে। এই জিনিসদুটো যে গুরুত্বপূর্ণ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তাড়াতাড়ি আমি বিছানা ছেড়ে জানালা খুললাম; দেখলাম, আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল আর উত্তরের ধ্রুবতারা জ্বলজ্বল করছে। তখন আমি টেবিলসহ বাক্সটাকে নিয়ে এলাম জানালার সামনে। বাক্সটার গায়ে কয়েকটা ঘোলাটে অংশ আছে, খেয়াল করেছ

নিশ্চয়ই? তারাগুলোর সঙ্গে ওগুলোকে একই রেখায় আনতেই হালকা একটা আভা বেরুতে শুরু করল বাক্স থেকে। তবে পরীক্ষাটা বেশিক্ষণ চালাতে পারলাম না, মেঘ এসে আকাশ ঢেকে দিয়েছিল। তাই জানালা বন্ধ করে পরীক্ষাটা আমি চালালাম ফ্লোর-ল্যাম্প দিয়ে। সপ্তর্ষিমণ্ডলের আকারটা ঠিক করতে একটু সময় লেগেছে বটে, কিন্তু সফল হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার আভা বেরুতে শুরু করল বাক্স থেকে... ওটাই দেখিয়েছি তোমাকে।"

"'হুম! ইন্টারেস্টিং ব্যাপার! কিন্তু এতে লাভটা কী হচ্ছে?"

"'ধৈর্য ধরো। বলছি সবই। পরীক্ষাটা সফল হওয়ায় বুঝলাম, আলো ফেলে কিছু একটা করা যায় বাক্সটা দিয়ে। কিন্তু আমরা যেখানে ওটা পেয়েছি... মানে ওই সমাধিতে... ওখানে তো আকাশের তারার আলো পৌঁছুনোর কোনও উপায় নেই। তা হলে জিনিসটার উপর আলো ফেলা হতো কী করে? মন খুঁতখুঁত করতে শুরু করল, তাই ব্লাডস্টোনে তৈরি টেবিলটা দেখলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ওটা বানানোই হয়েছে বাক্সটা রাখার জন্য—খাঁজ কাটা আছে। ভালমত দেখতেই আরও কয়েকটা সূক্ষ্ম খাঁজ চোখে পড়ল—সপ্তর্ষিমণ্ডলের আকারে কাটা হয়েছে ওগুলো। মানেটা বুঝতে পারছ? ওখানে সাতটা প্রদীপ রাখা যায়... বাক্সের উপর কৃত্রিমভাবে তারাগুলোর আলো ফেলবার জন্য... ঠিক যেভাবে আমি ফ্লোরল্যাম্পের সাহায্যে আলো ফেলেছি!"

"'কিন্তু আলো ফেলে তো আভা ছাড়া আর কিছুই বের করতে পারেননি আপনি।"

"'ঠিক। কারণ আমার কাছে আসল প্রদীপগুলো নেই। ওগুলোর নিশ্চয়ই কোনও বিশেষত্ব আছে। বাক্সের রহস্য ভেদ করতে হলে ওগুলো দরকার হবে আমাদের।"

'উত্তেজনা অনুভব করলাম মি. ট্রেলনির কথা শুনে। বুঝতে পারলাম, উনি ঠিক পথেই এগোচ্ছেন। হড়বড় করে বললাম, "কোথায় প্রদীপগুলো? কীভাবে পাব আমরা ওগুলো? চিনব কীভাবে..."

'হাত তুলে আমাকে থামালেন মি. ট্রেলনি। বললেন, "শান্ত হও। তোমার প্রথম প্রশ্নটার মধ্যেই বাকি সমস্ত প্রশ্ন মিশে আছে। ওটার জবাব পেলেই বাকিগুলোর জবাবও আপনাআপনি চলে আসবে। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন বটে—প্রদীপগুলো কোথায়? আমার তো মনে হয়, ওগুলো সমাধিতেই আছে।"

'"অসম্ভব!" প্রতিবাদ করলাম আমি। "পুরো সমাধি আঁতিপাঁতি করে দেখেছি আমরা—প্রদীপ তো দূরের কথা, প্রদীপের ছায়াও দেখিনি কোথাও।"

'মাথা ঝাঁকালেন মি. ট্রেলনি, আলমারি থেকে বের করে আনলেন একটা কাগজের রোল। ওটা মেলে ধরলেন টেবিলের উপর। দেখামাত্র চিনলাম ওটা—কাগজটাতে সমাধির সমস্ত দেয়াললিখনের প্রতিলিপি করে এনেছিলাম আমরা। ওটা বিছানো শেষ করে আমার দিকে তাকালেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কি মনে আছে, ওই সমাধিটাতে একটা ব্যতিক্রম পেয়েছিলাম আমরা? মিশরীয় সমাধিতে সবসময় পাওয়া যায়, এমন একটা জিনিস ছিল না ওখানে?"

'"হ্যাঁ, মনে আছে। ওটায় কোনও সারড্যাব ছিল না।"'

গল্প থামিয়ে গলা খাঁকারি দিলেন মি. করবেক। 'সারড্যাব কী, সেটা বোধহয় বুঝিয়ে বলা দরকার। জিনিসটা একটা কুলুঙ্গির মত, সমাধির দেয়ালে থাকে। ভিতরে মৃত ব্যক্তির প্রতিকৃতি, কিংবা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রাখা হয়।'

বুঝতে পেরে মাথা ঝাঁকালাম আমি। মি. করবেক ফিরে গেলেন গল্পে।

'আমার কথা শুনে মি. ট্রেলনি বললেন, "ঠিক বলেছ। তবে ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি আমি, ওটা অস্বাভাবিক। সারড্যাব ছাড়া প্রাচীন মিশরীয়রা কখনও সমাধি বানাত না। তাই আমার মনে হচ্ছে, টেরার সমাধিতেও আছে সারড্যাব... হয়তো লুকানো অবস্থায়। ব্যাপারটা আগেই ভাবা উচিত ছিল আমাদের, ওর মত একজন শিল্পী কখনও সমাধির অমন গুরুত্বপূর্ণ একটা স্থাপত্য-বৈশিষ্ট্যকে বাদ দেবে না। তখন যদি ওটার খোঁজ করতাম আমরা, তা হলে প্রদীপগুলো পেয়ে যেতাম।"

'"হুম!" বললাম আমি। "এখন তা হলে কী করতে চান?"

'"আমি কিছু করব না, করবে তুমি। মিশরে যেতে হবে তোমাকে। সমাধিটাতে গিয়ে সারড্যাবটা খুঁজে বের করবে, তারপর প্রদীপগুলো নিয়ে আসবে।"

'"যদি দেখি, আসলেই কোনও সারড্যাব নেই ওখানে? থাকলেও... ভিতরে যদি না পাই প্রদীপগুলো?"

'"তাতে কিছু যায়-আসে না। সারড্যাব হোক, বা অন্য কোথাও... প্রদীপগুলো তোমাকে খুঁজে বের করতেই হবে। কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওগুলো না পাওয়া পর্যন্ত তুমি ফিরে এসো না।"

'"বুঝতে পেরেছি।"

'টেবিলের উপর মেলে রাখা কাগজটার উপর আঙুল রাখলেন মি. ট্রেলনি। "এই যে, এটা হচ্ছে চ্যাপেলের ম্যাপ। দক্ষিণ আর পূর্বদিকের দেয়ালে পাওয়া হায়ারোগ্লিফগুলোর নোটের উপর চোখ বুলিয়েছি আমি; এখানে... এই মোড়টার কাছে সাত জায়গায় সপ্তর্ষিমণ্ডলের সঙ্কেত পেয়েছি আমি। উপর-নীচ, ডান-বাম... বিভিন্নভাবে আঁকা হয়েছে সঙ্কেতগুলো। সপ্তর্ষিমণ্ডলের উপরের দুটো তারার সঙ্গে একই রেখায় থাকে ধ্রুবতারা, এটা জানো তো? মজার ব্যাপার হলো, এই সাতটা

সঙ্কেতের প্রত্যেকটার ওই রেখা একটা বিশেষ বিন্দুতে মিলেছে। আমার মনে হয়, সারড্যাবটা ওখানেই।"

"'চমৎকার!" উল্লসিত গলায় বলে উঠলাম আমি।

"'সাবধানে কাজ কোরো," আমাকে সতর্ক করলেন মি. ট্রেলনি। "সারড্যাব খুঁজতে গিয়ে সমাধির কোনও কিছু আবার ধ্বংস করে দিয়ে এসো না। সারড্যাবের মুখ খুলবার জন্য নিশ্চয়ই কোনও মেকানিজম আছে, ওটা খুঁজে নিয়ো প্রথমে।"

'মি. ট্রেলনিকে আশ্বস্ত করে বিদায় নিলাম আমি, পরদিনই রওনা হয়ে গেলাম মিশরের পথে। ওখানে পৌঁছে পুরনো কিছু লোক নিলাম, তারপর সোজা চলে গেলাম জাদুকরের উপত্যকায়। পাহাড়ের খাড়া দেয়ালটা বেয়ে আমি একাই উঠলাম সমাধিতে। প্রবেশপথটা পেরুতেই বুঝতে পারলাম, গত ষোলো বছরে আরও মানুষের পা পড়েছে ওখানে। লুকানো সারড্যাবটা লুঠ হয়ে গেছে কি না ভেবে শঙ্কা অনুভব করলাম, সেটা বাস্তবে পরিণত হলো মশাল জ্বালাবার সঙ্গে সঙ্গে।

'চ্যাপেলে ঢুকে দেখি, জায়গাটা শূন্য নয়। পচে শুকিয়ে থাকা একজন আরবের লাশ পড়ে আছে দক্ষিণ দেয়ালের সামনে। ওর শরীরের উপরে খোলা পড়ে আছে সারড্যাবটা... যেখানে ওটাকে পাব বলে আশা করেছিলাম, ঠিক সেখানেই। ভিতরটা খাঁ খাঁ করছে। অর্থটা বুঝতে অসুবিধে হলো না, দক্ষ কবর-চোরদের কবলে পড়েছিল সমাধিটা; ওরাই লুকানো সারড্যাবটা খুঁজে বের করে প্রদীপগুলো নিয়ে গেছে। দেয়ালের সামনে পড়ে থাকা লোকটা নিশ্চয়ই ওদের দলেরই কেউ ছিল... কিন্তু ব্যাটা মরল কীভাবে?

'খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলাম দেয়ালটা। সারড্যাবটা ওটারই একটা অংশ দিয়ে ঢাকা ছিল। ডালার মত ওই অংশটাতে একটা সোনালি রঙের তারা আছে, সাতটা সপ্তর্ষিমণ্ডলের বাহু

ওখানেই এসে মিলেছে। তারা-টা আসলে একটা বোতাম, টিপ দিলেই ভিতরের মেকানিজম সচল হয়, সরিয়ে ফেলে সারড্যাবের মুখটা। ভিতরদিককার দেয়ালে একই রকম আরও সাতটা তারা দেখতে পেলাম—প্রত্যেকটাই একটা করে বোতাম। টেপাটেপি করে দেখলাম, তাতে লাভ হলো না। হঠাৎ মনে হলো, হয়তো সাতটা বোতামই একসঙ্গে চাপতে হবে... হাতের সাতটা আঙুল দিয়ে! তাড়াতাড়ি দুহাত ব্যবহার করে সবগুলো চেপে দিলাম একসঙ্গে। মুহূর্তেই সারড্যাবের পিছনের দেয়ালটা সরে গেল, একটা পাথুরে মূর্তি উদয় হলো ওখানে—প্রাচীন এক দেবতার মূর্তি ওটা, গুপ্তধনের রক্ষক। মূর্তিটার হাতে একটা ধারালো তলোয়ার ধরা। সন্দেহ জাগল একটা, সারড্যাব খোলার মেকানিজমটা পরীক্ষা করে দেখলাম। ওটাতে একটা বুবি ট্র্যাপ বসানো আছে—ডালা খোলার পর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ভিতরের ওই সাতটা বোতাম টিপে না দিলে স্প্রিঙের সাহায্যে ছিটকে বেরিয়ে আসে মূর্তিটা... অযাচিত হানাদারের বুকে তলোয়ার গেঁথে দেয়, তারপর আবার ঢুকে যায় সারড্যাবের পিছনের খোপে। ওভাবেই মারা পড়েছে কবর-চোর লোকটা। বোতামগুলোর সাহায্যে মূর্তিটা উন্মুক্তও করা যায়, হয়তো পরিষ্কার করার জন্যে। ওভাবেই আমার সামনে প্রথমে উদয় হয়েছিল ওটা, বুকে তলোয়ার বসায়নি। সারড্যাবের ডালাটা আমি খোলা অবস্থায় পেয়েছি বলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম, নইলে নির্ঘাত ওই কবরচোরের দশা আমারও হতো।

'কয়েকটা ব্যাপার আমি জানতে পারলাম সারড্যাবটা দেখে। ওটার মুখ খুব একটা বড় নয়, ভিতরে জায়গাও অল্প। তারমানে প্রদীপগুলো আকারে খুব একটা বড় নয়, সবগুলো একজনের পক্ষেই বয়ে নেয়া সম্ভব। একজন কবরচোর মারা যাবার পরও যখন ওগুলো গায়েব হয়ে গেছে, তার অর্থ একটাই হতে পারে—

কমপক্ষে দু'জন চোর হানা দিয়েছিল সমাধিতে। প্রথমজন জীবন দিয়ে সারড্যাবের মুখটা খুলেছে, আর দ্বিতীয়জন বহাল তবিয়তে ভিতরের জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়েছে। প্রদীপগুলোর ব্যাপারেও কিছুটা আইডিয়া পেলাম। সারড্যাবের ভিতর দিককার দেয়ালে হ্যাথর দেবীর প্রতীক—চতুর্ভুজের ভিতর বাজপাখি—আঁকা আছে। প্রদীপগুলোর সঙ্গে ওই দেবীর সম্পর্ক আছে বলে মনে হলো, কারণ মিশরীয় মিথোলজি অনুসারে হ্যাথর হচ্ছে সৌন্দর্য ও পুনরুত্থানের দেবী। সাত রকম অবয়বে সে আবির্ভূত হতে পারে। "সাত" সংখ্যাটাই আমাকে নিশ্চিত করে দিল—প্রদীপগুলোর গায়ে হ্যাথরের সাতটা অবয়ব আছে। রানী টেরার সঙ্গেও সংখ্যাটার সম্পর্ক পদে পদে পদে দেখেছি আমরা।

'এরপর আমি বেরিয়ে পড়লাম ওই চুরি যাওয়া প্রদীপগুলোর খোঁজে। সেটা প্রায় তিন বছর আগেকার কথা। আরব্য রজনীর চরিত্রের মত দশা হয়েছিল আমার—মিশরের অলি-গলিতে পুরনো প্রদীপ খুঁজে বেড়াচ্ছি। চোরাই মাল খুঁজে পাবার আর কোনও উপায় জানা ছিল না আমার। তিনটা বছরে যে কী পরিমাণ কষ্ট করেছি, কত বিনিদ্র রাত কাটিয়েছি, কত নিষ্ফল ছোটাছুটি করেছি—সেগুলো বর্ণনা করলে গোটা একটা মহাকাব্য হয়ে যাবে। শুনতেও ভাল লাগবে না আপনার। তাই সরাসরি ফলাফলটা জানাচ্ছি। দু'মাস আগে মসুলের এক বৃদ্ধ ডিলারের কাছে পাই আমি একটা প্রদীপ—গায়ে হ্যাথরের প্রতীক। লোভ দেখাতেই একে একে বাকি ছ'টা প্রদীপ বের করে আনে সে, প্রতিটার গায়েই হ্যাথরের একটা করে রূপ আঁকা ছিল। ওগুলো দেখে বুঝলাম, আমার দীর্ঘ অভিযান সফল হয়েছে। কেঁদেই ফেললাম আনন্দে।

'প্রদীপগুলো হাতে পেয়ে আর দেরি করলাম না। ব্যক্তিগত জিনিসপত্র যা ছিল, সব বিক্রি করে দিয়ে চড়ে বসলাম জাহাজে।

লণ্ডনে পৌঁছালাম। এর পরের ঘটনা তো আপনি জানেনই।'

কথা শেষ করে লম্বা দম ফেললেন মি. করবেক। 'এই-ই ছিল আমার কাহিনি, মি. রস। পুরো ব্যাপারটা সম্পর্কে আমি যদ্দূর জানি, তা আপনিও এখন জানলেন। এবার নিজেই ভেবে ঠিক করুন, এর মধ্যে কতখানি মিস ট্রেলনিকে খুলে বলবেন...'

ঠিক এই সময় শোনা গেল একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠ।

'কী খুলে বলবেন? আমি এখানে!'

ঝট্ করে চোখ ফেরালাম। মার্গারেটকে দেখতে পেলাম ডাইনিং-রুমের দরজায়। কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে, বা আমাদের কথাবার্তা কতখানি শুনতে পেয়েছে, তার কিছুই জানি না।

তেরো

মি. ট্রেলনির জাগরণ

মার্গারেটের অকস্মাৎ উপস্থিতিতে চমকে গেলাম আমরা। কী বলব, বুঝে পেলাম না। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত যেতেই কাজ করতে শুরু করল মাথা। বুঝতে পারলাম, সন্দিহান গলায় প্রশ্ন ছোঁড়েনি ও। তাই তাড়াতাড়ি সামলে নিলাম নিজেদের।

হেঁটে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল মার্গারেট। বলল, 'কী নিয়ে কথা বলছ তোমরা, ম্যালকম? মি. করবেক নিশ্চয়ই তাঁর প্রদীপ উদ্ধারের গল্প শোনাচ্ছেন তোমাকে, তাই না? আমিও শুনব,

তবে বাবা সুস্থ হবার আগে নয়। এখন গল্প শোনার মত মনের অবস্থা নেই।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম আমি আর মি. করবেক। সেটা লক্ষ করে মার্গারেট বলল, 'তোমরা এ-নিয়েই আলোচনা করছিলে নাকি? গল্পটা আমার কতখানি শোনা উচিত, কিংবা উচিত নয়? ঠিক আছে, তোমাদেরকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিচ্ছি। এখন কিছুই শোনাতে হবে না আমাকে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম সাবধানে। জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি কিছু বলতে এসেছিলে?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল মার্গারেট। 'বাবার অবস্থা দেখতে দেখতে আমি নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়ছি। কিছুক্ষণ আগে মনে হচ্ছিল, আর সইতে পারছি না। তাই ঠিক করেছি, পার্কে গিয়ে একটু তাজা বাতাস খেয়ে আসব। ম্যালকম, আমি না-ফেরা পর্যন্ত তুমি কি একটু বাবার পাশে থাকতে পারবে? তা হলে মনে সান্ত্বনা পেতাম।'

'নিশ্চয়ই!' ঝট্ করে উঠে দাঁড়ালাম। মার্গারেটের সিদ্ধান্ত শুনে ভাল লাগছে। প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে আছে ও, এই অবস্থায় বায়ু-পরিবর্তন দরকার... হোক সেটা আধঘণ্টার জন্য। চলে গেলাম মি. ট্রেলনির ঘরে। নার্স কেনেডি ওখানে পাহারা দিচ্ছিল, তবে দিনের বেলায় একজনের বেশি না থাকলেও চলে। তাই ওকে চলে যেতে বললাম। তারপর একটা চেয়ার টেনে বসলাম বিছানার পাশে।

জানালার পর্দা সরানো, ভিতরটা আলোকিত হয়ে আছে। তবে রুমটা উত্তরমুখী হওয়ায় রোদ ঢুকছে না, আলোটা মোলায়েম। চারপাশে তাকাতে তাকাতে চিন্তায় ডুবে গেলাম—মি. করবেকের অদ্ভুত কাহিনিটা নিয়ে ভাবছি, এই বাড়িতে ঘটতে থাকা রহস্যময় ঘটনাগুলোর সঙ্গে গল্পটার বিভিন্ন বিষয় মেলাতে

চেষ্টা করছি। মাঝে মাঝে সন্দিহান হয়ে উঠলাম এখানকার প্রতিটি জিনিস এবং মানুষের প্রতি, নিজের চোখে দেখা প্রমাণগুলোকেও বিশ্বাস করতে মন চাইল না। সার্জেন্ট ড-র সতর্কবাণী বার বার খোঁচাতে থাকল আমাকে। মি. করবেককে একজন মিথ্যেবাদী ভাবছে সে, মার্গারেটকে সন্দেহ করছে আপন পিতার উপর হামলা করবার অভিযোগে! না, এ-হতে পারে না! যে যত প্রমাণই দেখাক, আমি বিশ্বাস করব না ও এমন জঘন্য কাজ করতে পারে।

ভাবনাটাতে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম একটা অপরিচিত কণ্ঠ—ভারী, গম্ভীর, ঘুমজড়িত। মাথা ঘুরিয়ে চোখ পিট পিট করলাম। অবিশ্বাস্য একটা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি—বিছানায় শোয়া মানুষটি জেগে উঠেছেন!

'কে তুমি? এখানে কী করছ?'

ঝট্ করে পিঠ খাড়া করলাম। বললাম, 'আমার নাম ম্যালকম রস, সার। আমি আপনার দেখাশোনা করছি।'

ঘুম-ঘুম ভাবটা কেটে গেল মি. ট্রেলনির কণ্ঠ থেকে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'দেখাশোনা করছ মানে? কেন?' কথাটা বলতে বলতেই নিজের ব্যাণ্ডেজ-করা হাতের উপর দৃষ্টি চলে গেল তাঁর। গলার স্বর নরম করে জানতে চাইলেন, 'তুমি কি ডাক্তার নাকি?'

'জী না, সার।'

'তা হলে এখানে কী করছ?' আবার কণ্ঠে রাগ ফুটল ভদ্রলোকের। 'ডাক্তার নও, তা হলে কী তুমি?'

তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিলাম কথা। হাজার হোক, ইনি মার্গারেটের পিতা। আমার ব্যাপারে কোনও মন্দ ধারণা যেন না হয়, সেটা মাথায় রাখতে হবে। বললাম, 'আমি একজন ব্যারিস্টার, সার। তবে পেশার খাতিরে আসিনি এখানে। মার্গারেটের বন্ধু আমি। আপনার উপর হামলা হবার পর ও খবর

দিয়েছিল আমাকে। এখানে আসার পর আপনার লেখা চিঠিটা পেয়েছি আমরা, তাই পাহারার কাজে সাহায্য করছি।'

ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন মি. ট্রেলনি, যাচাই করছেন। কথা শেষ হতেই বললেন, 'আমার উপর হামলা? কখন... কাল রাতে?'

'জী না, চার দিন আগের কথা ওটা।'

অবাক হলেন যেন মি. ট্রেলনি। শোয়া থেকে উঠে বসলেন, হেলান দিলেন বালিশ খাড়া করে। বললেন, 'সব খুলে বলো আমাকে, কিচ্ছু বাদ দেবে না। আর হ্যাঁ, আগে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসো। পরিস্থিতিটা পুরোপুরি বুঝে নেবার আগে আমি কারও মুখ দেখতে চাই না।'

তাড়াতাড়ি দরজার পাল্লা ঠেলে ছিটকিনি লাগিয়ে দিলাম। মনে স্বস্তি অনুভব করছি, আমাকে নিশ্চয়ই পছন্দ হয়েছে ভদ্রলোকের, নইলে দূর-দূর করে তাড়াতেন। সবকিছু শুনতে চাইতেন অন্য কারও কাছ থেকে। চেয়ারে ফিরে এলাম আমি।

'শুরু করো।'

এ-বাড়িতে পা দেবার পর থেকে যা-যা ঘটেছে, সব বলতে শুরু করলাম আমি। খুঁটিনাটি কিছুই বাদ দিলাম না। উহ্য রাখলাম শুধু মার্গারেটের প্রতি আমার অনুভূতির কথা; সেইসঙ্গে মি. করবেকের কাছে শোনা গল্পটা। রহস্যময় সমস্ত ঘটনার বর্ণনা দিলাম পুংখানুপুংখভাবে, মি. করবেকের বিষয়ে জানালাম—প্রদীপ নিয়ে ফিরে এসেছেন তিনি। ওগুলো কীভাবে হারাল, আর কীভাবে এই বাড়িতে আবার পাওয়া গেল—বললাম তা-ও।

শান্তভাবে সব শুনলেন মি. ট্রেলনি—ব্যাপারটা চমৎকৃত করল আমাকে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এমন শান্ত থাকা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। মাঝে মাঝে অবশ্য তাঁর চোখে উত্তেজনার ঝিলিক দেখলাম, দু-একবার বিড়বিড়ও করলেন কী যেন, তবে

সব মিলিয়ে চমৎকার আত্মনিয়ন্ত্রণের নমুনা দেখালেন তিনি। অদ্ভুত ঘটনাগুলোর ব্যাপারে তেমন উৎসাহী মনে হলো না মি. ট্রেলনিকে; ওগুলো যে ঘটবে, তা যেন আগে থেকেই জানতেন। তবে প্রদীপ হারানো আর ফিরে পাওয়ার কথা শুনে বেশ উত্তেজিত হলেন তিনি। মুখে বললেন না কিছু, কিন্তু বিছানার চাদর মুঠো করে ধরতে দেখলাম তাঁকে। একবারই তাঁকে চিন্তায় পড়তে দেখলাম—যখন সার্জেন্ট ড-র গুলি ছোঁড়ার ঘটনাটা বললাম।

গুলি লাগা কেবিনেটটার দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টি দিলেন তিনি। বিড় বিড় করে বললেন, 'গাধা কোথাকার! করেছেটা কী!'

মার্গারেটের কথাও বললাম আমি—ও কতটা দুশ্চিন্তা করছে, কীভাবে নাওয়া-খাওয়া ভুলে পিতার সেবা করছে—জানালাম তাঁকে। আগের মতই প্রতিক্রিয়াহীন রইলেন মি. ট্রেলনি, তবে অস্পষ্ট গলায় দু'বার মেয়ের নাম উচ্চারণ করলেন। আমার কথা শেষ হলো মার্গারেটের পার্কে যাবার খবর শোনানোর মাধ্যমে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন মি. ট্রেলনি এরপর। গম্ভীর হয়ে ভাবলেন কিছু, তারপর ফিরলেন আমার দিকে। বললেন, 'এবার তোমার সম্পর্কে বলো।'

'আ...আমার সম্পর্কে?'

'হ্যাঁ, তোমার ব্যাপারে সবকিছু জানতে চাই আমি।'

কান গরম হয়ে উঠল, ভদ্রলোক হঠাৎ আমার বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন কেন? এড়িয়ে যাবার উপায় দেখলাম না, মি. ট্রেলনি শান্ত চোখে জরিপ করতে শুরু করেছেন আমাকে। তাই অস্বস্তিবোধ দূর করে বললাম, 'আগেই বলেছি, সার, আমার নাম ম্যালকম রস। আমি একজন ব্যারিস্টার, গত বছর কুইন'স্ কাউন্সেল হিসেবে নিয়োগ পেয়েছি। নিজের পেশায় আমাকে মোটামুটি সফল বলতে পারেন।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকালেন মি. ট্রেলনি। 'তোমার সম্পর্কে আগেও শুনেছি আমি—ভাল ভাল কথাই বলেছে সবাই। মার্গারেটকে কীভাবে চেনো?'

'বেলগ্রেভ স্কয়্যারে কিছুদিন আগে প্রথম দেখা হয় আমাদের। আলাপ-পরিচয় থেকে ধীরে ধীরে বন্ধু হয়ে উঠেছি। জানেন কি না, জানি না—মার্গারেট খুবই একাকিত্বে ভোগে। কথা বলার মত একজন মানুষ প্রয়োজন ছিল ওর, আমাকে বেছে নিয়েছে। অন্য ধরনের একটা বিশ্বাস আর আস্থা সৃষ্টি হয়েছে আমাদের মধ্যে। মনের সমস্ত কথা আমাকে নির্দ্বিধায় খুলে বলতে পারে ও।'

কথাটা শুনে মি. ট্রেলনির ভুরু কুঁচকে গেল। তাড়াতাড়ি বললাম, 'নিশ্চিন্ত থাকুন, সার, অন্যায় বা অন্যায্য কোনও আলাপ করি না আমরা। আসলে... আপনাকে ও খুবই ভালবাসে, কিন্তু কাছে পায় না। বুকের মধ্যে এর ফলে যে-শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, সেটাই দূর করতে চায় আমার সান্নিধ্যে এসে। মনের বোঝা হালকা করতে চায়। বিশ্বাস করুন, আপনার বা অন্য কারও ব্যাপারে একটা খারাপ কথাও কোনোদিন বলেনি ও।'

মি. ট্রেলনির কুঞ্চিত ভুরু সোজা হয়ে গেল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ওর ব্যাপারে তোমার চিন্তা-ভাবনা কী, জানতে পারি?'

'সার, মার্গারেট একটি চমৎকার মেয়ে—সৎ, সুন্দরী, পরিষ্কার মনের মানুষ। ওর সান্নিধ্যটাই একটা বড় পাওয়া। অস্বীকার করব না, ওর জন্য দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে আমার মনে। তবে এ-কথার নিশ্চয়তা দিতে পারি, ওর বা ওর পরিবারের অমতে এক কদমও আগে বাড়ব না কোনোদিন।'

মনে হলো, কথাটা শুনে খুশি হয়েছেন মি. ট্রেলনি। বললেন, 'ম্যালকম রস, তোমাকে সাহসী এবং খাঁটি ভদ্রলোক

হিসেবে শুনেছি এতদিন; আজ বাস্তবেও প্রমাণ পেয়ে গেলাম। তোমার মত মানুষকে আমার মেয়ে বন্ধু হিসেবে পেয়েছে, এটা ওর অনেক বড় সৌভাগ্য। ভাল লাগল তোমার কথা শুনে। কিন্তু বাছা, এত লোক থাকতে তোমাকে এখানে আনল কেন ও?'

মনটা নাচতে শুরু করেছে আমার, মার্গারেটের বাবার মন জয় করাটা বিশাল একটা ব্যাপার। কোনোমতে আনন্দটা চাপা দিয়ে বললাম, 'আমাকে কাছের মানুষ ভাবতে শুরু করেছে ও, সার। ওকে বলেছিলাম, যে-কোনও বিপদ দেখলেই আমাকে খবর দিতে পারে... সবরকম সাহায্য করব। তাই সেদিন রাতে আপনি আহত হবার পর আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। এখানে আসার পর দেখলাম, পাহারার কাজে লোক লাগবে, তাই আর ফিরে যাইনি, রয়ে গেছি।'

'হুম! তো... এই ক'টা দিন কেমন কাটল?'

'সত্যি বলব, সার? উদ্বেগের মধ্যে ছিলাম আমরা সবাই, আতঙ্কের মধ্যে ছিলাম... তারপরও আমার সারা জীবনে গত কয়েকটা দিন ছিল সবচেয়ে সুখের... মার্গারেটের কাছাকাছি দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা থাকতে পেরেছি বলে!'

হালকা একটু হাসি ফুটল মি. ট্রেলনির ঠোঁটে। 'নাহ্, ভুল করিনি তোমার ব্যাপারে। সত্যি কথা বলবার সাহস আছে তোমার!' উদাস হয়ে গেলেন তিনি। 'মার্গারেটের মা বেঁচে থাকলে বড্ড ভাল হতো। তোমার কথা শুনে খুব খুশি হতো ও।'

জবাবে কোনও কথা খুঁজে পেলাম না।

আস্তে আস্তে আবার আমার চোখে চোখ রাখলেন মি. ট্রেলনি। 'যা বলেছ, তার ব্যাপারে তুমি কতটা নিশ্চিত?'

'পুরোপুরি, সার! মনের কথাই বলেছি আপনাকে।'

'না, না, তোমার কথা বলছি না। আমার কথা বলছি। আমাকে ভালবাসে মার্গারেট? কই, কখনও বলেনি তো! একটা

বছর হলো থাকছে এ-বাড়িতে... একা লাগলে সেটা আমাকে বলেনি কেন? তোমার উপর ওর যে বিশ্বাস আর আস্থা, তা আমার উপর তো দেখিনি কোনোদিন!' মি. ট্রেলনির কণ্ঠে দুঃখের সুর।

'কারণ আপনি ওকে সময় দিতে পারেননি,' বললাম আমি। 'তবে গত কয়েকটা দিনের ঘটনা যদি আপনাকে দেখানো যেত, তা হলে সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে যেত আপনার। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা আপনার সেবা করেছে ও, চোখের পানি ফেলেছে। মনের মধ্যে নিখাদ ভালবাসা না থাকলে এমন করতে পারে না কেউ।'

'কী আশ্চর্য!' বললেন মি. ট্রেলনি। 'আমি তো এর কিছুই জানতাম না। ভেবেছিলাম আমার প্রতি তেমন কোনও টান নেই ওর। জন্মের পর থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি ওকে, ভালবাসার দাবি করার সাহস পাইনি। কিন্তু তোমার কথা শুনে মনটা আনন্দে ভরে গেল, বাবা। ওর মা আমাকে যেমন ভালবাসত, তেমনি ও-ও বাসে... এটা জেনে কেমন যে লাগছে, তা বলে বোঝাতে পারব না।'

বুঝতে পারলাম, স্ত্রীকে অসম্ভব ভালবাসতেন ভদ্রলোক। সন্তানের ভালবাসার মাঝেও তাই স্ত্রীর কথা ভাবছেন। মায়া লাগল—পিতা-কন্যা... দু'জনই দুজনার ভালবাসার জন্য কাঙাল হয়ে ছিল এতদিন, অথচ কেউই তা প্রকাশ করতে পারেনি। মি. ট্রেলনিকে আপন মনে মেয়ের নাম উচ্চারণ করতে দেখলাম আবার।

একটু পরেই সচেতন হয়ে উঠলেন তিনি। আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ কত তারিখ?'

'বিশে জুলাই, সার,' জবাব দিলাম। 'ষোলো তারিখের রাতে আহত হয়েছিলেন আপনি।'

'হুম! তা হলে চার দিন ঘোরের ভিতর ছিলাম!' বললেন মি.

ট্রেলনি। 'তবে এমন ঘটনা এটাই প্রথম নয়, এমন একটা অদ্ভুত অবস্থার শিকার এর আগেও হয়েছি আমি... সেবার তিনদিনের জন্য। পরে কখনও সুযোগ হলে তোমাকে শোনাব সে-গল্প।'

ভাল লাগল কথাটা শুনে—উনি আমাকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন। গল্প শোনাবার আশ্বাস দিচ্ছেন সে-কারণেই।

'আমি উঠে পড়ি তা হলে,' বললেন মি. ট্রেলনি। 'বাইরে থেকে মার্গারেট ফিরে এলে ওকে আগেভাগেই জানিয়ে দিয়ো আমার খবর। এখানে ঢুকে চমকে যাবে নইলে। আর হ্যাঁ... করবেককে বলো, যত তাড়াতাড়ি পারে, আমার সঙ্গে যেন দেখা করে। প্রদীপগুলো দেখতে চাই আমি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে দরজার দিকে এগোলাম, কিন্তু বেরুবার আগেই পিছন থেকে ডাক শুনলাম আবার।

'রস, শুনে যাও।'

উল্টো ঘুরলাম। 'জী?'

চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করলেন মি. ট্রেলনি। 'বসো আরেকটু।' নির্দেশটা পালন করতেই তিনি বললেন, 'যাবার আগে কয়েকটা জিনিস তোমার সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া ভাল। মার্গারেট-বিষয়ক সবকিছুই আমার জন্য নতুন... আকস্মিক। ওর ব্যাপারে তাই ভালভাবে জেনে নেয়া দরকার, নইলে বাবা হিসেবে যেসব দায়িত্ব পালন করা দরকার, তা করতে পারব না।' একটু থামলেন তিনি। 'আচ্ছা, তোমার মনের কথা তো শুনলাম। যদি ধরে নিই, ভবিষ্যতে তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাইবে, সেটা ভুল হবে না নিশ্চয়ই?'

'জী না। আমি তো বেশ আগেই মনস্থির করে রেখেছি ও-ব্যাপারে। তবে একটু রয়ে-সয়ে এগোবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু পরিস্থিতির কারণে খুব দ্রুত পরস্পরের কাছাকাছি হয়ে পড়েছি আমরা। এই তো, আপনার সামনে বসে পর্যন্ত বিষয়টা আলোচনা

করছি! সব ঠিকঠাক থাকলে আরও অনেক পরে আমার দেখা পেতেন আপনি—মার্গারেটকে বিয়ের প্রস্তাব দেবার সময়... যখন আপনার অনুমতি নিতে আসতাম।"

'তারমানে এখনও প্রস্তাব দাওনি তুমি? ভালবাসার কথা বলোনি?'

'না, সার। মানসিকভাবে দুর্বল ও এখন; প্রস্তাব দিলে হয়তো গ্রহণ করত, ভালবাসার ডাকে সাড়া দিত... কিন্তু সেটার পিছনে কাজ করত কষ্ট ভাগাভাগির জন্য একজন সঙ্গী পাবার প্রয়োজনীয়তা। আমি তা চাই না। তাই এখনও আমরা শুধুই বন্ধু, আর কিছু নই।'

'শুনে খুশি হলাম, ম্যালকম রস। আশা করি এই সিদ্ধান্ত বজায় রাখবে তুমি—মার্গারেটকে আমি দেখার আগে, কিংবা আমার অনুমতি না পেয়ে তুমি বিষয়টা নিয়ে কিছু বলবে না ওকে।'

'আমি কথা দিচ্ছি।'

কাঁধ ঝাঁকালেন মি. ট্রেলনি। চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠেছে তাঁর। 'সময় ফুরিয়ে আসছে; অদ্ভুত, কিন্তু খুব জরুরি কিছু বিষয় নিয়ে ভাবতে হচ্ছে আমাকে, নষ্ট করবার মত একটা মিনিটও হাতে নেই। নইলে এত তাড়াতাড়ি... মানে তোমার সঙ্গে পরিচয় হতে না হতে মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলতাম না।'

'বুঝতে পেরেছি, সার। কথা দিচ্ছি, আপনার ইচ্ছেকে সম্মান দেখাব আমি।'

'ঠিক আছে, তুমি তা হলে যেতে পারো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে এলাম রুম থেকে, পিছনে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন মি. ট্রেলনি।

মি. ট্রেলনির সুস্থ হবার খবর শুনে প্রায় নাচতে শুরু করলেন মি.

boiRboi.net

করবেক। তবে একটু পরেই থেমে গেলেন তিনি, আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ওঁর কাছে শোনা রানী টেরার গল্পটা মি. ট্রেলনিকে বলে দিয়েছি কি না। মাথা নেড়ে আশ্বস্ত করলাম তাঁকে।

'বাঁচা গেল!' বড় করে শ্বাস ফেলে বললেন করবেক। 'দয়া করে বলবেন না কিছু। সময় হলে উনি নিজেই সব বলবেন আপনাকে। আপনি যে ঘটনাটা আগে থেকেই জানেন, সেটা প্রকাশ না করলে খুব খুশি হব।'

মৃদু হেসে রাজি হলাম প্রস্তাবটায়। এমনিতেও ব্যাপারটা মি. ট্রেলনির সামনে তোলার ইচ্ছে নেই আমার। কী বলতে কী বলে ফেলব... তারচেয়ে বাকসংযম বজায় রাখাই ভাল।

বাড়ির বাকিরা খবরটা নিল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। মিসেস গ্র্যান্ট প্রথমে কেঁদে ফেলল আবেগের বশে, তারপর ছুটে গেল মালিকের কী দরকার না-দরকার দেখবার জন্য। নার্স কেনেডি খবরটা শুনে একটু অবাক হলো, কিছুটা হতাশ-ও বোধহয়—কারণ রোগী সুস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে; এখান থেকে বাড়তি যে-রোজগারটা হচ্ছিল, তাও শেষ। তবে নিজেকে দ্রুত সামলে নিল সে। জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করল চলে যাবার জন্য।

সার্জেন্ট ড-কে স্টাডিতে ডেকে এনে আলাদাভাবে খবরটা শোনালাম আমি। নির্বিকার ভঙ্গিতে মি. ট্রেলনির জেগে ওঠার ব্যাপারটা শুনল সে, চেহারায় কোনও ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। আমার কথা শেষ হতেই জিজ্ঞেস করল, 'প্রথম হামলাটার ব্যাপারে কিছু বলতে পেরেছেন উনি? দ্বিতীয়টার কথা জানতে চাইছি না, কারণ তখন তো ভদ্রলোক অজ্ঞান ছিলেন।'

কথাটা শুনে থমকে গেলাম। তাই তো, ও-ব্যাপারে কথা বলিনি মি. ট্রেলনির সঙ্গে! ওঁকে গত চারদিনের ঘটনা শোনাবার

সময়ও কিছু জিজ্ঞেস করবার কথা মাথায় আসেনি।

'দুঃখিত,' বিব্রত কণ্ঠে বললাম। 'জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি।'

বিরক্তি ফুটল সার্জেন্টের চেহারায়। 'আপনাদের নিয়ে এই এক মুসিবত! লোকটা সুস্থ হলো তো সব ভুলে গেলেন। আরে, ওঁকে জিজ্ঞেস করতে হবে না, কীভাবে কী ঘটল? যাক গে, এ-নিয়ে মাথা গরম করে লাভ নেই। এখন ওটা মি. ট্রেলনির ব্যাপার... সুস্থ হয়ে গেছেন; যদি চান, হামলাদুটোর তদন্তের জন্য নিজেই থানায় অভিযোগ পেশ করতে পারবেন। তখন নাহয় আবার মাথা ঘামাব আমরা। সত্যি বলতে কী, কেসটা যদি এখানে খতম হয়ে যায়, তা হলে আমিও খুশি হই। এমন সব ব্যাখ্যার অতীত ঘটনা দেখেছি গত কয়েকদিন, আমার সাধারণ বিচারবুদ্ধিতে থই পাচ্ছিলাম না। এখন আবার নিত্যদিনের স্বাভাবিক চুরি-ডাকাতি আর খুন-জখমের মধ্যে ফিরে যেতে পারছি, এটাই ভাল। রহস্যটা যদি আপনি মি. ট্রেলনির মাধ্যমে ভেদ করতে পারেন, মি. রস, তা হলে সমাধানটা আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব। কারণ গত ক'দিনে আমি এটাই ভেবে পাচ্ছিলাম না, একটা বেড়ালের পক্ষে কীভাবে পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষকে বিছানা থেকে টেনে নামানো, কিংবা ওঁর হাতে ছুরি চালানো সম্ভব।'

কথা দিলাম, উত্তরটা জানতে পারলে অবশ্যই জানাব সার্জেন্টকে। ধন্যবাদ দিয়ে স্টাডি থেকে বেরিয়ে গেল ড।

মার্গারেট ফিরল তার খানিকক্ষণ পরে। হলঘরে ওর জন্য দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। কাছে এসে ও জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার? কোনও খবর আছে? বাবার অবস্থার কি উন্নতি হয়েছে?'

'হ্যাঁ,' বোকা বোকা কণ্ঠে বললাম। 'তুমি জানলে কী করে?'

'তোমার চেহারা দেখে।' মার্গারেটের কণ্ঠে ব্যস্ততা। 'চলো,

ওঁকে এখুনি দেখব।'

বাধা দিলাম ওকে। 'দাঁড়াও একটু। মি. ট্রেলনি কাপড় পাল্টাচ্ছেন। তৈরি হয়ে নিজেই খবর দেবেন বলেছেন।'

'কাপড় পাল্টাচ্ছে! খবর দেবে!' বিস্ময় ফুটল মার্গারেটের চেহারায়। 'বাবার কি জ্ঞান ফিরেছে?'

'হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সুস্থ উনি।'

ধপ করে পাশের একটা সোফায় বসে পড়ল মার্গারেট, চোখ দিয়ে আনন্দ আর স্বস্তির অশ্রু বেরুতে শুরু করেছে। ওর পাশে বসলাম আমি, পিঠে হাত রাখলাম। মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল ও, বোধহয় বুঝতে পারল আমার মনের কথা। পরম ভালবাসায় আমার হাতে হাত রাখল ও। ওর হাতের উল্টোপিঠে চুমো খেলাম। মুহূর্তটাকে মনে হলো ঈশ্বরের দেয়া! এতদিন ওকে একতরফাভাবে ভালবেসেছি আমি, কিন্তু আজ প্রমাণ পেলাম—একই অনভূতি কাজ করছে ওর ভিতরেও।

কথা বললাম না আমরা, বলার প্রয়োজনও নেই। কিছু বলতে গেলে বরং পরিবেশটা নষ্ট হবে, মনের ভাষা বোঝাবার মত কোনও শব্দ নেই পৃথিবীতে। হাতে হাত রেখে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম আমরা, তারপর উঠে দাঁড়ালাম। হাত ধরাধরি করে চলে গেলাম দোতলায়, ল্যাণ্ডিঙে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম মি. ট্রেলনির ডাক পাবার আশায়। এতক্ষণে মুখ খুললাম আমি—মার্গারেটকে খুলে বললাম, ওর বাবা কীভাবে জেগে উঠলেন।

খানিক পরেই ঘণ্টা বাজানো হলো রুমের ভিতর থেকে। আমাকে ছেড়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল মার্গারেট, মৃদু করাঘাত করল।

'কে?' ভারী কণ্ঠে প্রশ্ন করা হলো ভিতর থেকে।

'আমি, বাবা... মার্গারেট!' কাঁপা কাঁপা গলায় জবাব দিল

মার্গারেট।

ভিতর থেকে দ্রুত পায়ের শব্দ ভেসে এল, পরমুহূর্তে ঝট্ করে খুলে গেল পাল্লা। মি. ট্রেলনির বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল মার্গারেট, তিনিও ওকে জড়িয়ে ধরলেন।

'বাবা! বাবা!!'

'মার্গারেট! লক্ষ্মী মেয়ে আমার!!'

পিতা-কন্যার চোখে অশ্রু দেখতে পেলাম, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ঢুকে গেল ওরা কামরার ভিতর।

চোদ্দো

জন্মদাগ

ল্যাণ্ডিঙে একাকী দাঁড়িয়ে থাকলাম আমি অনেকক্ষণ। কী করব, বুঝতে পারছি না। জীবনে এই প্রথমবারের মত পিতা-কন্যা কাছে পেয়েছে পরস্পরকে, ওদের কিছুটা সময় দেয়া উচিত, তারপরও চলে যেতে পারলাম না। দাঁড়িয়ে থাকলাম, তবে খুব যে অসন্তোষ নিয়ে, তা নয়। বরং ভাল লাগছিল মার্গারেটের কথা ভেবে—অবশেষে বাবার স্নেহ আর ভালবাসার স্পর্শ পেয়েছে ও।

অনেকক্ষণ পর খুলে গেল দরজা। মি. ট্রেলনি ডাকলেন, 'ভিতরে এসো, রস।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ঢুকলাম কামরায়, পিছনে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলেন মি. ট্রেলনি। তারপর নিয়ে গেলেন মেয়ের কাছে।

বললেন, 'পরিস্থিতি যা বুঝতে পারছি, তাতে আমাদের ভিতর কোনও কিছু গোপন না থাকাই ভাল। ম্যালকম রস ইতোমধ্যে আমার সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে ফেলেছে। হয় ওকে এখানেই থামিয়ে বিদায় করে দেয়া দরকার, নয়তো শেষ পর্যন্ত সব বলে দেয়া উচিত। মার্গারেট, তুমি কী বলো? ওকে তোমার কবজিটা দেখাতে চাও?'

বাবার চোখের দিকে এক পলক তাকিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল মার্গারেট। জামার হাতা সরিয়ে উঁচু করল ডান হাত। বেলগ্রেভের নাচের আসরে ডানাঅলা অ্যান্টিক যে-ব্রেসলেটটা দেখেছিলাম, সেটা পরে থাকে ও সবসময়; হাত তুলতেই ওটা সরসর করে নেমে গেল কনুইয়ের দিকে, উন্মুক্ত হয়ে পড়ল কবজিটা। ওদিকে তাকাতেই আমার শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল একটা স্রোত নেমে গেল।

সরু একটা লাল রেখা দেখা যাচ্ছে মার্গারেটের কবজির কাছটায়—ওটা একটা জন্মদাগ, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে যেন কোনোকালে কেটে নেয়া হয়েছিল কবজিটা, লাল দাগটা শুকিয়ে যাওয়া রক্তের। ভীত দৃষ্টিতে ক্রিস্টালের ডিসপ্লেটার দিকে তাকালাম আমি।

আমার প্রতিক্রিয়া দেখে মৃদু হাসলেন মি. ট্রেলনি। 'হুম, করবেক তা হলে সব বলে দিয়েছে তোমাকে?'

'জী,' ঢোঁক গিলে স্বীকার করলাম। 'তবে সেটা শুধু আপনার ভালর জন্য। আপনার অসুস্থতার কারণ খুঁজছিলাম আমরা।'

'ভয়ের কিছু নেই,' বললেন মি. ট্রেলনি। 'আমি কিছু মনে করিনি। করবেক বরং ভাল করেছে তোমাকে সব খুলে বলে। এখন সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধে হবে তোমার।'

'সিদ্ধান্ত!'

'দাগটা তো দেখলে। আমার মেয়ের ব্যাপারে এখন কি

দ্বিতীয় কোনও চিন্তা খেলছে না তোমার মাথায়?'

মুখ ঘুরিয়ে মার্গারেটের দিকে তাকালাম। গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ও, অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে আমার দিকে। মনের ভিতরটা পড়ে নিচ্ছে। কোনও ধরনের দ্বিধা নেই ওর মধ্যে। শুদ্ধ, পবিত্র হৃদয়; আত্মবিশ্বাস; আর পুরনো আমলের এক রানীর আভিজাত্য বিরাজ করছে ওর অবয়বে।

'কী ভাবছ?' জানতে চাইলেন মি. ট্রেলনি।

জবাবটা মুখে দিলাম না। এগিয়ে গিয়ে মার্গারেটের হাত ধরলাম, হাঁটু গেড়ে চুমো খেলাম হাতের উল্টোপিঠে। তারপর তাকালাম ওর বাবার দিকে। 'এটাই আমার জবাব, সার।'

মি. ট্রেলনির মুখে একটা আনন্দের ছাপ ফুটল। আমাকে দাঁড় করিয়ে তিনি বললেন, 'ভাল!'

ঠিক তখুনি দরজায় টোকা পড়ল। অনুমতি দিতেই মি. করবেক এসে ঢুকলেন ভিতরে। প্রায় ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন মি. ট্রেলনি, হাত মেলালেন। হাবভাবে উচ্ছ্বাস চাপা দিতে পারছেন না।

'শুনলাম প্রদীপগুলো খুঁজে পেয়েছ?' উত্তেজিত ভঙ্গিতে বললেন তিনি। 'আমার অনুমান তা হলে ঠিক ছিল? চলো... লাইব্রেরিতে চলো। একান্তে সব শুনতে চাই আমি। প্রদীপগুলো দেখতেও চাই। কোথায় ওগুলো?'

'নিরাপদে আছে,' জানালেন করবেক। 'চাবি মি. রসের কাছে।'

'নিয়ে এসো, রস!' বললেন মি. ট্রেলনি। 'আমার আর তর সইছে না।'

দুই মিশরপ্রেমী গিয়ে ঢুকলেন লাইব্রেরিতে, সঙ্গে মার্গারেট। আমি চলে গেলাম চ্যান্সারি লেনে... আমার ব্যাঙ্কে। সেফটি ডিপোজিট বক্স থেকে দ্বিতীয় চাবিটা নিয়ে আসার জন্য।

যখন ফিরলাম, তখনও কথা শেষ হয়নি ওঁদের। দেখলাম ডা. উইনচেস্টার এসে পড়েছেন ইতোমধ্যে, তিনিও যোগ দিয়েছেন লাইব্রেরিতে। প্রদীপগুলো সেফ থেকে বের করে আনলাম, তার খানিক পরেই আলোচনা শেষ হলো।

মি. ট্রেলনির চেহারায় সন্তোষ ফুটতে দেখলাম, তাঁর অজ্ঞান থাকার সময়টাতে চিঠিতে লেখা সব নির্দেশ মার্গারেট অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে বলে। বললেন, 'বুঝতে পারছি, ঘটনাটার শেষটা জানতে মুখিয়ে আছেন সবাই। বলব... সবই বলব। তবে এখন নয়। আসুন, রাতের খাওয়া সেরে বিশ্রাম নিই। রাতটা ভাবতে হবে আমাকে। আগামীকাল খুলে বলব সব।'

ডিনারশেষে চলে গেলেন ডাক্তার। করবেকও ফিরে গেলেন তাঁর হোটেলে। আমাকে ডেকে মি. ট্রেলনি বললেন, 'তুমিও বাড়ি চলে যাও, রস। আজ রাতে আমি মার্গারেটের সঙ্গে একা থাকতে চাই। ওর সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার, সেটা একান্তে হলে ভাল হয়।'

ভদ্রলোকের মনোভাব বুঝতে পারলাম, কিন্তু গত কয়েকদিনের অভিজ্ঞতা ভুলতে পারছি না। তাই বললাম, 'চলে যাব? কিন্তু আবার যদি কোনও বিপদ হয় আপনার?'

'কিচ্ছু হবে না, ম্যালকম,' অদ্ভুত দৃঢ়তার সঙ্গে বলে উঠল মার্গারেট। 'আমি বাবার সঙ্গে থাকব।'

এরপর আর কিছু বলা চলে না, চলে যাবার প্রস্তুতি নিলাম।

'কাল সকালে তাড়াতাড়ি চলে এসো।' বললেন মি. ট্রেলনি। 'ব্রেকফাস্টটা এখানেই কোরো। তারপর কথা বলব তোমার সঙ্গে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হলাম। মার্গারেটের সঙ্গে আমাকে রেখে চলে গেলেন মি. ট্রেলনি।

পরস্পরের চোখে চোখ রেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম

BanglaBook.org

আমরা, তারপর মার্গারেটের হাতে চুমো খেলাম। ও জড়িয়ে ধরল আমাকে, প্রথমবারের মত আমাদের দুটো ঠোঁট মিলিত হলো। বিদায় নিলাম ওর কাছ থেকে।

সে-রাতে ঘুম হলো না আমার, বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করলাম শুধু। আনন্দ আর উদ্বেগের মত বিপরীতমুখী দুটি অনুভূতি কাজ করছিল আমার ভিতর... দুটোই মার্গারেটের কথা ভেবে। ফলে নিদ্রাদেবী ধারেকাছে ঘেঁষার সুযোগ পেলেন না। এটা-সেটা নানান চিন্তায় সময়টা কেটেও গেল খুব দ্রুত, কিছু বুঝে ওঠার আগেই জানালায় ভোরের আলো খেলা করতে দেখলাম।

ন'টা বাজার আগেই হাজির হয়ে গেলাম কেনসিংটনে। মার্গারেটের দেখা পেতেই সমস্ত উদ্বেগ কর্পূরের মত উবে গেল। চেহারায় গোলাপি আভা ফিরে এসেছে ওর, আচার-আচরণ একেবারে শান্ত ও স্বাভাবিক। ওর কাছে শুনলাম, রাতে শান্তিতে ঘুমিয়েছেন মি. ট্রেলনি—খুব শীঘ্রি আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দেবেন।

'আমার ধারণা,' কানের কাছে ফিসফিসাল মার্গারেট, 'বাবা ইচ্ছে করেই দেরি করছে, যাতে আমরা একান্তে কিছুটা সময় কাটাতে পারি।'

হাসলাম কথাটা শুনে।

ব্রেকফাস্ট শেষে আমাদেরকে স্টাডিতে নিয়ে গেলেন মি. ট্রেলনি। বললেন, 'কাল রাতে মার্গারেটের সঙ্গে কথা বলব বলেছিলাম। রস, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, সেটা তোমার আর ওর বিষয়ে?'

'জী, সার।' স্বীকার করলাম।

'ঠিকই ধরেছ, বাছা। কথা বলেছি ওর সঙ্গে, ওর মতামতটাও

জানতে পেরেছি।' হাসলেন মি. ট্রেলনি। মার্গারেটের দিকে তাকাতেই মুখে লজ্জার হাসি দেখতে পেলাম। 'বসো তোমরা।'

হাত ধরাধরি করে পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসলাম আমরা। মুখোমুখি বসে কথা বলতে শুরু করলেন মি. ট্রেলনি। তাঁর কণ্ঠে একটু ইতস্তত ভাব লক্ষ করলাম, সম্ভবত নার্ভাসনেসে ভুগছেন... ব্যাপারটা বেশ অবাক করল আমাকে।

'বিশেষ ওই মমিটা সম্পর্কে আমার অভিযানের সমস্ত বিবরণই শুনেছ তুমি, রস; হয়তো বা আমার থিয়োরিগুলোও আঁচ করতে পারছ,' বললেন মি. ট্রেলনি। 'ওগুলো পরে আমি ব্যাখ্যা করব। তবে এখন অন্য একটা বিষয়ে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই। ওটা নিয়ে মার্গারেটের সঙ্গে কিছুতেই একমত হতে পারছি না। হয়েছে কী... আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট চালাতে যাচ্ছি; ওটা আমার বিশ বছরের সাধনার চূড়ান্ত ফসল বলতে পারো। আমার গবেষণার সাফল্য-ব্যর্থতা... ওটার মাধ্যমেই প্রমাণিত হবে। যদি সফল হই, তা হলে এমন সব জিনিস জানতে পারব, যা কয়েক হাজার বছর ধরে মানুষের দৃষ্টিসীমা এবং জ্ঞানের পরিধি থেকে আড়াল হয়ে আছে। কিন্তু সমস্যা হলো, পরীক্ষাটার সঙ্গে বিপদ জড়িয়ে আছে... বড় ধরনের বিপদ; সেটার ধরনটা আমার একেবারেই অজানা। তাই মার্গারেটকে ওই সময় আমি কাছে রাখতে চাই না। নিজের জন্য ভয় করি না, কিন্তু ওকে আমি কিছুতেই ঝুঁকিতে ফেলতে পারব না। জীবনে এই প্রথমবারের মত সুখের সন্ধান পেয়েছে ও, এখন যদি...। দেখো না, ও আমার কথা শুনতেই চাইছে না! আমার ভয় করছে, ওর মায়ের মত না ওকেও হারাতে হয়...'

আবেগের উচ্ছ্বাসে থেমে গেলেন মি. ট্রেলনি। মার্গারেট উঠে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'বাবা! মা তোমাকে কত ভালবাসত, তা তুমিই তো আমাকে বলেছ! নিজের কথা ভাবেনি,

তোমাকে উৎসাহ জুগিয়েছে, মিশরে হাজারটা বিপদের মাঝে যেতে দিয়েছে... তুমিই বলো, মা যদি আজ বেঁচে থাকত, তা হলে কি বিপদের ভয়ে তোমার পাশ ছেড়ে যেত? ওঁর মেয়ে হয়ে আমি কীভাবে সে-কাজ করি?'

জবাব দিতে পারলেন না মি. ট্রেলনি। আমার দিকে তাকাল মার্গারেট। বলল, 'ম্যালকম, তুমি জানো—আমি তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু ভালবাসার মানে হচ্ছে বিশ্বাস—সেটা দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ, সুখ... সব সময়েই। তাই আমার পাশে চাই তোমাকে, একসঙ্গে ওই বিপদ মোকাবেলা করব আমরা—সফল হলে একসঙ্গে হবো, ব্যর্থ হলেও একসঙ্গে! দরকার হলে মৃত্যুকে বরণ করে নেব—আমার হবু-স্বামীর কাছে এটাই আমার চাওয়া। তুমিই বলো, আমি যা চাইছি, তা কি ভুল?'

কথাটা শুনে ওর প্রতি ভালবাসা বেড়ে গেল আরও। উঠে গিয়ে হাত ধরলাম ওর। মি. ট্রেলনির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'সার, এই বিষয়টাতে মার্গারেটের সঙ্গে আমি একমত।'

উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের দুজনেরই হাত চেপে ধরলেন মি. ট্রেলনি। 'আমি জানতাম! মার্গারেটের মা-ও একই কাজ করত!'

চোখে অশ্রু দেখতে পেলাম ওঁর।

ডা. উইনচেস্টার আর মি. করবেককে সময় দেয়া ছিল, ঠিকমতই হাজির হয়ে গেলেন তাঁরা। লাইব্রেরিতে গিয়ে মিটিঙে বসলাম সবাই। প্রত্যেকের চেহারা গম্ভীর হয়ে আছে—গত কয়েকদিনের অদ্ভুত ঘটনাপ্রবাহ, সেই সঙ্গে অনাগত ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছি সবাই।

জানালার কাছে একটা বড় আর্মচেয়ারে বসেছেন মি. ট্রেলনি, আমরা তাঁকে ঘিরে বসলাম। মার্গারেট বসল বাবার বাঁয়ে, করবেক ডানে, আমি আর ডাক্তার মুখোমুখি।

করবেককে জিজ্ঞেস করলেন মি. ট্রেলনি, 'ডাক্তারকে মমি সংক্রান্ত সব ঘটনা জানিয়েছ?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন করবেক। 'আসার পথে বলেছি।'

'গুড। আমিও সব জানিয়েছি মার্গারেটকে। আমরা সবাই তা হলে ব্যাপারটা সম্পর্কে অবগত।' ডাক্তারের দিকে তাকালেন মি. ট্রেলনি। 'উইনচেস্টার, সব তো শুনেছ। বিপদ হতে পারে, এক্সপেরিমেন্টটাতে অংশ নিতে তোমার কোনও আপত্তি নেই তো?'

'মোটেই না,' পরিষ্কার গলায় বললেন ডাক্তার। 'এমনিতেই ঘটনার শেষ দেখব বলে ঠিক করেছিলাম, সব শোনার পর এখন তো আগ্রহ বেড়ে গেছে আরও। কিছুতেই এই সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি নই। বিজ্ঞানের লোক আমি, তা ছাড়া কোনও পিছুটানও নেই। বিপদ-টিপদের ভয় করি না, আমি আপনার সঙ্গে আছি।'

'শুনে খুশি হলাম। করবেকের মতামত নেবার প্রয়োজন নেই, ও বহু বছর ধরে আমার সঙ্গে আছে; জানে কী করতে চাই আমি। মার্গারেট আর রসও আমাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছে।' একটু থামলেন মি. ট্রেলনি, কথা গুছিয়ে নিলেন, তারপর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন। সতর্ক ভাবে কথা বললেন তিনি, শব্দ বাছলেন চিন্তা-ভাবনা করে; মাথায় রাখলেন, যে-বিষয়ে তিনি কথা বলছেন, সেটা আমাদের জন্য একেবারেই নতুন।

'যে-এক্সপেরিমেন্ট, মানে পরীক্ষাটা আমি করতে যাচ্ছি, তার উদ্দেশ্য হলো—পুরনো আমলের জাদুবিদ্যার সত্যিই কোনও শক্তি, বা বাস্তব ভিত্তি আছে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখা। পরিবেশ-পরিস্থিতি এখন আমাদের অনুকূলে আছে, মূল নকশায় যেভাবে সব করতে বলা হয়েছে, তা মোটামুটিভাবে অনুসরণ

করতে পারব বলে আশা করছি। অতিপ্রাকৃত একটা শক্তিকে জাগিয়ে তুলব আমরা, সফল হব কি না জানি না, তবে শক্তিটা আজও টিকে আছে বলে বিশ্বাস করি আমি—আমরা সেটাকে দেখতে পাই, বা না-ই পাই...'

'কীসের কথা বলছেন, একটু পরিষ্কার করে বলবেন?' বাধা দিয়ে প্রশ্ন করলেন ডা. উইনচেস্টার।

'নিশ্চয়ই!' বললেন মি. ট্রেলনি। 'রানী টেরাকে আবার জাগিয়ে তোলার কথা বলছি। ওর নিজেরও সে-ইচ্ছেই ছিল—বহু বছর পর আবার জীবন ফিরে পাবার। সেজন্য সব প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল ও, আমরা সেটাই পরীক্ষা করে দেখব।'

বিস্ময়ে কথা হারালাম আমরা। ব্যাপারটা যে অল্প-সল্প সন্দেহ করিনি, তা নয়। কিন্তু এখন মি. ট্রেলনির মুখে সরাসরি শুনতে পেয়ে চমকে গেলাম সবাই।

ডা. উইনচেস্টার থতমত খেয়ে বললেন, 'কী বলছেন, সার? এ... এ তো অসম্ভব!'

হাসলেন মি. ট্রেলনি। 'কোনোকিছুই আসলে অসম্ভব নয়। বাইবেলের কথা জানি আমরা, মনগড়া গল্পগাথা নয় ওটা। ওখানে বলা আছে, একজন মানুষের নির্দেশে সূর্য উঠত-ডুবত; পশুপাখির সঙ্গে অনেকে কথা বলতে পারত; রাজা সলের ইচ্ছেয় এনডরের ডাইনি পয়গম্বর স্যামুয়েলের আত্মাকে ডেকে তুলেছিল... এসব ঘটনাকে যদি সত্যি বলে মেনে নিই, তা হলে পৃথিবীতে অতিপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্বকে মেনে নেব না কেন?

'মিশরের রানী টেরাও ওদের মতই একজন ছিল বলে আমার বিশ্বাস—জাদুকর, বা ডাইনিদের মত একটি বাহন, মানে পশু রাখত সে সবসময়, হায়ারোগ্লিফে রানীকে অসাধারণ ক্ষমতাধর বলে বর্ণনা করা হয়েছে... দেবতাদের উপর হুকুমজারি করতে পারত... এসব খুব একটা অতি-বর্ণনা বলে মনে হয় না আমার।

যদি তা-ই হতো, তা হলে ওর মৃত্যুর পর মিশরীয় পুরোহিতরা রানীর নাম-নিশানা মুছে ফেলতে এত তৎপর হতো না। এত নিখুঁতভাবে ওরা কাজটা করেছে যে, আমাদের জানাশোনা প্রাচীন কোনও ইতিহাসেই টেরার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে শুধু এসব যুক্তির কারণেই নয়, আমি ব্যাপারটা বিশ্বাস করেছি চাক্ষুষ আরেকটা প্রমাণ দেখে। আগের আমলের জাদুকর এবং ডাইনিরা মৃত্যুর পরও তাদের বাহনটিকে সঙ্গে রাখত... তেমন একটা পশু আমরা খুঁজে পেয়েছি টেরার সমাধিতে, ওটার শক্তির প্রমাণ পেয়েছি! পশুটা কী, কেউ আন্দাজ করতে পারো?'

কপালে ভাঁজ পড়ল আমার, কিন্তু ডা. উইনচেস্টার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'বেড়াল! মমি-বেড়ালটার কথা বলছেন আপনি!'

'ঠিক ধরেছ, ওটাই ছিল রানী টেরার বাহন। মমি করে বেড়ালটাকে তাই দিয়ে দিয়ে দেয়া হয়েছিল সারকোফাগাসের ভিতর। ওটাই হামলা করেছিল আমাকে, কবজিতে আঁচড় বসিয়েছিল!'

'সিলভিও তা হলে নির্দোষ?' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মার্গারেট।

মাথা ঝাঁকালেন মি. ট্রেলনি। 'রানী টেরা ছিল দূরদর্শী মহিলা। নিজের সময়ের চাইতেও অনেক এগিয়ে ছিল সে। মিশরীয় সভ্যতা ও ধর্মের দুর্বলতাগুলো ধরতে পেরেছিল, তাই প্রস্তুতি নিয়েছিল নতুন একটা সমাজ-সভ্যতায় আত্মপ্রকাশ করবার। উত্তর দিকের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা ছিল ওর এবং এর পিছনে একটা বিশেষ কারণও ছিল। হায়ারোগ্লিফে বলা হয়েছে, ওর জন্মের সময় উত্তরের আকাশে জ্বলজ্বল করছিল সপ্তর্ষির সাতটা তারা; একটা উল্কাপিণ্ড আছড়ে পড়েছিল মিশরের বুকে। সবার ধারণা, ওটা ছিল সপ্তর্ষির তরফ থেকে টেরার জন্মের

উপহার। উল্কাটার কেন্দ্রে ছিল নিখাদ রুবি, ওটাই কেটে সপ্তর্ষির রত্নটা তৈরি করা হয়; বাকি অংশটা দিয়ে তৈরি করা হয় সপ্তভুজ আকারের ওই বাক্সটা। রুবিটা ছিল টেরার তালিসমান... তার সৌভাগ্যের প্রতীক। ওর সমস্ত চিন্তা-চেতনা ছিল ওটাকে ঘিরে। সাত ছিল ওর সৌভাগ্যের সংখ্যা... সেটাই স্বাভাবিক। একটা হাত আর একটা পায়ে সাত আঙুল, সাতটা তারার অদ্ভুত রত্ন, জন্মের সময় আকাশে সাতটা তারার উপস্থিতি... এগুলো এমনিতেই যথেষ্ট অদ্ভুত ব্যাপার। এতকিছুর পর সংখ্যাটার প্রতি কেউ যদি আকৃষ্ট না হয়—সেটাই বরং বিস্ময়ের ব্যাপার। এ ছাড়াও... সমাধিতে পাওয়া প্রস্তরখণ্ডের বিবরণ বলছে, বছরের সপ্তম মাসে জন্ম হয়েছিল টেরার—ওই মাসটাতে নীল নদে প্লাবন শুরু হয়। প্রতি মাসে একজন করে দেবদেবী প্রাধান্য পায়, ওই মাসটা ছিল হ্যাথরের। সৌন্দর্য, আনন্দ আর পুনরুত্থানের দেবী... সাতটা রূপ যার! সপ্তম মাসটা আমাদের হিসেবে শুরু হয় আটাশে অক্টোবর, শেষ হয় সাতাশে নভেম্বরে। জ্যোতির্বিদ্যায় হিসেব করে দেখেছি আমি, সপ্তম দিনটাতে সপ্তর্ষিমণ্ডল উদয় হয় আকাশে।

'এতক্ষণ যা বললাম, তার সারমর্ম হচ্ছে—অদ্ভুত একটা উপায়ে রানী টেরার জীবনে "সাত" সংখ্যাটা বিরাজ করছিল। আকাশের সাত তারা, সপ্তম মাস, দেবীর সাতটা রূপ, হাতে-পায়ে সাতটা আঙুল... এতসব জিনিস আর যা-ই হোক কাকতালীয় হতে পারে না। আর এই সংখ্যা, বা সংখ্যাটার সঙ্গে জড়িত জিনিসগুলো যদি রানীর জাদুর ভিত্তি হয়ে থাকে, তা হলে বলতেই হবে—অত্যন্ত শক্ত একটা ভিত্তি পেয়েছিল সে।

'আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে আমাদের, এই মহিলা সে-আমলের সব ধরনের বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিল। ওর বাবাই সেটা নিশ্চিত করেছে, কারণ লোকটা জানত—মেয়েকে রাজ্যের

ধর্মীয় গোঁড়ামির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। প্রাচীন মিশর ছিল জ্যোতির্বিদ্যা এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের সূতিকাগার, এই দুটো বিষয়ে প্রচুর উন্নতি করেছিল ওরা; জ্যোর্তিবিদ্যায় ভর করেই বিকাশ ঘটেছিল জ্যোতিষশাস্ত্রের। জ্যোতিষীদের কথাবার্তাকে আমরা যতই অবিশ্বাস করি না কেন, ওদের শাস্ত্রের একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকা অসম্ভব নয়। প্রাচীন মিশরীয়রা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অনেক এগিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সময়ের পরিক্রমায় আমরা সে-সব অমূল্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি। উদাহরণ হিসেবে অ্যাকুস্টিক্স, বা শব্দ-বিজ্ঞানের কথা বলতে পারি। কারনাক আর লুক্সরের পিরামিডের মত আরও বহু জায়গায় ওটার প্রয়োগ লক্ষ করেছি আমরা, কিন্তু একটারও রহস্য আজ পর্যন্ত ভেদ করতে পারিনি। তাই ধরে নিতে ক্ষতি নেই, প্রাচীন ওই মানুষগুলো এমন অনেক শক্তির ব্যবহার জানত, যা আমাদের কাছে উদ্ভট কল্পনা বলে মনে হতে পারে। এই বিষয়ে আমি পরে আরও বিস্তারিত বলব।

'এবার আসি রানী টেরার জাদুর বাক্সটার ব্যাপারে। ওটা একটা বিরাট বিস্ময় ছাড়া আর কিছু নয়। সত্যিই হয়তো অজানা কোনও শক্তিকে বন্দি করে রাখা হয়েছে ভিতরে। ওটা আমরা খুলতে পারিনি, কারণ ডালাটা ভিতর থেকে বন্ধ। কিন্তু বন্ধ করাটা হলো কীভাবে? নিরেট পাথরে তৈরি ওটা, ডালাটাও তাই... এত নিখুঁতভাবে ওটা কীভাবে বন্ধ করা সম্ভব? আমরা পাতলা এক টুকরো লোহাও ঢোকাতে পারছি না ওর ভিতর, চাড় দিতে পারছি না! ঘোলাটে অংশগুলোও একটা বিরাট রহস্য, ঠিক সপ্তর্ষিমণ্ডলের সঙ্গে মিল রেখে কীভাবে বসানো হলো ওগুলো? ওগুলো পরে লাগানো হয়নি, মূল পাথরেরই অংশ... ব্যাপারটা অদ্ভুত নয়? আলো পড়লে কেন ভিতর থেকে আভা বেরুচ্ছে ওটার? জবাব নেই কোনও, তবে একটা ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে,

ওই বাক্সটা একটা বৈজ্ঞানিক বিস্ময়—ওটা খোলা গেলে আমরা আমাদের চিন্তার বাইরে কিছু একটার সন্ধান পাবো। খোলার জন্য আলোরও ভূমিকা আছে নিশ্চয়ই। নির্দিষ্ট কোনও তরঙ্গে, বা ছন্দে হয়তো আলো ফেলতে হবে ঘোলাটে অংশগুলোর উপর; সেটা আমরা জানি না বলেই খুলতে পারছি না বাক্সটা।

'পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যা এবং জ্যোতিষশাস্ত্র ছাড়াও আরও একটা ব্যাপার জড়িয়ে আছে—তা হলো ভেষজশাস্ত্র। এই বিশেষ মমি, কিংবা জাদুর বাক্সটার আশপাশে গেলেই মানুষ চেতনা হারাচ্ছে... এটার পিছনে ভেষজ কোনও দ্রব্য ছাড়া অন্য কিছুর হাত থাকতে পারে না। গবেষণায় দেখা গেছে, মিশরীয়রা গাছ-গাছড়ার ব্যাপারে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ছিল, ভেষজ বিষয়ে তাদের জ্ঞান ছিল সীমাহীন। সেই জ্ঞানেরই প্রয়োগ এখানে করা হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। আজকাল আমরাও আধুনিক ওষুধের সাহায্যে মানুষকে অজ্ঞান করতে পারি, এক্ষেত্রে তেমনই কিছু ঘটছে বলে আমার বিশ্বাস...'

'এক মিনিট, সার,' বাধা দিয়ে বলে উঠলেন ডাক্তার। 'আপনার এই ব্যাখ্যায় একটা খুঁত আছে। ড্রাগ-ট্রাগ যা-ই বলুন, ওটা কিন্তু সারাক্ষণ কাজ করছে না। মি. করবেকের কাছে আমি শুনেছি, প্রথমবার আপনারা যখন ওই সমাধিতে গেলেন, তখন কিছু হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয়বার যেতেই তিনদিনের জন্য চেতনা হারালেন। এখানকার কথাই ধরুন—বছরের পর বছর অ্যান্টিকগুলো নিয়ে কাটিয়েছেন আপনি, অথচ অজ্ঞান হলেন মাত্র চারদিন আগে! ড্রাগ হলে সবসময় একই প্রভাব কাজ করত, ব্যতিক্রম পাওয়া যেত না। যেভাবে অজ্ঞান করার কাজটা করা হচ্ছে, তাতে তো মনে হয়, বুদ্ধিসম্পন্ন একটা কিছু কাজ করছে এখানে; ড্রাগ-ট্রাগ যদি ব্যবহার করেই থাকে, সেটা করছে সময়-সুযোগ বুঝে।'

'ঠিকই ধরেছ, বুদ্ধিসম্পন্ন একটা শক্তিই কাজ করছে এখানে,' বললেন মি. ট্রেলনি। 'সম্মোহনের সাহায্য নিচ্ছে সে।'

'এই শক্তি কোথায় অবস্থান করছে, সেটা বলতে পারেন?' উত্তেজনায় সামনে ঝুঁকলেন ডাক্তার।

শান্ত স্বরে মি. ট্রেলনি জানালেন, 'রানী টেরার মমিতে। সে-প্রসঙ্গে আসছি একটু পরেই। তবে আগে পিছনের সবকিছু পরিষ্কার করে নিই। বাক্সটার কথা বলছিলাম... ওটা একটা বিশেষ উপলক্ষের জন্য তৈরি করা হয়েছে। সমাধির সবকিছুই তৈরি করা হয়েছে ওই একই কারণে। পাহাড়ের একশো ফুট উঁচুতে সাপ-খোপ বা কাঁকড়া-বিছের ভয়ে সমাধি তৈরি করেনি টেরা। তার সমস্ত সতর্কতা ছিল মানুষের বিরুদ্ধে... মিশরীয় পুরোহিতদের বিরুদ্ধে। লোকগুলো যদি ওর সত্যিকার উদ্দেশ্য জেনে ফেলে, তা হলে বাধা দেয়ার জন্য উঠেপড়ে লাগবে... এটা ভেবে। প্রাচীন মিশরীয়রা পুনরুত্থানে বিশ্বাস করত, কিন্তু ওদের চেয়ে এক কাঠি বাড়া ছিল টেরা। পরজগতে নয়, এই পৃথিবীতেই রক্তমাংস নিয়ে দ্বিতীয়বার জেগে উঠবার স্বপ্ন ছিল ওর—সমাধির দেয়ালচিত্রগুলো তেমনই আভাস দেয়। ব্যাপারটা জানা ছিল পুরোহিতদের, সেটা ওদের ক্রোধ আরও বাড়িয়ে দেয়। ধর্মবিরোধী হিসেবে ওরা চিহ্নিত করে রানীকে, ওর মৃত্যুর পর নাম-নিশানা মুছে দেয়। তবে এর জন্য তৈরি ছিল টেরা, সমাধিতে পুনরুত্থানের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু রেখে দিয়েছিল সে। বিশাল সারকোফাগাসটাতে মমি ছাড়াও নিজের বাহন আর সপ্তভুজ বাক্সটা রাখার ব্যবস্থা করে। দেয়ালে হায়ারোগ্লিফের মাধ্যমে লিখে রেখে যায় সবকিছু, যাতে তার অনুসারীরা ওই লেখার মর্মোদ্ধার করতে পারে। মৃত্যুর পরও মৌলিক শক্তিগুলোর উপর প্রভাব বজায় রাখার ব্যবস্থা করে—খোলা হাতটা বায়ুকে, রত্ন-পাথরটা আগুনকে, দুই পা মাটি আর

পানিকে নিয়ন্ত্রণ করত... মমির আবরণে লিখে রাখা কথাগুলোই এর সাক্ষ্য। রত্ন-পাথরটার ব্যাপারে পরে বলছি, আপাতত সমাধির ব্যাপারটা শেষ করি। কবরচোর, এবং হানাদারদের হাত থেকে সমস্ত জিনিস রক্ষার জন্য বিশেষ কিছু ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল ওখানে। বিশেষ ওই প্রদীপগুলো ছাড়া খোলা সম্ভব নয় সপ্তভুজ বাক্সটা। প্রদীপগুলো লুকিয়ে রাখা হয়েছে দেয়ালের ভিতর একটা গুপ্ত-কুলুঙ্গিতে। ওটাতে আবার যে-সে হাত দিতে পারবে না, দিলেই তলোয়ার হাতে ওই মূর্তিটার হাতে খুন হয়ে যাবে। শুধুমাত্র সত্যিকারের জ্ঞানীরাই নিরাপদে বের করতে পারবে ওগুলো।

'সাধারণ আর দশটা সমাধির চেয়ে আরও একটা ব্যতিক্রম দেখেছি আমরা টেরার কবরে। মমি-পিটটার কথা বলছি, ওটার মুখ বন্ধ ছিল না। এর পিছনে একটাই কারণ থাকতে পারে, পুনরুত্থানের পর সে যেন সহজে ওখান থেকে বেরুতে পারে, তার জন্যই খোলা রাখা হয়েছিল ওটা। জেগে ওঠার পর যত ধরনের জিনিস দরকার হতে পারে তার, সেগুলো সবই রাখা হয়েছে সমাধি জুড়ে—আমরা দেখেছি ওগুলো। এমনকী প্রবেশ পথের কাছে যে শেকলটা রয়েছে, সেটাও সম্ভবত পাহাড় থেকে নামার জন্য রাখা হয়েছিল। দড়ি রাখা হয়নি, কারণ ওটা বেশিদিন টেকে না, পচে যায়।

'সবকিছুই একটা ব্যাপার নির্দেশ করছে—রানী টেরার পুনরুত্থানের। কিন্তু এর পিছনে ওর আসল উদ্দেশ্য কী ছিল, তা আমরা জানি না। জানতে পারবও না, যতক্ষণ না ওকে আবার জাগিয়ে তুলতে পারছি।'

boiRboi.net

পনেরো

রানী টেরার উদ্দেশ্য

একটু বিরতি নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন মি. ট্রেলনি। 'এবার আসি সপ্তর্ষির রত্নটার বিষয়ে। টেরা ওটাকে নিজের সবচেয়ে বড় সম্পদ মনে করত। ওটায় ও এমন কিছু মন্ত্র খোদাই করিয়েছিল, যা সে-সময়ের লোকজন উচ্চারণ করতে সাহস পেত না। প্রাচীন মিশরীয় ধর্মবিশ্বাসে এ-ধরনের মন্ত্রকে বলত *হেকাউ*, মানে শক্তিশালী শব্দাবলী। ওরা বিশ্বাস করত, ঠিকমত ওসব মন্ত্র আউড়ালে স্বর্গ-মর্ত্যের অধিকারীদের উপরও হুকুম চালানো যায়। টেরার রুবিটাতে আমি এরকম দুটো হেকাউ দেখতে পেয়েছি—একটা স্বর্গের, অন্যটা পাতালের দেবতাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য লেখা। একটু অপেক্ষা করো, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি ওটা।'

আমাদের বসিয়ে রেখে বেরিয়ে গেলেন মি. ট্রেলনি। আমার বুকটা দুরু দুরু করছে, কিন্তু মার্গারেটের দিকে তাকাতেই সাহস পেলাম। শান্ত-স্থিরভাবে বসে আছে ও, চোখে-মুখে ভয়-টয়ের কোনও চিহ্ন নেই। আমিও নার্ভাসভাবটা লুকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম।

কয়েক মিনিট পর ফিরে এলেন মি. ট্রেলনি। বড় সেফটা থেকে সোনালি রঙের একটা ছোট্ট বাক্স নিয়ে এসেছেন। আমাদের মাঝখানে নিচু টেবিলটার উপর ওটা রেখে নিজের

আসনে বসে পড়লেন তিনি। তারপর ধীরে ধীরে খুলে ধরলেন ডালাটা। প্রবল আগ্রহ নিয়ে সামনে ঝুঁকলাম আমরা।

বাক্সটার ভিতরে, সাদা মখমলের লাইনিঙের উপর শুয়ে আছে একটা অস্বাভাবিক বড় রুবি পাথর—দেখতে অসম্ভব সুন্দর! খোদাই করে বানানো ওটা—আকারটা ডানা মুড়ে থাকা একটা গুবরে পোকার মত। রক্তলাল শরীরটার ভিতরে জ্বলজ্বল করছে তারার মত সাতটা বিন্দু—উজ্জ্বল... প্রতিটারই সাতটা বাহু! ভাল করে তাকাতেই তারাগুলোর সজ্জার সঙ্গে সপ্তর্ষিমণ্ডলের বিস্ময়কর মিল দেখতে পেলাম। মি. ট্রেলনি পকেট থেকে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে দিলেন, সেটা দিয়ে পালা করে পাথরটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম আমরা—নিখুঁতভাবে খোদাই করা চিত্রলিপিগুলো চোখে পড়ল এর ফলে।

আমাদের দেখা শেষ হতেই বাক্সটা আবার বন্ধ করে দিলেন মি. ট্রেলনি। বললেন, 'দেখেছ তোমরা? দুটো হেকাউ রয়েছে রত্নটার গায়ে—উপর-নীচে। উপরেরটা হচ্ছেঃ *মাররর্*... র-এর উপর একটু জোর দিতে হবে... শব্দটার অর্থ ভালবাসা—সম্পূর্ণ, নিখাদ, এবং চরম ভালবাসা। এটা হচ্ছে স্বর্গের দেবতাদেরকে নিয়ন্ত্রণের হেকাউ। দ্বিতীয় সঙ্কেতটা একটু জটিল, তবে সহজ করে বলতে গেলে ওটাকে *ধৈর্য* বলা যেতে পারে। ওটা হচ্ছে পাতাল, বা পরলোকের দেবতাদেরকে নিয়ন্ত্রণের মন্ত্র।'

রত্নটা আবার সেফে রাখার জন্য চলে গেলেন মি. ট্রেলনি। ফিরে এসে খেই ধরলেন তাঁর কথার। 'মন্ত্র-খচিত ওই পাথরটা রানী টেরার পুনর্জাগরণের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ... সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্যেই ওটা ওর সারকোফাগাসে হাতের নীচে রেখে দেয়া হয়েছিল। শুরু থেকেই ওটার গুরুত্ব কিছুটা আঁচ করতে পারি আমি, তাই পাথরটা রেখে দিয়েছিলাম আমার সেফের ভিতর—যাতে চোর-ডাকাত তো দূরের কথা, টেরার

ছায়াশরীরও ওটার নাগাল না পায়।'

'এক মিনিট, বাবা,' বাধা দিয়ে বলে উঠল মার্গারেট। 'ছায়াশরীর বলতে কী বোঝাচ্ছ?'

'বৌদ্ধধর্মের একটি বিশ্বাস হচ্ছে এই ছায়াশরীর,' ব্যাখ্যা করলেন মি. ট্রেলনি। 'তবে ধারণাটার উৎপত্তি হয়েছে প্রাচীন মিশরে। এতে বলা হয়, বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কিছু মানুষ শুধুমাত্র ইচ্ছেশক্তির মাধ্যমে শরীরকে স্থানান্তর করতে পারে। পার্থিব দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন ফেলে নিজেকে, আবার যখন খুশি পুরনো শরীরে জমাটও বাঁধতে পারে। এই অবস্থাটা হচ্ছে ছায়া-শরীর, ধরাছোঁয়া যায় না ওকে। তবে এই ছায়াশরীরও কয়েকটা বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, সেটা বলছি এখন।

'প্রাচীন মিশরীয়দের মতে প্রতিটি মানুষের ভিতর কয়েকটি করে উপাদান থাকে। প্রথমটি হলো *কা*, বা সত্তা। বিখ্যাত বিজ্ঞানী ড. বাজের মতে ওটা মানুষের কায়াহীন অস্তিত্ব, বা ব্যক্তিত্ব—ওতে মানুষটির সমস্ত স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন থাকে। এই *কা* স্বাধীনভাবে পুরো পৃথিবীতে বিচরণ করতে পারে; এমনকী স্বর্গে গিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কেও লিপ্ত হতে পারে। এরপর হচ্ছে *বা*, মানে আত্মা—এটা *কা*-র ভিতরেই বাস করে। তবে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় সত্তা থেকে—নিরেট, কিংবা কায়াহীন রূপ দেয়া যায়। এরপর আছে *খু*, মানে প্রাণশক্তি; *সেখেম*, মানে দৈহিক শক্তি; *খাবিট*, মানে ছায়া; *রেন*, মানে নাম; *খাত*, মানে দেহ... আর সবশেষে *আব*, মানে হৃদয়। এ-সব মিলিয়েই একজন মানুষ তৈরি হয়।

'কাজেই বুঝতে পারছ, রক্তমাংসের দেহ ছাড়াও মানুষের অস্তিত্ব যে বিরাজ করতে পারে, তা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করত ওরা। অস্তিত্বের এই পরিবর্তন পরিচালিত হতো ইচ্ছেশক্তির মাধ্যমে, আর সেটা করতে পারত গুটিকয়েক মানুষ।'

'শেলির কবিতায় বোধহয় এমন একটা ইঙ্গিত আছে,' বলে উঠলাম আমি।

'ঠিক বলেছ,' হাসলেন মি. ট্রেলনি। 'সমসাময়িক যে-কোনও কবির চেয়ে মিশরীয় ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে ভাল জ্ঞান ছিল শেলির।' আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি, ফিরে গেলেন আগের প্রসঙ্গে। 'তো যা বলছিলাম... এসব বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করে আমি উপসংহারে পৌঁছাই যে, রানী টেরা সম্ভবত নিজেই নিজের পুনরুত্থান ঘটাতে চেয়েছিল। কখন, কোথায়, কীভাবে সেটা ঘটাবে... তা-ও সম্ভবত ঠিক করেছিল সে। আর এ-কারণে আমার ধারণা, মৃত্যুর আগেই নিজের সত্তাকে আলাদা করে ফেলেছিল ও, প্রবেশ করেছিল ছায়াশরীরে। পরলোকে ওকে নিতে পারত না কেউ, কারণ সে-জগতের উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল ওর। ধৈর্যের হেকাউ নিয়ে ও অপেক্ষা করছিল সঠিক সময়ের জন্য... জেগে উঠবার জন্য। প্রথমবারের মত সেটার ব্যাঘাত ঘটে ওই ডাচ অভিযাত্রী... নিকোলাস ভ্যান হাইন ওর সমাধিতে ঢোকায়। লোকটার সঙ্গীসাথীরা সমাধির পবিত্রতা নষ্ট করে ওর-ই হাত চুরির মাধ্যমে।

'ওই চুরিটা একটা ব্যাপার প্রমাণ করে। সেটা হলো, পুরো শরীরের প্রয়োজন নেই, শরীরের যে-কোনও একটা বিচ্ছিন্ন অংশেই জমাট বাঁধতে পারে ছায়াশরীর... ওটাকে কার্যকর করে তুলতে পারে। এই যে, আমার ঘরে ওর হাতটা যে রেখেছি, তাতে ওর উপস্থিতি নিশ্চিত হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে।

'এবার আসি সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়টাতে... মানে, আমার উপর হামলার বিষয়ে। এর পিছনে একটাই কারণ ছিল—সেফ থেকে সপ্তর্ষির রত্নটা বের করা। সেফটা টেরার ছায়াশরীরের জন্য কোনও বাধা না, ভিতরে গিয়ে সহজেই দেখে নিতে পারে কী আছে ওখানে। সমস্যা হলো দরজাটা, ওটা

খুলতে জানে না সে, আবার ছায়াশরীরে যেভাবে ঢোকে-বেরোয়, সেভাবে রত্নটাও বের করতে পারছে না। এদিকে ওর জেগে ওঠার সময় ঘনিয়ে এসেছে... জেগে ওঠার জন্য রত্নটা প্রয়োজন, তাই মরিয়া হয়ে পড়ে। আমাকে অজ্ঞান করে ফেলে, তারপর কাজে লাগায় নিজের বাহন মমি-বেড়াল, আর কাটা হাতটাকে। আমার কাছ থেকে চাবি ছিনিয়ে নিয়ে সেফটা খোলার মতলব ছিল ওর। কিন্তু এমন কিছু যে ঘটতে পারে, সে-ব্যাপারে বহু আগে থেকেই সতর্ক ছিলাম আমি। তাই হাতে একটা ভারী ব্রেসলেট পরে তার সঙ্গে জুড়ে নিয়েছিলাম চাবিটা... যাতে কিছুতেই আমার কাছ থেকে ওটাকে আলাদা করা না যায়। আমাকে কোনোভাবে অজ্ঞান করেও যাতে চাবিটা নিতে না পারে টেরা, তাই লিখে রেখেছিলাম চিঠিটা... সারাক্ষণ আমাকে কড়া পাহারায় রাখার নির্দেশসহ। ওকে ঠেকাবার কোনও ইচ্ছে ছিল না আমার, আমি নিজেও চাই ও জেগে উঠুক... কিন্তু সেটা আমার সামনে, আমার উপস্থিতিতে। প্রদীপগুলো না-পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চেয়েছিলাম আমি...'

'বাবা,' বাধা দিয়ে বলে উঠল মার্গারেট, 'রানীর পুনরুত্থানটা কি কোনও নির্দিষ্ট সময়ে হতে হবে? পরে কখনও হতে পারবে না?'

'না, মা,' মাথা নাড়লেন মি. ট্রেলনি। 'ওটা একবারই... একটা নির্দিষ্ট সময়েই হতে পারে। নইলে পরজগতে চলে যেতে হবে ওকে। আর একবার ওখানে চলে গেলে কেউ আর ফিরতে পারে না। প্রাচীন বিশ্বাস অনুসারে পরলোকের এলিসিয়ান মাঠে কোনও কিছুর অভাব নেই, ওখানে শুধু সুখের রাজত্ব... ওই জায়গা ছেড়ে মাটির পৃথিবীতে কোনও আত্মাই আর ফিরতে চায় না।'

'কিন্তু টেরার কোনও মোহ ছিল না ওই জগতের প্রতি,'

অদ্ভুত এক ঘোর-লাগা কণ্ঠে বলে উঠল মার্গারেট। 'ওখানে গিয়ে চিরতরে আটকা পড়তে চায়নি ও, চেনা পৃথিবীতেই থাকতে চেয়েছে। আমি ওর মনের কথা পড়তে পারছি, বাবা! এলিসিয়ানের মাঠে ওর মত একটি মেয়ের জন্য কী-ই বা আছে? যে-সুখ আর সমৃদ্ধির কথা বলছ, তা এই পৃথিবীতেই পেয়েছে ও—পুরো মিশরের রানী ছিল, অভাব বলতে কিছু ছিল না। তার ওপর ছিল দেবতাদের নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা... এসব ছেড়ে পরজগতে কেন যেতে চাইবে কেউ? পৃথিবীতেই বড় কিছু করতে চেয়েছে ও। নিজের সময়ে সেটা সম্ভব ছিল না, তাই ফিরে আসতে চেয়েছে ভবিষ্যতে... যেখানে অমিত সম্ভাবনা আছে! আ... আমি সেটা বুঝতে পারছি, বাবা!'

চোখ জ্বলজ্বল করছে মার্গারেটের। শূন্যের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে কথা বলছে, যেন বহু দূরের কিছু দেখতে পাচ্ছে ও। কণ্ঠে আবেগ উথলে উঠছে।

'আমি ওকে দেখতে পাচ্ছি!' বলে চলল ও। 'নিঃসঙ্গ হয়ে বসে আছে, কারণ ও আশপাশের সবার চেয়ে আলাদা। স্বপ্ন দেখছে ও—উত্তরের সবুজ-সুনিবিড় এক জায়গার; যেখানে পুরোহিতদের ষড়যন্ত্র নেই, যেখানে অবাধ ভালবাসা আছে, যেখানে ও নিজেকে নির্দ্বিধায় প্রকাশ করতে পারে... নিজের সুপ্ত বাসনাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে! সেই স্বপ্নকে সফল করবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে...। ওটাই ওর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য!'

থম মেরে বসে রইলাম আমরা সবাই। মার্গারেটকে একেবারেই অচেনা মনে হচ্ছে সবার কাছে। কী বলছে এসব ও? স্রেফ অনুমান করছে রানী টেরার মনোবাসনার ব্যাপারটা, নাকি সত্যিই কোনও দিব্যদৃষ্টি খুলে গেছে ওর? বুঝতে পারলাম না কিছু, শুধু বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে।

মার্গারেটের কথা শেষ হতেই ওর হাত চেপে ধরলেন মি.

ট্রেলনি। 'ধন্যবাদ, মা। চমৎকার একটা ব্যাখ্যা দিয়েছ টেরার জীবন আর উদ্দেশ্য নিয়ে। এখন তা হলে পুরনো আলোচনায় ফিরে যাই, কী বলো?'

মাথা ঝাঁকাল মার্গারেট।

আমাদের দিকে ফিরলেন মি. ট্রেলনি। 'এবার আমি আলোচনা করব, রানী টেরা কখন আবার জেগে উঠতে চেয়েছিল, সে-বিষয়ে। আকাশের সমস্ত তারা প্রতিনিয়ত স্থান পরিবর্তন করছে, এটা জানো তো? ওটা সপ্তর্ষিমণ্ডলের জন্যও প্রযোজ্য। এই পরিবর্তন অবশ্য খুব সামান্য, শত-বছরে বা হাজার বছরে হয়তো একচুল এদিক-ওদিক হচ্ছে। কিন্তু হচ্ছে যে, সেটা সত্য। সপ্তভুজ বাক্সটার গায়ে ঘোলাটে অংশগুলো সপ্তর্ষিমণ্ডলের একটা বিশেষ অবস্থান দেখাচ্ছে—তবে সেটা টেরার আমলে ওই অবস্থানে ছিল না। জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্য নিয়ে আমি দেখেছি, এখনকার অবস্থানের সঙ্গে ওটা মিলে যায়। তার মানে, এখন... প্রায় পাঁচ হাজার বছর পর আবার জেগে ওঠার পরিকল্পনা করেছে টেরা। এখনই তার সময়! জ্যোতির্বিদ্যায় টেরার দক্ষতার কথা বলছিলাম একটু আগে; এই বিশেষ নিদর্শনটাই ওর সে-দক্ষতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

'আমার কথা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আলোচনা মুলতবি করার আগে একটা খবর জানাই। টেরার জেগে ওঠার সঙ্গে সপ্তভুজ ওই বাক্সটার সম্পর্ক আছে। ওটা আমরা খুলতে পারিনি, তা তো বলেইছি। তবে আলোর মাধ্যমে... বা আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ওই সাতটা প্রদীপ জ্বেলে ওটা খোলা যাবে বলে আশা করছি। কিন্তু প্রদীপ শুধু জ্বাললেই কি হবে? ওটার আলোর মধ্যেও তো বিশেষত্ব থাকতে পারে! একেক আলোর বৈশিষ্ট্য একেক রকম; বিভিন্ন রকম জ্বালানি বিভিন্ন রকম আগুন জ্বালে, বিভিন্ন রকম আলো ছড়ায়... কোন্‌টা আমাদের প্রয়োজন, তা

কীভাবে বুঝব?

'বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে ভ্যান হাইনের বইটার কথা মনে পড়ে যায় আমার। পাথরের একটা সিন্দুকে কয়েকটা জার পেয়েছিল সে, ওগুলোর ভিতরটা তেল-ভরা ছিল। ওই তেল নিশ্চয়ই প্রদীপে ব্যবহারের জন্যই রাখা হয়েছিল। কিন্তু ওগুলোর ভিতর থেকে সমস্ত তেল ফেলে দিয়েছে হাইনের সঙ্গী আরব বেদুঈনরা, কাজেই তা আর ব্যবহার করতে পারছি না আমরা। সৌভাগ্যক্রমে জারগুলো নিয়ে এসেছিলাম আমি আর করবেক অন্যান্য আর্টিফ্যাক্টের সঙ্গে। সেগুলোর তলানি আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, সিডার গাছের তেলের সন্ধান পেয়েছি। এই তেল প্রাচীন মিশরের শেষকৃত্যে ব্যবহার হতো, তেলটার প্রতিসরণ-ক্ষমতা অন্যান্য তেলের চেয়ে আলাদা। ওটাই নিশ্চয়ই প্রদীপেও দিতে হবে। কাল রাতে আমি একটু সিডারের তেল নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি—প্রদীপে ভরে আগুন জ্বেলেছিলাম। জাদুর বাক্সটার সামনে ধরতেই এমনভাবে ভিতর থেকে আলোর আভা বের হতে থাকল, যা আগে কখনও দেখিনি। তেল বেশি ছিল না ঘরে, তাই পরীক্ষাটা শেষ করতে পারিনি। তবে আজ আবার আনার ফরমায়েশ দিয়েছি, তেলটা এলেই আমরা বাক্সটা খুলে দেখতে পারব।'

'হুম,' বললেন ডা. উইনচেস্টার। 'বুঝলাম সবই। তবে বাক্সটা তো অনেক পুরনো। মেকানিজমটা ঠিক আছে কি না, সেটাই প্রশ্ন।'

কথাটা চিন্তিত করে তুলল আমাদের সবাইকে।

boiRboi.net

ষোলো

গোপন গুহা

সন্ধ্যায় আমাদেরকে নিয়ে আবার মিটিঙে বসলেন মি. ট্রেলনি। খুলে বললেন নিজের পরিকল্পনা।

'রানীকে জাগিয়ে তোলার পরীক্ষাটার নাম রেখেছি আমি *মহা-পরীক্ষা*। একটু নাটুকে হয়ে গেল বোধহয়, তবে মানানসই হয়নি—এ কথা কেউ বলতে পারবে না। যা হোক, এই মহা-পরীক্ষা সফল করতে হলে প্রথমেই আমাদের যা দরকার, তা হলো নির্জনতা। স্রেফ দু-একদিনের নির্জনতার কথা বলছি না, যতদিন না পরীক্ষাটা শেষ হচ্ছে, ততদিনই সমাজ-সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে আমাদেরকে, যাতে কাজের মাঝখানে কোনও ব্যাঘাত না ঘটে। তবে নির্জনতা পাওয়াটা সহজ হবে না। ঘরে চাকর-বাকর আছে, বিভিন্ন সময় আমার কাছে অনেক অতিথিও আসে। এদের কথা যদি বাদও দিই, পুলিশকে বাদ দিতে পারব না। গত কয়েকদিনে যেসব কাণ্ড ঘটেছে এ-বাড়িতে, তাতে নিরাপত্তার জন্য ওরা মাঝেমধ্যে এসে ভিতরে ঢুঁ মারতে চাইতে পারে। সবচেয়ে বড় বিপদ হলো সাংবাদিকরা—ওরা যদি কোনোক্রমে আমাদের পরীক্ষার ব্যাপারে সামান্যতম আভাসও পায়, তা হলেই হয়েছে! পাগল করে দেবে একেবারে।

'এসব ভেবে বিকল্প একটা বুদ্ধি বের করেছি আমি—পরীক্ষাটা এ-বাড়িতে চালাব না, চালাব আরেক জায়গায়। কর্নওয়ালের কাইলিয়নে আরেকটা বাড়ি আছে আমার—উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। আমাদের এক পূর্বপুরুষ তৈরি করিয়েছিলেন ওটা। লোকেশনটা চমৎকার—সাগরপারে, খাড়া একটা পাহাড়ের উপরে ওটা; সাগরের দিক ছাড়া লোকের চোখে পড়ে না। বহুদিন থেকে ওটা পরিত্যক্ত, তাই কেউ ওটার ব্যাপারে কৌতূহলও দেখায় না। তবে বেশ কিছুদিন হলো, গোপনে ওটা ঠিকঠাক করাতে শুরু করেছি আমি—পরীক্ষাটা ওখানে করব বলে আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম কি না। বাড়িটা এখন পুরোপুরি তৈরি। বিদ্যুৎ-পানি থেকে শুরু করে যা যা প্রয়োজন, সবকিছুরই ব্যবস্থা করা হয়েছে... এমনকী আমাদের সমস্ত আর্টিফ্যাক্ট রাখবার মত আয়োজনও করা আছে ওখানে। মিসেস গ্র্যান্ট আর অন্য চাকরদের আজই পাঠিয়ে দিচ্ছি ওখানে, বাড়িটা ঝেড়েমুছে থাকার উপযোগী করে দিয়ে আসবে, কিছুদিন চলবার মত বাজারও করে দেবে। আমরা এখানেই রয়ে যাব, আর্টিফ্যাক্টগুলো প্যাক করব ওখানে নিয়ে যাবার জন্য। আউটহাউসে আমি প্রচুর পরিমাণে প্যাকিং-কেস আনিয়ে রেখেছি, ওগুলোতে ভরে ফেলব সব। আশা করি, কাল রাতের ভিতরই তৈরি হয়ে যেতে পারব, ততক্ষণে মিসেস গ্র্যান্টও চাকরদের নিয়ে ফিরে আসবে। ওকে এ-বাড়ির দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে আমরা চলে যাব কাইলিয়নে। আমার উকিল মারভিনকে আমি একটা স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করতে বলে রেখেছি, মাল বইতে সুবিধে হবে তাতে। রাতে যাবে ট্রেনটা, লোকের দৃষ্টি এড়াতে পারব ওতে। কর্নওয়ালে নামার পর মাল-টানার ক্যারিজও তৈরি রাখবে মারভিন, কাজেই আমাদের সমস্যা হবে না। কারও কোনও প্রশ্ন আছে?'

'চাকরদের যে রেখে যাবেন, ওরা লোকের কাছে আমাদের খবর ফাঁস করে দেবে না?' জিজ্ঞেস করলেন করবেক।

'উঁহুঁ, ওরা খুব বিশ্বস্ত। বাড়িতে এত বড় একটা বিপদ দেখা দেবার পরও যখন রয়ে গেছে, তখন ওদেরকে সন্দেহ করা ঠিক হবে না। তা ছাড়া মুখ বন্ধ রাখবার জন্যও ওদেরকে বলে দিয়েছি আমি। আর কোনও প্রশ্ন?'

মাথা নাড়লাম সবাই।

'গুড,' বললেন মি. ট্রেলনি। 'তা হলে এসো, প্যাকিঙের কাজটা এখুনি শুরু করে দিই। অবসর পেলে নাহয় আবার কথা বলা যাবে।'

কাজে নেমে পড়লাম আমরা। মি. ট্রেলনির নির্দেশনায়, চাকরদের সাহায্য নিয়ে আউটহাউস থেকে একে একে সমস্ত প্যাকিং কেস আমরা নিয়ে গেলাম বাড়ির ভিতর; যে-আর্টিফ্যাক্ট যেটায় ঢুকবে, সেটার পাশে রাখা হলো ওগুলো। একেক কেস একেক আকারের—ছোট-বড় সব রকমই আছে। ওগুলো জায়গামত নিয়ে যাবার পর চাকরদের ছেড়ে দেয়া হলো, ওদের নিয়ে কর্নওয়ালের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল মিসেস গ্র্যান্ট। আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়লাম খড়, তুলো আর কাগজ মুড়ে জিনিসপত্র প্যাকিঙের কাজে।

খাটতে হলো খুব। বাঁধা-ছাঁদার কাজে অভ্যস্ত নই কেউই, তার উপর আর্টিফ্যাক্টের সংখ্যা অগণিত। হাত দেবার আগে কল্পনা করতে পারিনি এত হবে। রাতভর কাজ করতে হলো। দেরি করে যখন সাপারের জন্য বসলাম, তখনও কিছুই এগোয়নি কাজ। বড় বড় সারকোফাগাসগুলো শুধু ভরতে পেরেছি, কিন্তু ছোট-খাট সমস্ত জিনিস বাকি—ওগুলোর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি।

ভোরের দিকে ঘুমাতে গেলাম আমরা। বিশ্রাম পেলাম মাত্র কয়েক ঘণ্টা, ওই সময়টুকু কাটল মড়ার মত, নড়াচড়া করবার শক্তি নেই শরীরে; স্বপ্ন-টপ্ন দেখবার তো প্রশ্নই ওঠে না।

ঘুম থেকে উঠে আবার ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমরা কাজে। বিরতিহীনভাবে খেটে চললাম সবাই। এই পরিশ্রমের ফল মিলল, ডিনারের আগেই শেষ করতে পারলাম প্যাকিং। খাওয়া শেষ হতেই বেশ ক'টা মাল-টানা ক্যারিজ এল বাড়ির সামনে, সঙ্গে শ্রমিক আছে। ওরা ঝড়ের বেগে সমস্ত কেস তুলে ফেলল গাড়িতে, রওনা হয়ে গেল প্যাডিংটন স্টেশনের দিকে। আমরাও তৈরি হতে শুরু করলাম কর্নওয়ালে যাবার জন্য।

রাত নামার পর বাড়ি থেকে বেরুলাম আমরা। সদর-দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন মি. ট্রেলনি। মিসেস গ্র্যান্ট এখনও ফেরেনি, তবে তাতে অসুবিধে নেই। তার কাছে বাড়তি চাবি আছে, ঘরে ঢুকতে পারবে। শেষবারের মত যখন বাড়িটার দিকে তাকালাম, কেমন যেন পরিত্যক্ত দেখাল ওটাকে। একটু বিষাদও অনুভব করলাম, গত কিছুদিনের স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে। হাজারটা বিপদের মাঝেও কেন যেন বাড়িটাকে আপন ভাবতে শুরু করেছিলাম।

বের হবার আগে সেফ থেকে সপ্তর্ষির রত্নটা নিয়ে এসেছেন মি. ট্রেলনি। আমাদের সামনে ওটা একটা চামড়ার থলেতে ভরলেন তিনি, ঢুকিয়ে রাখলেন বুক-পকেটে। মার্গারেট গত চব্বিশ ঘণ্টার পরিশ্রমে কাহিল হয়ে পড়েছিল, কিন্তু পাথরটা দেখতেই আবার ওর মধ্যে প্রাণের সাড়া ফিরল। ওটা দেখে অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে।

বলল, 'তোমার কথাই ঠিক, বাবা। তোমার কাজে আর বাধা দেবে না টেরা। আমি নিশ্চিত!'

'ওভাবে বলবেন না,' বিরক্ত গলায় বললেন মি. করবেক।

'ওর কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। জাদুকরের উপত্যকা থেকে বেরুবার পর আমাদেরকে কীভাবে একটা মরুঝড়ের ভিতর ফেলেছিল, শোনেননি?'

'হাজার-হাজার বছর ধরে যেখানে বিশ্রাম নিচ্ছিল, সেখান থেকে ওকে আপনারা সরিয়ে আনছিলেন,' বলল মার্গারেট। 'খেপে তো যেতেই পারে! কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি ভিন্ন।'

'সেটা ও জানছে কী করে?'

'জানবে না কেন? ছায়াশরীরে সত্যিই যদি ও বিরাজ করে থাকে, তা হলে নিশ্চয়ই আমাদের সমস্ত কাজ দেখতে পাচ্ছে; উদ্দেশ্যটাও জানতে পারছে।'

'কী জানি!' কাঁধ ঝাঁকালেন মি. করবেক, দুশ্চিন্তায় ভুগছেন তিনি। 'অমন হলে তো ভালই।'

'বুকে সাহস রাখো সবাই,' বললেন মি. ট্রেলনি। 'আমাদের লক্ষ্য স্থির রাখতে হবে। যা-ই ঘটুক, কাজ করে যেতে হবে।'

বাবার হাত চেপে ধরল মার্গারেট। আমরা বেরিয়ে এলাম ট্রেলনি হাউস ছেড়ে। ক্যাবে চেপে চলে গেলাম প্যাডিংটন স্টেশনে। ওখানে পৌঁছে দেখি, মালামাল সব ট্রেনে তুলে ফেলা হয়েছে; শ্রমিকরাও চড়ে বসেছে ট্রেনে—ওরা সঙ্গে যাচ্ছে আনলোডিঙের জন্য। দেরি না করে আমরাও উঠে পড়লাম। সবার জন্য স্লিপিং-ক্যারিজ নিয়েছেন মি. ট্রেলনি, যার যার কেবিন খুঁজে নিয়ে আসন গ্রহণ করলাম আমরা।

শরীর ক্লান্ত ছিল, তা ছাড়া মার্গারেটের আশ্বাস বাজছিল কানে: *আর কোনও বিপদ হবে না!* তাই নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লাম একটু পরেই। জানি না কেন, কথাটা খুব স্বস্তি দিচ্ছিল আমাকে।

ধীরে চলল ট্রেন। কর্নওয়ালের দূরত্ব খুব বেশি নয়, কিন্তু আঁধার নামার আগে ওখানে পৌঁছুনোর ইচ্ছে নেই মি. ট্রেলনির। তাড়াহুড়ো না করে ধীরে-সুস্থে এগোচ্ছি আমরা। খানিক পর

পরই যাত্রাবিরতি দেয়া হচ্ছে। শ্রমিকদের খাওয়াদাওয়ার জন্য মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে দিয়েছেন মি. ট্রেলনি—ওরা খুশি, স্টেশনে নেমে ইচ্ছেমত পেটপুজো করছে। আমাদের খাবার আনিয়ে নেয়া হলো, প্রাইভেট কারে বসে একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চ সারলাম সবাই।

সারাটা দিন আমরা আলোচনায় ব্যস্ত রইলাম আসন্ন *মহা-পরীক্ষা* নিয়ে। সবারই চিন্তা-চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে ওটা। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মি. ট্রেলনির উৎসাহ; আশা আর স্বপ্নের গণ্ডি পেরিয়ে এখন ওটা নিশ্চিত ভবিষ্যতে পরিণত হয়েছে ওঁর জন্য। উচ্ছ্বাসের ছোঁয়া কিছুটা ডা. উইনচেস্টারের মধ্যেও লেগেছে, তবে মাঝে মাঝে দু-একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আউড়ে বিষয়টার অসাড়তা দেখাবার চেষ্টা করছেন তিনি, উত্তেজিত ভঙ্গিতে সেসব যুক্তি খণ্ডন করে চলেছেন মি. ট্রেলনি। মি. করবেক অবশ্য চুপচাপ আছেন, তাঁর ভিতর নেতিবাচক একটা ভাব দেখতে পেলাম আমি—মি. ট্রেলনি যতটা উৎসাহী হয়ে উঠছেন, তিনি যেন ঠিক ততটাই আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন ব্যাপারটা নিয়ে।

মার্গারেটও চুপচাপ। সারাক্ষণ কী যেন ভাবছে ও। পুরো বিষয়টাকে সিরিয়াসলি খতিয়ে দেখছে যেন। এমনিতে আপনমনে আছে ও, তবে হঠাৎ হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠছে, অংশ নিচ্ছে আলোচনায়... ব্যাপারটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঘটছে কোথাও থামলে, কিংবা পাহাড়ের মাঝ দিয়ে যাবার সময় ট্রেনের ঝমঝমানি বেড়ে গেলে। কথা যখন বলছে, তখন বোঝা যাচ্ছে—নিজের মনে ব্যস্ত থাকলেও আশপাশে কী নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না-হচ্ছে, তা ঠিকমতই খেয়াল করছে ও।

আমার সঙ্গে অদ্ভুত আচরণ করছে মার্গারেট—বেশিরভাগ সময় দূরত্ব বজায় রাখছে, কথা বলছে না। তবে কখনও কখনও

আবার প্রবল আবেগ আর ভালবাসার দৃষ্টি নিয়ে চোখাচোখি করছে। সে-সময়টাতে অপার্থিব এক আনন্দে হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠছে আমার।

যাত্রাপথে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ঘটল না। ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটেছিল অবশ্য, তবে সেটা রাতে... আমরা ঘুমিয়ে থাকার সময়। সকালে উঠে গার্ডের কাছে শুনলাম, রাতে একবার শিডিউলের বাইরে থামতে হয়েছিল—লাইনের কাছে নাকি পাহাড়ি ধস নেমেছিল। সিরিয়াস কিছু নয়, লাইন বন্ধ হয়নি, তবে নিশ্চিত হবার জন্য অনেকটা সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে ওদের। ব্যাপারটা নিয়ে ট্রেনচালক নাকি মহা-বিরক্ত।

কাইলিয়নের সবচেয়ে কাছের স্টেশন ওয়েস্টারটন। ওখানে আমরা পৌঁছুলাম রাত ন'টায়। মাল-টানার গাড়ি তৈরি ছিল স্টেশনে, ট্রেন থামতেই তাতে মালামাল ওঠাতে শুরু করল শ্রমিকরা। আমরা অবশ্য তদারকির জন্য থাকলাম না, তার প্রয়োজন নেই। শ্রমিকরা তাদের কাজে অত্যন্ত দক্ষ। তাই অন্য একটা ক্যারিজে চেপে আমরা রওনা হয়ে গেলাম কাইলিয়নের উদ্দেশে।

গন্তব্যে পৌঁছে চাঁদের আলোয় বাড়িটা দেখে মুগ্ধ হলাম আমরা। গ্রে-স্টোনের তৈরি বিশাল এক ম্যানশন—জ্যাকবিয়ান আমলে গড়া। সমুদ্রের উপর একটা উঁচু ক্লিফে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড় কেটে ঢোকার রাস্তা তৈরি করা হয়েছে, সেটা ধরে এগোলাম আমরা। কানে ভেসে এল ক্লিফের গোড়ায় আছড়ে পড়া ঢেউয়ের গর্জন, নাকে অনুভব করলাম সমুদ্রের নোনা বাতাস। সত্যিই... জায়গাটা নির্জনই বটে। সভ্যতা থেকে অনেক দূরে, মানব-বিবর্জিত একটা জায়গায় বাড়িটা।

ভিতরে ঢুকে সবকিছু তৈরি অবস্থায় পেলাম—মিসেস গ্র্যান্ট ভাল খাটুনি দিয়েছে বাড়িটার পিছনে। পুরো বাড়ি ঝকঝকে,

তকতকে; ধুলোবালি নেই একটুও। বিছানাগুলোয় পাতা হয়েছে নতুন চাদর, দরজা-জানালায় পরিষ্কার পর্দা। অল্প সময়ের মধ্যে পুরো বাড়ি ঘুরে দেখলাম আমরা, এরপর রুম বরাদ্দ হতেই হাতমুখ ধুয়ে কাপড় বদলাতে চলে গেলাম।

দক্ষিণ দিকের বিশাল ডাইনিং রুমে রাতের খাবার সারলাম আমরা, ওটা সমুদ্রের একেবারে উপরে। পুরু দেয়ালও পুরোপুরি ঠেকাতে পারছে না ঢেউয়ের গর্জন, আবছাভাবে কানে আসছে সারাক্ষণ। দক্ষিণটা উন্মুক্ত হলেও বাড়ির উত্তর দিক... মানে সামনেটা ঢাকা। উঁচু পাহাড়সারি ওদিকটাকে আড়াল করে রেখেছে লোকচক্ষুর কাছ থেকে। জানালার কাছে যেতেই চোখে পড়ল বিশাল সাগর—চাঁদের আলো ঝিকিমিকি করছে ঢেউয়ের মাঝে। দূরে, তীরের কাছে জেলেদের আবাস বোধহয়—মাঝে মাঝে ওদের কুঁড়ে থেকে ভেসে আসা আলোর ঝিলিক দেখা যায়, নইলে পুরো দৃশ্যটাই চাঁদের আলো-ভরা রাতের দখলে।

খাওয়া শেষ হতেই পাশের একটা রুমে আমাদের নিয়ে গেলেন মি. ট্রেলনি—ওটাকে স্টাডি বানিয়েছেন তিনি। ভদ্রলোকের বেডরুমও ওটারই পাশে। রুমটাতে ঢুকতেই দৃষ্টি চলে গেল একপাশের দেয়ালে—ওখানে বিশাল একটা সেফ দেখা যাচ্ছে, অনেকটা লণ্ডনের বাড়ির সেফটার মতই। টেবিলের কাছে গিয়ে পকেট থেকে চামড়ার থলেটা বের করলেন মি. ট্রেলনি, কিন্তু ওটার ভিতরে হাত দেবার আগেই তাঁর চেহারা পাল্টে গেল। কাঁপা কাঁপা আঙুলে ওটা খুললেন তিনি, ভিতরে হাত ঢোকালেন। আমাদের দিকে তাকিয়ে নার্ভাস কণ্ঠে বললেন, 'কিছু না, হালকা লাগছে থলেটা।'

ভুরু কুঁচকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম আমি আর ডা. উইনচেস্টার। মি. করবেকের মুখও থমথম করছে। আড়চোখে

তাকালাম মার্গারেটের দিকে—মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে ও, গম্ভীর।

পরমুহূর্তেই একটা গোঙানির মত বেরিয়ে এল মি. ট্রেলনির মুখ দিয়ে। পাগলের মত থলেটা হাতড়ালেন তিনি, উল্টে ফেললেন ভিতরটা—কিন্তু পাথরটা গায়েব!

ধপ্ করে পাশের একটা চেয়ারে বসে পড়লেন মি. ট্রেলনি। ভাঙা গলায় বললেন, 'হা ঈশ্বর! ওটা নেই! মানে আমাদের পরীক্ষাও খতম!'

কথাটা শুনে যেন সংবিৎ ফিরে পেল মার্গারেট। চকিতের জন্য কী যেন একটা খেলা করে গেল ওর মুখে। বলল, 'দুশ্চিন্তা কোরো না, বাবা। যাবে কোথায়? দেখো গিয়ে, হয়তো কাপড় বদলাবার সময় রুমে ফেলে রেখে এসেছ।'

কথাটা শুনে হুড়মুড় করে আমরা ছুটে গেলাম মি. ট্রেলনির রুমে। ভিতরে ঢুকেই থমকে গেলাম।

ওই তো, জানালার পাশে, টেবিলের উপর পড়ে আছে রক্তলাল পাথরটা! চাঁদের আলোয় ঝলমল করে উঠছে ওটার সাতটা তারা! ঝট্ করে মার্গারেটের দিকে তাকালাম আমি, ওর মধ্যে গম্ভীর ভাবটা আর নেই; নিজেও অবাক হয়ে গেছে যেন। দু'হাতের মুঠি এত শক্ত করে রেখেছে যে, আঙুলের গোড়া সাদা হয়ে গেছে।

কিচ্ছু বললেন না মি. ট্রেলনি। চুপচাপ রত্নটা তুলে নিয়ে ফিরে গেলেন স্টাডিতে, কবজিতে বাঁধা চাবি দিয়ে নিঃশব্দে সেফের তালা খুললেন, ভিতরে রেখে দিলেন ওটা। তারপর আবার বন্ধ করে দিলেন ডালাটা।

ছোট্ট ঘটনাটা আবার আমাদেরকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল। লণ্ডন থেকে রওনা হবার পর সবকিছু এত স্বচ্ছন্দভাবে এগোচ্ছিল যে, ভুলতেই বসেছিলাম কী নিয়ে কাজ করছি।

এতক্ষণে কঠিন সত্যটা মনে পড়ে গেল সবার।

সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন হলো মার্গারেটের ভিতর—হয়তো ও মেয়ে, এবং আমাদের চেয়ে কম বয়স বলেই। তবে আবার ওর মধ্যে পুরনো সেই নমনীয়তা ও কমনীয়তা ফিরে এল—দীর্ঘ যাত্রাপথে ওগুলো অনুপস্থিত ছিল। খুশি হয়ে উঠলাম ওকে আগের অবস্থায় ফিরে পেয়ে। মি. ট্রেলনির চেহারাও ওর দিকে তাকিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মালামালের ক্যারিজ আসার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম আমরা, এই ফাঁকে মি. ট্রেলনি পুরো বাড়ি ঘুরিয়ে দেখালেন আমাদের; বুঝিয়ে দিলেন, কোথায় কোন্ জিনিস রাখতে হবে। তবে মহা-পরীক্ষার সঙ্গে জড়িত জিনিসগুলোর ব্যাপারে কিছু বললেন না তিনি। শুধু জানালেন, ওগুলোর প্যাকিং-কেস আপাতত হলঘরে রেখে দিতে হবে; খুলতে হবে না।

খানিক পরেই এসে গেল সমস্ত মালামাল। শ্রমিকরা দ্রুততার সঙ্গে বাড়ির ভিতর ঢুকিয়ে ফেলল ওগুলো। মোটা বখশিশ দিয়ে ওদেরকে বিদায় করলেন মি. ট্রেলনি। এরপর যার যার রুমে চলে গেলাম সবাই। অদ্ভুত একটা অনুভূতি কাজ করছে সবার ভিতর, কেন যেন বিশ্বাস করছি—রাতে আর কিছু ঘটবে না।

বাস্তবেও তা-ই ঘটল। সকালে নাশতার টেবিলে সবাইকে হাসিখুশি আর উচ্ছল অবস্থায় পেলাম। রাতে সবারই শান্তির ঘুম হয়েছে।

ওই দিনটা জিনিসপত্র গোছগাছে ব্যস্ত রইলাম আমরা। মহা-পরীক্ষায় ব্যবহারের জিনিসগুলোয় হাত দিলাম না, তবে বাকি সবকিছু আনপ্যাক করে সাজিয়ে রাখলাম মি. ট্রেলনির নির্দেশমত।

পরদিন সকালে নাশতার পর আমাদের স্টাডিতে ডেকে পাঠালেন মি. ট্রেলনি। সবাই ঢুকতেই বললেন, 'আজ একটা

গোপন কথা শোনাব। তিনশ' বছরের পুরনো একটা ব্যাপার, আমার পরিবারের সদস্য ছাড়া আর কাউকে জানতে দেয়ার কথা নয়। তোমাদেরকে স্রেফ বাধ্য হয়ে জানাচ্ছি, ব্যাপারটা আর কাউকে না জানালে খুব খুশি হবো।'

'নিশ্চিন্ত থাকুন, সার,' বললেন ডাক্তার। 'আপনার গোমর ফাঁস করবার ইচ্ছে নেই আমাদের কারও।'

'শুনে খুশি হলাম। ঠিক আছে, বলছি তা হলে। এ-বাড়ির নীচে একটা গোপন গুহা আছে—প্রাকৃতিক, তবে পরে কেটে বড় করে নেয়া হয়েছে। ১৬৮৫-র মনমাউথ বিদ্রোহের পর যখন বিচারকাজ চলছিল, তখন বেশ কিছু কর্নিশ বিদ্রোহী আশ্রয় নিয়েছিল ওখানে। আমার পূর্বপুরুষরা আশ্রয় দিয়েছিল ওদের। গুহাটায় বসে সরকারবিরোধী বিভিন্ন কাজ করত ওরা, চোরাচালানের মালামালও রাখত ওখানে। ব্যাপারটা কেমন লজ্জাজনক, বুঝতে পারছ তো? তিনশ' বছর আগের কথা, তারপরও ওটা প্রকাশ পেলে আমার পরিবারের মান-সম্মান যাবে।'

'পুরনো ইতিহাস ঘেঁটে লাভ নেই কোনও,' বললেন ডাক্তার। 'ওটা আমাদের শোনাচ্ছেন কেন?'

'কারণ আমাদের পরীক্ষায় গুহাটার ভূমিকা আছে। এসো, দেখাচ্ছি তোমাদের।'

মি. ট্রেলনিকে অনুসরণ করলাম আমরা। হলঘরের বাইরে আমাদেরকে দাঁড় করিয়ে ভিতরে চলে গেলেন তিনি, ফিরে এলেন খানিক পরে। ইশারা করলেন আবার তাঁকে অনুসরণ করতে।

ভদ্রলোকের পিছু পিছু বিশাল কামরাটাতে ঢুকলাম আমরা। একটু এগোতেই দেয়ালের গায়ে বড় একটা ফোকর দেখতে পেলাম—দেয়াল সরে গেছে ওখান থেকে, বেরিয়ে পড়েছে একটা সুড়ঙ্গ, মেঝেতে পাথর কেটে সিঁড়ি বানানো। সুড়ঙ্গটা অন্ধকার

নয়, ভিতরে আলোর ব্যবস্থা আছে। মি. ট্রেলনির পথ ধরে আমরা ঢুকে পড়লাম ওটায়। চল্লিশ কি পঞ্চাশটা ধাপ পেরুতেই নেমে এলাম ভূগর্ভের এক গুহায়। বেশ বড় ওটা, দূর প্রান্তগুলো ছায়ায় ঢাকা। বাইরে থেকে আলো-বাতাস ঢোকার জন্য জানালার মত বেশ কয়েকটা ফোকর আছে—খোলা এবং বন্ধ করা যায়। ওগুলোর ভিতর দিয়ে ভেসে আসছে সাগরের আওয়াজ।

গুহার মাঝখানে গিয়ে আমাদের দিকে ফিরলেন মি. ট্রেলনি। বললেন, 'এই সেই জায়গা—এখানেই হবে আমাদের মহা-পরীক্ষা। জাদুকরের উপত্যকার সেই পাহাড়ি সমাধির সঙ্গে মিল আছে জায়গাটার, এমন একটা গুহাতেই ঘুমিয়ে ছিল রানী টেরা। পরিবেশটার সঙ্গে মিল আছে বলেই এখানটা নির্বাচিত করেছি আমি ওকে জাগিয়ে তুলবার জন্যে। জানি না, পরীক্ষাটার ফল কী হবে। সফল হলে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে পাল্টে দিতে পারব আমরা, আর যদি ব্যর্থ হই... সে-ব্যর্থতার কাহিনি এই গুহার ভিতরেই চাপা পড়ে যাবে... কে জানে, হয়তো আমাদেরই সঙ্গে!'

আমাদের প্রত্যেকের চেহারার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন ভদ্রলোক। 'হ্যাঁ, মৃত্যুর ঝুঁকি আছে আমাদের কাজটাতে। সেটা নিশ্চিত থাকতে পারো তোমরা। এখনও সময় আছে, কেউ যদি পিছিয়ে যেতে চাও, বলে ফেলো। মনের মধ্যে লজ্জা, বা দ্বিধা রেখো না। ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাউকেই অংশ নিতে বাধ্য করব না আমি।'

আমাদের সবার দিকে তাকালেন তিনি, আমরাও মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। কিন্তু কেউ মুখ খুললাম না। অন্যরা কী ভাবছে, জানি না; তবে আমি পিছাতে রাজি নই। মনের মধ্যে একটু-আধটু ভয় যে নেই, তা বলব না; কিন্তু মার্গারেটের দিকে তাকালেই উবে যাচ্ছে তা। চেহারায় ভয়ের কোনও চিহ্ন নেই;

দৃঢ়প্রত্যয় আর অদ্ভুত একটা শান্তভাব দেখছি ওর ভিতর।

লম্বা একটা শ্বাস ফেললেন মি. ট্রেলনি। 'ঠিক আছে, সবাই যখন একই কথা ভাবছি, তা হলে প্রস্তুতির কাজ শুরু করে দেয়াই ভাল। গুহাটা দেখাই তোমাদের। এখানে ইলেকট্রিসিটি আছে, আলো জ্বালা যাবে।'

প্রবেশপথের কাছে গিয়ে একটা খোলা তার তুলে নিলেন তিনি, দেয়ালে লাগানো একটা সুইচবক্সের সঙ্গে জোড়া দিলেন ওটা। সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে লাগানো অনেকগুলো বালব জ্বলে উঠল—উজ্জ্বল আলোয় ভেসে গেল অভ্যন্তর। প্রবেশপথের প্যাসেজের ছাদে একসারিতে লাগানো অনেকগুলো চকচকে পুলি আর ট্যাকেল দেখতে পেলাম আলোটার ফলে। একেবারে নতুন!

'হ্যাঁ, ওগুলো নতুন,' আমার মনের কথা পড়তে পেরে বললেন মি. ট্রেলনি। 'এক্সপেরিমেন্টের জন্য বেশি লোক নেবার ইচ্ছে ছিল না। ভারী জিনিস নামাতে তাই বসিয়েছি ওগুলো।'

কাজে নেমে পড়লাম আমরা। রাত নামার আগেই টেরার সারকোফাগাস-সহ সমস্ত আর্টিফ্যাক্ট নামিয়ে আনলাম গুহাতে। সবকিছু মি. ট্রেলনির নির্দেশ অনুসারে সাজিয়েও ফেলা হলো।

পরিবেশটা অদ্ভুত লাগল আমার কাছে। আধুনিক কল-কবজা ব্যবহার করে কয়েক হাজার বছরের পুরনো সব জিনিসপত্র নামিয়ে আনছি গুহাতে... সাজিয়ে রাখছি... এসব যেন স্বপ্নের মধ্যে ঘটছে। উল্লেখ করবার মত একটামাত্র ঘটনা ঘটল পুরো সময়টাতে, সেটা সিলভিওকে ঘিরে। ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, বেড়ালটাকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছি আমরা; মার্গারেট ওকে লণ্ডনে রেখে আসতে রাজি হয়নি।

আমাদের কাজ করার সময় গুহার এককোণে চুপচাপ শুয়ে ছিল সিলভিও, কিন্তু যেই না মমি-বেড়ালটাকে নামানো হলো ওখানে, সঙ্গে সঙ্গে গরগর করে উঠল প্রাণীটা। ঘাড়ের কাছে

লোম খাড়া হয়ে যেতে দেখলাম ওর, ছুটে এল বরাবরের মত আক্রমণাত্মক ভঙ্গিমায়। মার্গারেটের প্রতিক্রিয়াটা হলো আরও ভয়ঙ্কর। সারকোফাগাসের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ও, সিলভিও-কে খেপে উঠতে দেখেই ঝট্ করে সোজা হলো। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম, ওর চোখে আগুন জ্বলে উঠেছে, ঠোঁট বেঁকে গেছে হিংস্রভাবে—দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। আগে কখনও এমন চেহারা দেখিনি ওর।

খেপাটে ভঙ্গিতে আগে বাড়ল মার্গারেট, সিলভিও-র পথরোধ করে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠলাম আমিও, ছুটে গেলাম ওর দিকে। আমাকে এগোতে দেখেই মার্গারেটের মুখে যেন একটা ছায়া খেলা করে গেল, পরমুহূর্তে হিংস্রতা সরে গিয়ে কমনীয়তা ফিরে এল তাতে। নিচু হয়ে সিলভিও-কে কোলে তুলে নিল ও, গায়ে হাত বুলিয়ে শান্ত করতে শুরু করল—ঠিক যেমন করেছিল লণ্ডনের বাড়িতে। বেড়ালটাকে কোলে নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে গেল ও।

হঠাৎই মার্গারেটকে নিয়ে প্রচণ্ড ভয় করে উঠল আমার। বদলে যাচ্ছে ও... আর তার পিছনে কারণটাও বুঝতে পারছি পরিষ্কারভাবে। এই অভিশপ্ত পরীক্ষাটা থেকে দূরে নিয়ে যেতে ইচ্ছে হলো ওকে। কিন্তু ভাল করেই জানি, তা সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত কী ঘটবে, তা কেবল ঈশ্বরই বলতে পারেন।

আমাদের কাজ শেষ হবার পর গুহাটা ঘুরে ঘুরে দেখলেন মি. ট্রেলনি। সন্তুষ্টির ছাপ ফুটল তাঁর চেহারায়। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, এবার আমরা তৈরি। অপেক্ষা শুধু সঠিক সময়ের।'

'কখন সেটা?' জানতে চাইলেন ডা. উইনচেস্টার।

'আমার হিসেব বলছে, পরশু... মানে একত্রিশে জুলাই।'

'তারিখটার বিশেষত্ব কী?' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলাম আমি।

'প্রাচীন মিশরীয় ক্যালেণ্ডারের চতুর্থ মাস চলছে এখন,' ব্যাখ্যা করলেন মি. ট্রেলনি। 'এই মাসটা নিয়ন্ত্রণ করে *রা*, মানে সূর্য-দেবতা। প্রতিদিন সকালে তার উদয়কে পুনরুত্থানের প্রতীক বলে ভাবত মিশরীয়রা। কাজেই মাসটাও পুনর্জীবন এবং পুনরুত্থানের সময় বলে বিবেচিত। আমাদের হিসেবে গত পঁচিশ তারিখে শুরু হয়েছে মাসটা, সাতের প্রতি টেরার দুর্বলতা চিন্তা করলে সপ্তম দিনে ওর জেগে ওঠার কথা... মানে, একত্রিশ তারিখে!'

'তার মানে আর একদিন পরেই আমাদের মহা-পরীক্ষা?'

'ঠিক ধরেছ।'

সতেরো

সন্দেহ ও ভয়

ছোট ছোট অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বড় বড় জিনিস শিখি। যুগ-যুগান্তরের ইতিহাস আসলে ছোট ছোট ঘটনার সমষ্টি বৈ তো কিছু নয়! স্বর্গীয় দেবদূতেরা প্রতিটি মানুষের সারাজীবনের যে-বিবরণ তৈরি করেন, তা-ও ওই ছোট ছোট কাজেরই যোগফল। রঙ চড়িয়ে কিছু লেখেন না তাঁরা, তাঁদের কলমে শুধুমাত্র উঠে আসে মানুষটির জীবনের আলো-আঁধারগুলো। সত্যকে কোনও কিছু দিয়ে আড়াল করা যায় না। আমাদের সমস্ত চিন্তা, আবেগ, আশা, নিরাশা, ভালবাসা, ভয়... একসময় না একসময় ঠিকই প্রকাশ পেয়ে যায়। এসব তখনই ঘটে, যখন

সারাজীবনের অভিজ্ঞতা আর জ্ঞান কোনও কাজে আসে না।

নিজের কথা বলছি আমি, চরম মুহূর্তটির আগে প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় আমাদের হাতে—এর ভিতর নিজের সমস্ত জ্ঞান-বুদ্ধি ব্যবহার করেও আশান্বিত, কিংবা নিরাশ... কোনোটাই হতে পারছি না। পুরো ব্যাপারটাই আমার জন্য নতুন, তাই সন্দেহের দোলাচলে দুলছি সারাক্ষণ; কখনও মন উদ্বেল হয়ে উঠছে অমিত সম্ভাবনায়, আবার কখনও বা পতিত হচ্ছি সীমাহীন অন্ধকারে।

দিনদুটোর ভিতরে উজ্জ্বল কিছু মুহূর্ত ছিল আমার জন্য। আমার জন্য মার্গারেটের টান আর ভালবাসা অনুভব করতে পারছিলাম ওই সময়টাতে, মন থেকে সমস্ত সন্দেহ উবে যাচ্ছিল সকালের সূর্যের সামনে কুয়াশা মিলিয়ে যাবার মত। কিন্তু ওই মুহূর্তগুলোর সঙ্গে ভারসাম্য রাখার জন্যই যেন বাকি সময়টাতে বিষাদ ছেয়ে রয়েছিল কালো পর্দার মত। যে-সময়টার প্রতীক্ষাতে রয়েছিলাম, সেটা বড় দ্রুত এগিয়ে আসছিল; সবকিছু শেষ হয়ে যাবার একটা আতঙ্ক আঁকড়ে ধরেছিল আমাকে। বিষয়টা আমাদের সবার জন্য জীবন-মরণের সমতুল্য, তার জন্য প্রস্তুতি নিতে হচ্ছিল সারাক্ষণ। ঝুঁকির ব্যাপারে আমি আর মার্গারেট একমত ছিলাম, তবে ভাবছিলাম না তা নিয়ে। পরীক্ষাটার ধর্মীয় দিকও আমাকে খুব একটা পীড়া দিচ্ছিল না; যদিও যে-ধর্মবিশ্বাস নিয়ে আমি বড় হয়েছি, তার সম্পূর্ণ বিপরীত ওটা—একজন মৃত মানুষকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টাকে কোনও ধর্মই সমর্থন করে না। মহা-পরীক্ষার ফলাফল কী হবে, সেটা একটা সন্দেহের বিষয় বটে; তবে ওটা খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার, এমন একটা জিনিসের ব্যাপারে সন্দেহ হবে না তো হবেটা কী? অতএব ওটাও আমাকে তেমন একটা ভাবনায় ফেলছিল না। পাঠক তা হলে কৌতূহলী হয়ে উঠতে পারেন, আমার বিষাদটা

ছিল কী নিয়ে?

মার্গারেটকে নিয়ে! ওকে সন্দেহ করতে শুরু করেছিলাম আমি!

না, ওর ভালবাসা, সম্মান, সত্যতা, দয়া, কিংবা উৎসাহ... ওসব নিয়ে সন্দেহ ছিল না আমার। সন্দেহ ছিল মানুষটাকে নিয়েই।

বদলে যাচ্ছিল মার্গারেট। গত কয়েকদিনে আমি যে-মার্গারেটকে দেখেছি, তার সঙ্গে পুরনো মার্গারেটের যেন কোনও মিলই নেই। আনমনা হয়ে গেছে ও; প্রায়ই এমন একটা অদ্ভুত অবস্থায় থাকে, যেন ওর পুরনো সত্তা হারিয়ে গেছে শরীরের ভিতর থেকে। ওই সময়টাতে খুবই সতর্ক দেখি ওকে—আশপাশে কী ঘটছে না-ঘটছে, সে-ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন। কিন্তু যখন স্বাভাবিক হয়, তখন যেন ভিন্ন একটা মানুষে পরিণত হয়... হাবভাবে মনে হয়, এর আগের সময়টাতে আমাদের মাঝেই ছিল না ও!। লণ্ডন থেকে রওনা দেবার আগে ফুরফুরে মেজাজে ছিলাম আমি, ওর ভালবাসা নিয়ে মনে কোনও দ্বিধা ছিল না, কিন্তু কাইলিয়নে পৌঁছুনোর পর থেকে তাতে ফাটল ধরতে শুরু করেছে। ওকে দেখে বুঝতেই পারি না, কোন্ রূপে রয়েছে—পুরনো সেই প্রাণোচ্ছল মেয়েটি হয়ে, নাকি নতুন ওই গম্ভীর মানুষটি! ভয় করে আমার, এই পরিবর্তন কোথায় গিয়ে ঠেকে সেটা ভাবলেই বুক শুকিয়ে আসে। রীতিমত যুদ্ধ করে মনকে শান্ত রাখি, ভালবাসাকে কমতে দিই না।

সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, ব্যাপারটা নিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলতে পারছি না। ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার মত ঘনিষ্ঠ কেউ নেই এ-বাড়িতে... একমাত্র মার্গারেট ছাড়া! কিন্তু ওর সঙ্গে তো ওকেই নিয়ে কথা বলা যায় না। তাই কষ্টটা বুকে চাপা দিয়ে রেখে আশায় থাকতে হয় আমাকে—ভাবতে হয়,

এসব সাময়িক; খুব শীঘ্রি সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমাদের মধ্যে যে অদৃশ্য একটা দেয়াল সৃষ্টি হতে শুরু করেছে, তা বোধহয় মার্গারেট নিজেও বুঝতে পারছে। ইদানীং ঘন ঘন আমার কাছে আসে ও, সময় দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ওতে দূরত্বটা দূর হয় না; বরং জোর খাটিয়ে ঘনিষ্ঠ থাকার চেষ্টা ওটা বাড়িয়ে দেয় আরও।

সময় কাটছে ঢিলেঢালাভাবে। গুহাটা সাজিয়ে ফেলার পর কারও হাতেই তেমন কোনও কাজ নেই, যার যার মত থাকছি সবাই। চাকর-বাকর নেই, তাই নিজের কাজ নিজে করছি, রান্না-বান্নায় সবাই হাত লাগাচ্ছি, তারপরও অনেকটা সময়ই থেকে যাচ্ছে হাতে। করার কিছু না থাকায় গুহা সাজানোর পরদিন বিকেলে হাঁটতে বেরুলাম। একাই যেতে হলো, মার্গারেটকে ডাকতে গিয়ে দেখি, গম্ভীর হয়ে আছে, আমার কথাই শুনছে না; কী আর করা!

ক্লিফের ধারে গিয়ে বসলাম। সমুদ্র থেকে ভেসে আসা তাজা বাতাসে মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল যেন। নির্জনতা পেয়ে নিজের সন্দেহগুলোকে বিশ্লেষণ করতে শুরু করলাম যুক্তি দিয়ে। বদলে গেছে মার্গারেট... কিন্তু কীভাবে? কী বদলেছে? চরিত্র, হৃদয়, নাকি স্বভাব? ওর সম্পর্কে যা যা জানি, সেগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে থাকলাম; শুরু করলাম জন্ম থেকে।

শুরুটাই তো গোলমেলে। মি. করবেকের মতে, মার্গারেটের জন্ম হয়েছে এমন একটা সময়ে, যখন তিনি আর মি. ট্রেলনি আসওয়ানের এক সমাধিতে চৈতন্যহীন অবস্থায় ছিলেন। চৈতন্য হারানোর জন্য দায়ী এক মৃত রানী, যে কিনা ছায়াশরীর নিয়ে বিরাজ করছে পৃথিবীতে! ছায়াশরীরের জন্য দূরত্ব বলে কিছু নেই, তার জন্য আসওয়ান থেকে লণ্ডনে আসতে কোনও সময়ই লাগার কথা নয়। এমন কি হতে পারে, মিসেস ট্রেলনির সঙ্গে

বাচ্চাটাও মারা গিয়েছিল, কিন্তু টেরা আবার ওকে বাঁচিয়ে তুলেছে... ভিতরে নিজের আত্মা দিয়ে দিয়েছে?

সচকিত হয়ে উঠলাম। তাই তো! প্রাচীন মিশরীয়দের বিশ্বাস যদি সত্যি হয়ে থাকে, তা হলে মৃত রানীর *কা* এবং *খু*-র পক্ষে যে-কোনও জড় পদার্থে প্রাণসঞ্চার করা সম্ভব। তার মানে মানে দাঁড়ায়, আসল বাচ্চাটা সত্যিই মারা গিয়েছিল; আমরা মি. ট্রেলনির যে-সন্তানকে দেখছি, তা স্রেফ রানী টেরার একটা ছায়ামাত্র... তার উদ্দেশ্যকে সফল করবার জন্য যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। টেরা হয়তো জানত, তার মমি-কে নিয়ে আসবেন মি. ট্রেলনি, পুনরুত্থানের সময় ভদ্রলোকের কাছেই থাকবে সে... তাই হয়তো নিজের একজন অনুচর তৈরি করেছে সাহায্য পাবার জন্য!

যুক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উঠল আমার মন। মার্গারেট বলে সত্যিকার অর্থে কেউ নেই, তা কী করে হয়? কীভাবে বিশ্বাস করি, যাকে ভালবেসেছি, সে স্রেফ একটা প্রতিবিম্ব... কয়েক হাজার বছর আগে মারা যাওয়া এক রানীর তৈরি করা... স্বার্থ উদ্ধারের জন্য! না, তা হতে পারে না! অমন কাউকে আমি ভালবাসতে পারি না, মার্গারেটের ভিতর অন্যরকম একটা প্রাণশক্তি আছে, ওটাই আকৃষ্ট করেছে আমাকে। এই প্রাণশক্তি টেরার হতে পারে না।

কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও মনকে টলাতে পারলাম না যুক্তি থেকে। মি. করবেকের কথা মনে পড়ছে বার বার। রানী টেরার ছবিগুলোর সঙ্গে মার্গারেটের বিস্ময়কর সাদৃশ্য আছে—এ কাকতালীয় হতে পারে না। মার্গারেটের মা কখনও দেখেননি ওসব ছবি, নইলে নাহয় ভাবা যেত যে, ওগুলোর প্রভাব পড়েছিল তাঁর মনে... সন্তানের চেহারা হয়ে গেছে ছবির মত। কিন্তু ব্যাপার তো তা নয়! মি. ট্রেলনিও ওই সমাধিতে ঢোকার

আগে কখনও দেখেননি ছবিগুলো। চিন্তাটা কিছুতেই তাড়াতে পারলাম না মন থেকে, আতঙ্ক পেয়ে বসল আমাকে। সন্দেহটা ধীরে ধীরে নিরেট আকার ধারণ করতে শুরু করেছে, আশার দু-একটা ক্ষীণ আলো যা-ও ছিল এতদিন, তা হারিয়ে যেতে শুরু করেছে অন্ধকারে।

জোর করে বিকল্প ভাবতে চেষ্টা করলাম। মার্গারেটের জন্মের সঙ্গে রানী টেরার সম্পর্ক অস্বীকারের উপায় নেই, কিন্তু অন্যত্র তো থাকতে পারে! বাচ্চাটা হয়তো মারা যায়নি, শুধু টেরা তার অস্তিত্বে নিজের একটা অংশ ঢুকিয়ে দিয়েছে—এমন হতে পারে না? সময় সময় সেই অংশটাই হয়তো জেগে উঠছে... দখল করে নিচ্ছে মার্গারেটকে! ভাল করে ভাবতেই সম্ভাবনাটার বাস্তবতা চোখে পড়ল। কিন্তু এরপরও সারকথা একই থাকছে। মার্গারেটকে স্বাভাবিক ভাবতে পারছি না। বেশ কিছু বিষয় উঠে আসছে সামনে।

প্রথমত, রানীর সঙ্গে মার্গারেটের মিল। এ কাকতালীয় নয়, টেরার চেহারা সম্পর্কে কারও কোনও ধারণা ছিল না সমাধিতে মি. ট্রেলনি ঢোকার আগে। কাজেই এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে, মার্গারেটের জন্মের উপর টেরার হাত আছে।

দ্বিতীয়ত, আমার কামরা থেকে ভ্যান হাইনের বইটা গায়েব হয়ে যাওয়া। ওটা চাকররা কেউ নিয়েছে বলে মনে হয় না। সেক্ষেত্রে একমাত্র মার্গারেটই নিতে পারে।

তৃতীয়ত, সাজঘরের কেবিনেটে প্রদীপগুলো খুঁজে পাওয়া। দরজা-জানালা বন্ধ থাকা একটা হোটেল কক্ষে চুরিটা যেভাবে হয়েছে, তা কেবল ছায়াশরীরে রানী টেরাই করতে পারে। সে-ই হয়তো ওগুলো মার্গারেটের মাধ্যমে নিয়ে এসেছিল বাড়িতে।

চতুর্থত, সার্জেন্ট ড ও ডা. উইনচেস্টারের সন্দেহ। এর পিছনে বাস্তব ভিত্তি থাকা অসম্ভব নয়। মার্গারেটের হাত থাকতে

পারে ওর বাবার উপরে হামলাতে... হয়তো ওর অজ্ঞাতে!

পঞ্চমত, মার্গারেটের ভবিষ্যদ্বাণী। গত কয়েকদিনে অনেকবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছে ও—একটাও ভুল হয়নি। কেবলমাত্র জাদুবিদ্যায় পারদর্শী টেরার পক্ষেই অমন ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব।

ষষ্ঠত, এ-বাড়িতে পৌঁছুনোর পর সপ্তর্ষির রত্নটা হারাবার ঘটনা। মি. ট্রেলনি ওটা খুঁজে পাচ্ছিলেন না, ও-ই বলেছে শোবার ঘরে খুঁজে দেখতে। পরে ওখানেই পাওয়া গেল!

আর সবশেষে... মার্গারেটের দুই ধরনের আচরণ। ইদানীং ওকে দেখে মনে হয় যেন দুটো সত্তা বাস করছে ওর ভিতর। একটার সঙ্গে অন্যটার কোনও মিল নেই।

দ্বৈত সত্তা! হ্যাঁ, একমাত্র ওভাবে ভাবলেই মার্গারেটের পরস্পরবিরোধী আচরণ, আর ওকে ঘিরে ঘটতে থাকা অদ্ভুত ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আলাদা একটা অস্তিত্ব আছে ওর, কিন্তু তাকে সম্ভবত প্রভাবিত করতে পারে টেরা, ইচ্ছেমত কাজ করাতে পারে। ওর উপর ভর করতে পারে রানীর অতিপ্রাকৃত শক্তি। যদি এই শক্তির উদ্দেশ্য খারাপ কিছু না হয়, তা হলে অসুবিধে নেই, কিন্তু যদি...। আর ভাবতে পারলাম না। ভয়ঙ্কর সম্ভাবনাগুলোর কথা মাথায় আসতেই দাঁতে দাঁত পিষলাম।

গতকাল পর্যন্ত মার্গারেটের পরিবর্তনটা ছিল ক্ষণিকের, কিন্তু আজ সকাল থেকে দেখছি অন্য রূপ। সারাক্ষণই নতুন সত্তাটায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে ও, ওর অস্তিত্বকে গ্রাস করেছে যেন ওটা। ভয় করে উঠল আমার, রানী টেরার ভয়ঙ্কর ক্রোধের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ভ্যান হাইনের সময় থেকে আজ পর্যন্ত অনেকে মারা গেছে তাতে। মমির হাত চুরি করেছিল যে-লোকটা, সে মরেছে প্রথমে; তাকে কবর দিতে গিয়ে মরেছিল আরেকজন।

বেদুঈন শেখ-ও মরেছিল ভ্যান হাইনের কাছ থেকে সপ্তর্ষির রত্নটা চুরি করতে গিয়ে। মি. ট্রেলনির অভিযানে ঠেলাগাড়ির মাল চুরি করতে গিয়ে মরেছিল দুজন, মমি নিয়ে সমাধিতে ফিরে গিয়ে মরেছে আরও তিন আরব। শেষজন মরেছে লুকানো সারড্যাবটা খুলতে গিয়ে। মোট ন'টা মৃত্যু! এর মধ্যে কয়েকটা ঘটেছে রানীর নিজের কাটা হাত দিয়ে। এমনকী মি. ট্রেলনির উপরও হামলা করেছিল টেরা... ভদ্রলোক বেঁচে গেছেন বটে, কিন্তু মরতেও তো পারতেন!

ভাবনাটা আতঙ্ক জাগাবার মত। নিজের পরিকল্পনা অটুট রাখবার জন্য যে-রানী এতগুলো মৃত্যু ঘটাতে পারে, সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বসলে কী করবে সে? পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্য কী-ই না করতে পারে টেরা! আসলে কী তার উদ্দেশ্য, কী তার ইচ্ছে? কেন আবার পা রাখতে চায় ধরণীর বুকে? আমরা যদ্দূর জানি, তা তো কেবল ঘোর-লাগা অবস্থায় মার্গারেট যা বলেছে, ততটুকুই। এর ভিতর সত্য কতখানি, কে জানে! টেরা কি সত্যিই মহৎ কোনও উদ্দেশ্য পুষে রেখেছে মনে? নাকি তার সীমাহীন ক্ষমতা দিয়ে অশুভ কিছু করতে চায় নতুন পৃথিবীতে? যদি তা-ই হয়, তা হলে ওকে ঠেকাবার মত কেউ থাকবে কি? জেনে-শুনে একটা অভিশাপকে পৃথিবীর বুকে পুনর্জন্ম নিতে দেয়া কি উচিত হবে আমাদের?

দ্বিধায় ভুগতে শুরু করলাম, মার্গারেট আর ওর বাবাকে কি বিষয়টা নিয়ে সতর্ক করে দেব, নাকি চুপচাপ গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাব? শেষ পর্যন্ত সময়-সুযোগ বুঝে প্রথমটাই করব বলে ঠিক করলাম।

বাড়ির ভিতর আমি যখন ফিরে এলাম, তখন শরীরে নতুন উদ্যম অনুভব করছি। চিন্তা-ভাবনা পরিষ্কার করতে পেরেছি, একটা সিদ্ধান্তও নিতে পেরেছি—তাই এ-পরিবর্তন। মার্গারেট...

পুরনো মার্গারেটের দেখা পেলাম বাড়িতে ঢুকতেই, মনটা ভাল হয়ে গেল আরও।

ডিনারের পর, পিতা-কন্যাকে একা পেতেই তুললাম আমি প্রসঙ্গটা। ইতস্তত করে বললাম, 'একটু সতর্ক থাকা দরকার না? ধরুন, আমাদের কাজ যদি রানীর পছন্দ না হয়... মানে, মহা-পরীক্ষার আগে, বা পরে...'

কথা শেষ হবার আগেই জবাব দিয়ে ফেলল মার্গারেট। 'খামোকা দুশ্চিন্তা করছ, ম্যালকম। টেরা যেভাবে চেয়েছে, ঠিক সেভাবেই সব করছে বাবা। ভয়ের কোনও কারণ নেই।'

মাথা নাড়লাম। 'আমি তা মানতে পারছি না। ওর ইচ্ছে ছিল একশো ফুট উঁচু একটা পাহাড়ের গায়ে তৈরি সমাধিতে জেগে উঠবার... যেখানে আর কেউ থাকবে না। নির্জনতা চাইছিল ও। কিন্তু এখানে তো নির্জনতা পাচ্ছে না, তার উপর সম্পূর্ণ ভিনদেশে নিয়ে এসেছি ওকে আমরা—এখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতি মিশরের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। কিছু মনে কোরো না, ভয় পাওয়া অবশ্যই উচিত আমাদের। সামান্য সব কারণে ন'জন মানুষ মরেছে ইতোমধ্যে... হয় রানীর নিজের হাতে, কিংবা তার প্রভাবে। মাঝে মাঝে ও খুবই নির্দয় হয়ে উঠতে পারে!'

আমার কথা শুনে মি. ট্রেলনি রেগে যান কি না, সেটা ভয় করছিলাম। কিন্তু শান্ত রইলেন তিনি। মুচকি হেসে বললেন, 'প্রিয় রস, এক অর্থে ঠিকই বলেছ তুমি। রানী নির্জনতা চেয়েছিল বটে। ওর পছন্দের পরিবেশে পরীক্ষাটা করতে পারলেও ভাল হতো। কিন্তু ভ্যান হাইন ওর সমাধিতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ওটা অসম্ভব হয়ে পড়েছে... সমাধির পবিত্রতা নষ্ট হয়ে গেছে। এর জন্য আমি দায়ী নই। হ্যাঁ, ওর জায়গায় আমি থাকলে একই কাজ করতাম হয়তো; এক হিসেবে অপরাধটার

ভাগীদার আমাকেও ধরা যায়, কারণ ওর বই পড়ে উৎসাহী হয়ে উঠি আমি, সমাধিতে গিয়ে ভিতরের সবকিছু নিয়ে আসি লণ্ডনে। কিন্তু কাজটা আমি করেছি নিতান্তই অজ্ঞতাবশত। রানীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে তখন জানা ছিল না আমার। কিন্তু যখন জেনেছি, তখন ওর সেই উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছি আমি। ভুল-ত্রুটি হতে পারে—হয়তো রানীর লেখা সঙ্কেতগুলোর ঠিকমত পাঠোদ্ধার করতে পারিনি, কিংবা ছোটখাট কোনও বিষয় চোখ এড়িয়ে গেছে। তবে নিশ্চিত থাকতে পারো, ইচ্ছাকৃতভাবে কোথাও কোনও ত্রুটি রাখিনি। নিজের জান-প্রাণ আমি বিলিয়ে দিয়েছি এই মহা-পরীক্ষার পিছনে। রানীর সেটা জানবার কথা।'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি। 'কিন্তু কেন করছেন এসব? মরা মানুষকে জীবিত করা যায়—এটা প্রমাণের জন্যে? এতে কী লাভ? বৈজ্ঞানিক কোনও আবিষ্কার হতে যাচ্ছে না এটা; জাদুবিদ্যা আর অতিপ্রাকৃত শক্তির কৌশল দেখব কেবল আমরা। এতে দুনিয়ার কী উপকার হবে?'

চোখদুটো জ্বলে উঠল মি. ট্রেলনির। 'তুমি লাভ-ক্ষতির কথা বলছ? ভাবছ, স্রেফ নেশার ঘোরে এর পিছনে ছুটছি আমি? খামোকা নিজের সবচেয়ে প্রিয় মানুষ... আপন মেয়েকে বিপদে ফেলছি? তোমাকে-আমাকে, সবাইকে ঝুঁকির মধ্যে টেনে এনেছি? ব্যাপারটার গুরুত্বই তুমি বুঝতে পারছ না, রস। মৃতদেহে প্রাণ ফেরানো কি যা-তা কথা? কত বড় একটা অর্জন হবে ওটা... আমাদের জন্য, সারা পৃথিবীর জন্য! এই বিজ্ঞানের যুগে যেসব বিষয়ে আমরা চোখ-কান বুজে আছি, সেগুলো নিয়ে আবার মাথা ঘামাতে শুরু করবে সবাই। পুরনো যুগের যেসব জ্ঞান আমরা হারিয়ে ফেলেছি, সেগুলো আবার ফিরে আসতে শুরু করবে। অতীত-বর্তমানের মধ্যে যোগসূত্র সৃষ্টি হবে। রানী

টেরা যদি সত্যিই জীবিত হতে পারে, তা হলে ওর কাছ থেকে ইতিহাসের কত না অজানা অধ্যায় জানতে পারব আমরা! এমন সব জিনিস শিখতে পারব, যা কোনোদিন কল্পনাও করিনি।'

উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন মি. ট্রেলনি, তাঁর হাত চেপে ধরে সান্ত্বনা দিল মার্গারেট। তারপর তাকাল আমার দিকে।

'তোমার কথায় যুক্তি আছে, ম্যালকম,' বলল ও। 'হ্যাঁ, ন'জন মানুষের প্রাণ নিয়েছে টেরা—ওরা ওর পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে। কিন্তু তুমিই ভেবে দেখো, ওর জায়গায় তুমি নিজে থাকলেও কি একই কাজ করতে না? নিজের জীবনের জন্য লড়াই করছিল ও! শুধু জীবন বলি কেন, আরও বড় কিছুর জন্য। জীবন, ভালবাসা, আর ভবিষ্যতের পৃথিবীর অমিত সম্ভাবনার জন্য! বিশাল একটা উদ্দেশ্য নিয়ে ঘুমিয়ে ছিল ও, সামান্য কোনও চোর, বা ডাকাতের জন্য কেন সেটা নষ্ট হতে দেবে? তুমি নিজেও কি ওই পরিস্থিতিতে রুখে দাঁড়াতে না? হাজার বছরের স্বপ্ন, আশাকে টিকিয়ে রাখতে যুদ্ধ করতে না? এর জন্য যদি নীতিহীন দু-একটা মানুষের জীবন নিতে হতো, তা হলে কি তুমি পিছিয়ে যেতে?'

কথাগুলো বলতে বলতে মার্গারেটও উত্তেজিত হয়ে উঠল। ওর হাতে চাপ দিলেন মি. ট্রেলনি।

'চমৎকার বলেছ, মা। একেবারে টেরার মনের কথা। যেন ও-ই কথাগুলো বলল তোমার মুখ দিয়ে!'

একটু চমকে উঠলাম ভদ্রলোকের প্রতিক্রিয়া শুনে। মনে হচ্ছে তিনিও আমার ধারাতেই চিন্তা করেছেন মার্গারেটকে নিয়ে। আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন তিনি, মনের কথা বুঝতে পেরেছেন। বললেন, 'হ্যাঁ, অমনটাই ধারণা আমার। আমার মেয়ের ভিতর শুধু ওর মা নয়, রানী টেরাও বাস করে। এজন্যেই আমার কাছে ও দ্বিগুণ আপন। ওর জন্য ভেবো না, ম্যালকম

রস। কোনও ক্ষতি হবে না ওর... ক্ষতি হবে না আমাদের কারোই।'

'বাবা ঠিক বলেছে,' বলল মার্গারেট। 'রানী আমাদের উদ্দেশ্য জানে। আমাদের ক্ষতি করবে না ও—এটা আমি নিশ্চিত!'

চোখদুটোয় অদ্ভুত একটা আভা খেলা করছে ওর, কণ্ঠে দৃঢ় প্রত্যয়। ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে গেলাম আমি।

ঠিক তখুনি হাজির হয়ে গেলেন মি. করবেক আর ডা. উইনচেস্টার। আলোচনার প্রসঙ্গটা পাল্টে ফেললাম আমরা।

আঠারো

চূড়ান্ত প্রস্তুতি

সেদিন রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম আমরা। পরদিন অনেক কাজ—রাতে তো মহা-পরীক্ষাতেই অংশ নিতে হবে; তা ছাড়া দিনের বেলাটাও ব্যস্ত থাকতে হবে এক্সপেরিমেন্টের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিতে... যাতে শেষ মুহূর্তে কোথাও গলদ থেকে না যায়। বলে রাখা ভাল, পরীক্ষার সময় বিপদ দেখা দিলে বাইরের সাহায্য চেয়ে খবর পাঠানোর ব্যবস্থা আছে বাড়িতে, যদিও তার কোনও প্রয়োজন হবে বলে মনে হচ্ছে না কারোই। লণ্ডনে যে-ধরনের হামলা মোকাবেলা করতে হয়েছে আমাদের, তা এখানে আর হবার কথা নয়।

কিছুটা স্বস্তি অনুভব করতে শুরু করেছি আমি ট্রেলনি

পরিবারের পিতা-কন্যার সঙ্গে কথা বলবার পর থেকে। মি. ট্রেলনির যুক্তিগুলো বেশ দাগ কেটেছে আমার মনে। ঠিকই তো, রানী টেরা ইচ্ছে পূরণ করবার জন্য চেষ্টা করে চলেছি আমরা—এই পরিস্থিতিতে আমাদের ক্ষতি করবার কথা নয় ওর। সেজন্যেই স্বস্তি। গতকাল পর্যন্ত বিপদ-আপদের ব্যাপারে যে-উদ্বেগ অনুভব করছিলাম, আজ তা কেটে গেছে অনেকখানি। যেটুকু রয়ে গেছে, তা মার্গারেটের কারণে। ওর দ্বৈত সত্তা নিয়ে ভাবছি সারাক্ষণ। এখন পর্যন্ত সত্তা-দুটো আলাদা রয়েছে, কিন্তু রানী জেগে ওঠার পর কী হবে? যতই ভাবলাম, ততই আবার শঙ্কা জেঁকে বসল হৃদয়ে। মার্গারেট, কিংবা ওর বাবা যে বিষয়টা নিয়ে মোটেই ভয় পাচ্ছে না—সেটা আর মাথায় থাকল না। ভালবাসা বড়ই স্বার্থপর একটা জিনিস; সামান্যতম দ্বিধাতেই যে-কোনও বিষয়ের উপর সন্দেহ আর ভয়ের কালো ছায়া বিস্তার করে। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লেও তাই আর ঘুম এল না, এপাশ-ওপাশ করতে থাকলাম বিছানায়।

নিস্তব্ধ বাড়িতে টিক টিক করতে থাকা ঘড়ির কাঁটার শব্দ শুনতে পেলাম পরিষ্কারভাবে—রাত ধীরে ধীরে গভীর হয়ে চলেছে। নির্ঘুম চোখে তাকিয়ে রইলাম জানালার দিকে, ওখানে অন্ধকারকে ধীরে ধীরে গাঢ়, তারপর আবার ফিকে হতে দেখলাম। সকাল হতে চলেছে, সূর্য উঠতে দেরি নেই। সারা রাত জেগে থেকেছি আমি।

আর শুয়ে থাকার মানে হয় না, উঠে পড়লাম বিছানা ছেড়ে। রুম থেকে বেরিয়ে সাবধানে ঘুরে এলাম বাকি সবার কামরার সামনে দিয়ে, আর কেউ আমার মত অবস্থায় আছে কি না, দেখার জন্য। সতর্কতার জন্য দরজা ফাঁকা রেখে শুয়েছে সবাই, বিপদ হলে যেন অন্যেরা সাহায্য করতে পারে। একটার পর একটা দরজা দিয়ে উঁকি দিলাম, আর হতাশ হতে থাকলাম।

ভারী শ্বাস ফেলার শব্দ শুনছি—গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সবাই, খালি আমিই অনিদ্রায় আক্রান্ত।

রুমে ফিরে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করলাম ঈশ্বরের কাছে, তারপর কাপড় পাল্টে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। আগেই শুনেছি, ক্লিফের কাছে একটা সিঁড়ি আছে—পাথর কেটে বানানো হয়েছে সাগরে নামার জন্য; ওটা খুঁজে বের করলাম। সিঁড়ি ধরে নেমে গেলাম পানিতে, সাঁতার কাটলাম কিছুক্ষণ। যখন উঠে এলাম, তখন ঠাণ্ডা সাগরের পানি অনেকটাই শান্ত করে এনেছে আমাকে। গা মুছে আবার উঠে এলাম ক্লিফে।

বাড়িতে ঢোকার আগেই উঁকি দিল সূর্য—আমার পিছনে, সাগরের বুকে সোনালি আভা ঢেলে ঝলমল করে উঠল পুবের আকাশ। চারপাশে উজ্জ্বল আলো, তাও আমার মনটা আঁধার হয়ে রইল। কেন যেন মনে হচ্ছে, একটা ঝড় ঘনিয়ে আসছে। উদাস হয়ে তাকিয়ে রইলাম সূর্যোদয়ের দিকে।

হঠাৎ কাঁধে নরম হাতের স্পর্শ পেয়ে সংবিৎ ফিরল। ঘাড় ফেরাতেই মার্গারেটকে দেখতে পেলাম—ভোরের প্রথম আলোয় অপূর্ব লাগছে ওকে। এ আমারই মার্গারেট—কোমল, মায়াবী, প্রেমময়ী মার্গারেট। জড়িয়ে ধরলাম ওকে। সময়ের কথা ভুলে গেলাম আমরা, ভুলে গেলাম পারিপার্শ্বিকতার কথা; ক্লিফের ধারে বসে মেতে গেলাম গল্পে, হাত ধরাধরি করে হাঁটলাম সমুদ্র থেকে ভেসে আসা বাতাসে। অজানা, অশুভ একটা নিয়তি যে অপেক্ষা করছে সামনে, সেটা আর মাথায় রইল না; অন্যভুবনে হারিয়ে গেলাম আমরা।

বাড়ি ফিরতেই ফিরে যেতে হলো কঠোর বাস্তবে... ভয়, সন্দেহ, আশা, নিরাশা, আর উদ্বেগের জগতে। তবে ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার উপায় রইল না, সামনে অনেক কাজ। ব্রেকফাস্ট সেরে গুহায় চলে গেলাম আমরা, মি. ট্রেলনি রীতিমত একটা

লেকচার দিয়ে ফেললেন ওখানে—কোন্ আর্টিফ্যাক্ট কোথায় বসবে, কেন বসবে... তা ব্যাখ্যা করলেন আমাদের কাছে। হাতে একটা বিশাল কাগজের রোল রেখেছেন তিনি, তাতে টেরার সমাধির বিস্তারিত ড্রয়িং; মি. করবেকের কাছে তাঁদের অভিযানের অরিজিন্যাল জার্নালটা রয়েছে—এ দু'য়ের সঙ্গে গজ-ফিতা দিয়ে মিলিয়ে সমস্ত জিনিসের অবস্থান নিশ্চিত করতে শুরু করলেন মি. ট্রেলনি; বাকিরা তাঁকে সাহায্য করলাম। মাপামাপি করছি, দরকার হলে জিনিসপত্র সরিয়ে ঠিক জায়গায় বসাচ্ছি... আরও কত কী!

চার্টের বাইরেও বেশ কিছু জিনিস আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করলেন মি. ট্রেলনি। যেমন, সপ্তভুজ বাক্স আর ওটার সঙ্গের নিচু টেবিলটা। টেবিলের উপরে খাঁজ আছে, সেটার ভিতর বসাতে হবে বাক্সটাকে। টেবিলের পায়াগুলোরও বৈশিষ্ট্য আছে, জড়িয়ে থাকা সোনালি সাপগুলো বিভিন্ন প্রজাতির—ওগুলোকে নির্দিষ্ট একেকটা দিক করে বসাতে হয়। টেরার মমিটা নিয়ে আসা হয়েছে একটা আলাদা কাঠের কফিনে, সেখান থেকে ওটাকে বের করলাম আমরা, সারকোফাগাসের ভিতর নামিয়ে রাখলাম। দেহের আকৃতিটা তলার খাঁজে মিলে গেল পুরোপুরি—পশ্চিমে মাথা, আর পূর্বে পা... এই ভঙ্গিতে থাকল দেহটা।

'হুঁ, সম্ভবত পৃথিবীর চৌম্বকত্বের কোনও প্রভাব পড়বে টেরার উপর,' মমিটার পজিশন দেখে বললেন মি. ট্রেলনি। 'অন্য কোনও শক্তিও হতে পারে অবশ্য। জাদুর বাক্সটা খুলে যাবার পর বোঝা যাবে ব্যাপারটা।' সারকোফাগাসের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তিনি, চোখ বোলালেন হাতের চার্টের উপরও। তারপর বললেন, 'একটা ব্যাপারে খালি আমার ধন্দ লাগছে। হয়তো কিছুই নয়, তারপরও এ-ধরনের একটা পরীক্ষায় কোনও কিছুই ছোট করে দেখা উচিত নয়...'

'কীসের কথা বলছেন?' জানতে চাইলেন মি. করবেক।

ওঁর দিকে ঘাড় ফেরালেন মি. ট্রেলনি। 'মমি-পিটের ওই চেম্বারটার কথা মনে আছে? সারকোফাগাসটা ছিল উত্তরের দেয়ালের কাছে, দক্ষিণে ছিল জাদুর বাক্স আর নিচু টেবিলটা। পুরো জায়গাটাই... মানে দেয়াল, মেঝে, ছাদ... সব ভরা ছিল হায়ারোগ্লিফে। কিন্তু সারকোফাগাসটার তলার মেঝেতে কিছু ছিল না—ফাঁকা ছিল জায়গাটা।'

'হ্যাঁ, মনে আছে। আমরা তো ভেবেছিলাম, সারকোফাগাসটা রাখার পরে আঁকা হয়েছে সঙ্কেতগুলো, তাই জায়গাটা খালি।'

'আমার এখন আর তা মনে হচ্ছে না,' মাথা নাড়লেন মি. ট্রেলনি। 'হ্যাঁ, ফাঁকা জায়গাটার উপর-নীচে লেখার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছে বটে; কিন্তু তারপরও কোথাও কোথাও যেন গোপন সঙ্কেত দেয়ার চেষ্টা রয়েছে—কী সেই সঙ্কেত, সেটাই বুঝতে পারছি না।'

'এ কথা কেন ভাবছেন?'

চার্টটা মেলে ধরলেন মি. ট্রেলনি। আঙুল ঠেকালেন কয়েকটা জায়গায়। 'এই দেখো, এই পয়েন্টগুলোর উপর-নীচে একই প্রতীক দু'বার ব্যবহার করা হয়েছে। যেন আলাদা কোনও লেখার অংশ ওগুলো। এই দেখো না, মাথা আর পায়ের কাছে প্রতীকগুলো কোথাও কোথাও তিনবারও ব্যবহার করা হয়েছে! আর এই যে...' আরও কয়েকটা জায়গা দেখালেন তিনি, 'এগুলো দেখো। সূর্যের প্রতীক সবখানে, কিন্তু আধা! সারকোফাগাসের কিনারায় এসে কাটা পড়ে গেছে। অনিচ্ছাকৃত নয় ব্যাপারটা। আমার মনে হচ্ছে, দিগন্তে সূর্য ওঠা, বা ডোবার ইঙ্গিত করা হচ্ছে এর মাধ্যমে। এগুলোর সঙ্গে আবার একটা করে ফুলদানির ছবি আছে, উল্টো করে আঁকা... যেন সূর্যের উপর নির্ভর করছে অস্তিত্ব। ফুলদানি হচ্ছে *আব*, মানে হৃদয়ের প্রতীক—এটা তো

জানো? এই হৃদয়ের পিঠে আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি *কা*, মানে সত্তার প্রতীক—কনুই থেকে দুটো হাত, দু'দিকে মেলা। প্রতীকটা আবার সবখানে এক নয়। মাথার কাছেরগুলোতে হাতদুটো মেলে ধরা হয়েছে ফুলদানির দিকে, পায়েরগুলোতে ঠিক উল্টো!'

'জটিল সঙ্কেত তো!' বলে উঠলেন ডা. উইনচেস্টার। 'মানে কী এর?'

'সঠিক অর্থ তো বলতে পারব না,' বললেন মি. ট্রেলনি, 'তবে আমি নিজের মত একটা অনুবাদ দাঁড় করিয়েছি। সেটাই শোনো। আমার মতে এখানে বলছে—পশ্চিম থেকে পূর্বে সূর্য যাবার সময়... মানে, সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত... সোজা কথায় রাতে আর কী... মৃতের *আব*, বা হৃদয় তার দেহের ভিতর জেগে ওঠে, নড়াচড়া করে; যা ওটা দিনের বেলায় করতে পারে না। তবে হৃদয়ের সমস্ত নড়াচড়া ওই দেহের ভিতরেই সীমাবদ্ধ, ওটা দেহ ছেড়ে বেরুতে পারে না। কিন্তু দেহটার *কা*, বা সত্তা, মানে... কায়াহীন অস্তিত্ব এ-ধরনের কোনও সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ নয়। দিন কি রাত, যখনই হোক না কেন, মৃতের *কা* পৃথিবীর যে-কোনও জায়গায় বিচরণ করতে পারে।'

'বাব্বাহ্! বড্ড জটিল কথা! কী বোঝাতে চাইছে?'

'আমার ধারণা, এটা একটা সতর্কবাণী। বলতে চাইছে যে, মানুষ মরে যাবার মানেই তার চেতনা হারিয়ে যাওয়া নয়। মৃতের প্রতি যেন অসম্মান দেখানো না-হয়, সেটার জন্যই সাবধান করে দিচ্ছে হয়তো।'

ডা. উইনচেস্টার মুখ খুলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বাধা পেলেন মাঝপথে। মি. ট্রেলনির কথা শেষ হয়নি।

তিনি বললেন, 'অবশ্য আরও একটা অর্থ হতে পারে কথাটার—পুনরুত্থানের রাতে রানীর *কা* চিরতরে ছেড়ে চলে যাবে তার *আব*-কে। জেগে উঠবে সে, তবে শুধুই

শারীরিকভাবে—দেহটার ভিতর তার সত্তা থাকবে না!'

'কী বলছেন!' বললাম আমি। 'সত্তাই যদি না থাকল, তা হলে জ্যান্ত একটা দেহ দিয়ে লাভ কী? টেরার সমস্ত জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা রয়েছে সত্তার ভিতর, ওটা চলে গেলে তো এক অর্থে ও-ই হারিয়ে যাবে।'

'ঠিক বলেছ,' মাথা ঝাঁকালেন মি. ট্রেলনি। 'তবে ওসব নিয়ে খামোকা মাথা ঘামানো বোধহয় ঠিক হবে না। কথাগুলো ঠিকমত অনুবাদ করতে পেরেছি কি না, তা-ই বা কে জানে! তা ছাড়া হৃদয়, বা দেহ ছেড়ে *কা* পুরোপুরি চলে যেতে পারে না কখনও—প্রাচীন মিশরীয়রা তেমনটাই বিশ্বাস করত। ওদের মতে সত্তা হচ্ছে মানুষের অস্তিত্বের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাজেই উদ্বিগ্ন হবার মানে হয় না। প্রথম অনুবাদটাই মনে হয় ঠিক।'

'সতর্ক করার ব্যাপারটা?'

'হ্যাঁ। এর পিছনে প্রমাণও দেখতে পেয়েছি আমরা। আসলে কবর-লুঠ কোনও আধুনিক অপরাধ নয়। টেরার সময়ের আগে থেকেই মন্দ লোকেরা করে আসছে কাজটা। তাই ও-ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে রেখেছিল ও। অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার কথা বাদই দিলাম, লুকানো সারড্যাবটার কথা ভাবো। ওটা বানানো হয়েছিল প্রদীপগুলো লুকিয়ে রাখবার জন্য, ভিতরে একটা ফাঁদও রাখা হয়েছিল—ওতে আরব চোরটা মারা পড়ে। সমাধিটাও বানানো হয়েছিল খুবই অদ্ভুত একটা জায়গায়—পাহাড়ের উপরে; ওখানে ওঠার পথ ছিল না, মুখটাও লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।'

একমত হলাম সবাই, মি. ট্রেলনির যুক্তি বুঝতে পারছি।

'বাবা, চার্টটা আমাকে একটু দেবে?' বলল মার্গারেট। 'এখানকার কাজ শেষ হলে ওটা আমি একটু স্টাডি করতে

চাই।'

'নিশ্চয়ই,' বললেন মি. ট্রেলনি। 'এই নাও।'

কাগজের রোলটা মেয়ের হাতে তুলে দিয়ে আমাদের দিকে ফিরলেন তিনি। পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যাপার ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন।

'যদি ইমার্জেন্সি দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে এখানকার ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমটা সবার জেনে রাখা ভাল। বাড়ির সবখানেই বিদ্যুতের সরবরাহ আছে, এটা খেয়াল করেছ নিশ্চয়ই? বাইরে থেকে আসেনি লাইনটা, বিদ্যুৎটা আমরা পাচ্ছি বাড়ির ভিতরেই বসানো এক সেট টারবাইন থেকে—ক্লিফের নীচে সাগরের জোয়ার-ভাটার মাধ্যমে শক্তি পায় ওটা... জলবিদ্যুতের প্রক্রিয়ায়। সম্পূর্ণ নিজস্ব একটা ইলেকট্রিক্যাল সোর্স থাকায় আমাদেরকে বিদ্যুৎ-সঙ্কটে ভুগতে হবে না কোনও অবস্থাতেই। এসো তোমরা, আমি পুরো সিস্টেমটা... সেই সঙ্গে সমস্ত সুইচ আর ফিউয দেখিয়ে দিচ্ছি, যাতে ইমার্জেন্সিতে যে-কেউ অপারেট করতে পারো।'

মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমাদেরকে সব দেখিয়ে দিলেন মি. ট্রেলনি। ভদ্রলোকের প্রস্তুতি দেখে চমৎকৃত হলাম; সত্যিই সব ধরনের বিপর্যয়ে বিদ্যুৎ-সরবরাহ অক্ষুণ্ন রাখার ব্যবস্থা করেছেন তিনি।

গুহায় ফিরে এলাম আমরা। মি. ট্রেলনি এবার নতুন আরেকটা প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন।

'এবার আমাদের ঠিক করতে হবে, মহা-পরীক্ষাটা আমরা ঠিক কখন করব... মানে সময়টা। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্য সময়ের আলাদা কোনও গুরুত্ব নেই, প্রস্তুতিটাই বড় কথা। সবকিছু প্রস্তুত থাকলে যে-কোনও সময়েই যে-কোনও পরীক্ষা করা যায়। কিন্তু এখানে আমরা কাজ করতে যাচ্ছি

প্রাচীন জাদুবিদ্যা, এবং অতিপ্রাকৃত শক্তি নিয়ে। তাই বিজ্ঞানের দৃষ্টিটা ঝেড়ে ফেলে নজর দিতে হবে রানী টেরার রেখে যাওয়া সঙ্কেতগুলোর দিকে। এটুকু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, পুনরুত্থানটার সঙ্গে সূর্যাস্তের একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। সারকোফাগাসের কিনারায় যে-আধা সূর্যগুলো দেখা যাচ্ছে, সেটা সূর্যাস্তের প্রতীক বলেই আমার বিশ্বাস। এরপর ভাবতে হবে "সাত" সংখ্যাটার প্রতি রানীর আসক্তির কথা। ওর পুরো জীবনই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সংখ্যাটার মাধ্যমে। এ-দু'টো একত্র করলে নির্দ্বিধায় বলা যায়, সূর্যাস্তের পর সপ্তম ঘণ্টাতে সময়টা ঠিক করতে হবে। পঞ্জিকা বলছে, কর্নওয়ালে আজ সন্ধ্যা আটটায় সূর্য ডুববে; সেক্ষেত্রে রাত তিনটায় পরীক্ষাটা শুরু করতে হবে আমাদেরকে। এতে কারও কোনও আপত্তি, বা দ্বিমত আছে?'

দেখা গেল, নেই। থাকবার কথাও নয়। ধীর-স্থির ও নিশ্চিত ভঙ্গিতে কথা বলছেন মি. ট্রেলনি, মনের মধ্যে কোনও সন্দেহ নেই তাঁর। এই দৃঢ়তার মুখে আমাদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা হারিয়ে গেছে, নীরবে তাঁকে শুধু অনুসরণ করে চলেছি আমরা। মার্গারেটের মুখেও স্মিত হাসি—বুঝতে পারছি, পিতার প্রস্তাবে ও-ও একমত।

মনটা কেন যেন কুডাক ডেকে উঠল। মহা-পরীক্ষার সময় ঠিক করবার সঙ্গে সঙ্গে যেন আমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। ফাঁসির আসামী মনে হলো নিজেকে, শাস্তির ক্ষণ জানতে পেরে ছটফট করা ছাড়া আর কিছু যার করার থাকে না।

পরিস্থিতি আসলেই তা-ই। ফিরে যাবার আর উপায় নেই, সব এখন ঈশ্বরের হাতে।

সত্যিই কি ব্যাপারটা ঈশ্বরের হাতে? তিনি কি নাক গলাবেন এর ভিতর? নাকি অজানা কোনও শক্তির হাতে আমাদেরকে

ধ্বংস হয়ে যেতে দেবেন? ভয় করছে আমার... ভীষণ ভয় করছে! নিজের জন্য যত না, তার চেয়ে বেশি মার্গারেটের জন্য...

মি. ট্রেলনির কণ্ঠ শুনে বাস্তবে ফিরে এলাম।

'প্রস্তুতি প্রায় শেষ আমাদের, শুধু প্রদীপগুলো ঠিকঠাক করা বাকি। এসো, কাজটা সেরে ফেলি।'

ভদ্রলোকের নির্দেশে বের করে আনা হলো প্রদীপগুলো, ঝেড়ে-মুছে ওগুলোয় সিডারের তেল ভরলাম, সলতে লাগালাম। আগুন জ্বেলে প্রতিটাই পরখ করে দেখলাম আমরা, ঠিকমত জ্বলে কি না। সন্তুষ্ট হয়ে বেরিয়ে এলাম গুহা থেকে।

পড়ন্ত বেলা তখন, ঘড়িতে চারটা। অবাক লাগল, কখন সময় পেরিয়ে গেছে, টেরই পাইনি।

তাড়াতাড়ি লাঞ্চ সারলাম আমরা, তারপর সবাইকে ছেড়ে দিলেন মি. ট্রেলনি। রাতের পরীক্ষার জন্য যার-যার মত তৈরি হতে বললেন। মার্গারেটের চেহারা ফ্যাকাসে মনে হলো আমার কাছে—ক্লান্তির ছাপ পড়েছে। তাই ওকে ঘুমিয়ে নিতে পরামর্শ দিলাম। মৃদু হেসে ও জানাল, চেষ্টা করবে। তারপর আমাকে চুমো খেয়ে চলে গেল নিজের কামরায়। মনটা ফুরফুরে হয়ে উঠল, চলে গেলাম ক্লিফের ধারে। কোনও কিছু নিয়ে আর ভাবতে চাইছি না; তাজা বাতাস, আর সূর্যের কোমল আলোয় কিছুটা সময় কাটাবার ইচ্ছে—আসন্ন কঠিন সময়টার জন্য এর চাইতে ভাল প্রস্তুতি আর কিছু হতে পারে না।

বাড়ির ভিতর যখন ফিরে এলাম, তখন সবাই বৈকালিন চা'য়ের জন্য জমায়েত হয়েছে। একটু হাসি পেল আমার—অদ্ভুত, অনিশ্চিত একটা সময়েও আমরা নিজেদের দৈনন্দিন কর্মসূচি, কিংবা চাহিদা থেকে বিচ্যুত হতে পারছি না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ওদের সঙ্গে আমিও বসে পড়লাম।

পুরুষরা সবাই বিমর্ষ হয়ে আছে। বিশ্রামের সময় পেয়েছে সবাই, একই সঙ্গে চিন্তা-ভাবনারও। আমার মত সন্দেহ আর ভয়ের দোলাচলে ভুগতে শুরু করেছে তাই। মার্গারেট অবশ্য ব্যতিক্রম, চেহারায় ঔজ্জ্বল্য লক্ষ করলাম ওর, কী এক অজানা প্রত্যাশায় যেন উন্মুখ হয়ে আছে। তবে হাবভাবে ওকে পুরনো মার্গারেট বলে মনে হলো না, দ্বিতীয় সত্তাটা যেন ভর করেছে আবার। চা শেষ হতেই ক্ষমা চেয়ে নিজের রুমে চলে গেল ও, ফিরল কয়েক মিনিট পরে। হাতে মি. ট্রেলনির দেয়া চার্টটা।

পিতার কাছে বসে ও বলল, 'বাবা, তোমার কথা নিয়ে অনেক ভেবেছি আমি। লুকানো অর্থ আর সঙ্কেতের কথা বললে না? ভাল করে দেখলাম তাই ড্রয়িংগুলো।'

'কিছু বুঝতে পারলে?' কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন মি. ট্রেলনি।

'হ্যাঁ। আরেকটা অর্থ হতে পারে এর।'

'তাই নাকি?' উত্তেজিত হয়ে উঠলেন মি. ট্রেলনি। 'কী সেটা?'

অদ্ভুত একটা স্বরে প্রশ্নটার জবাব দিল মার্গারেট, যেন উত্তরটার মধ্যে কোনও সন্দেহ নেই। 'লেখাটার মানে হচ্ছে—সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে *আব*-এর ভিতর প্রবেশ করবে *কা;* সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আবার বেরিয়ে যাবে।'

'বলে যাও!'

'অর্থটা পরিষ্কার—আজ রাতের জন্য রানীর সত্তা... যা এমনিতে স্বাধীন... ওর হৃদপিণ্ডে অবস্থান করবে, আজ ওর সেই স্বাধীনতা থাকবে না। ব্যাপারটা বুঝতে পারছ? সূর্য ডুবলেই ছায়াশরীর, কিংবা অদৃশ্য শক্তির আর অস্তিত্ব থাকবে না; রানীর দেহে হৃদয় আর সত্তা একত্রিত হয়ে থাকবে। থাকবে আগামীকাল সূর্যোদয় পর্যন্ত, যদি না আমরা আমাদের

মহা-পরীক্ষার মাধ্যমে অবস্থাটাকে স্থায়ী করে দিতে পারি... ওকে জাগিয়ে তুলতে পারি! ব্যর্থ হলে আবার ওর *কা* মুক্ত হয়ে যাবে। কাজেই তোমরা যে ওর অতিপ্রাকৃত শক্তির ব্যাপারে ভয় পাচ্ছ, সেটা একেবারেই অমূলক। আজ রাতে কোনও শক্তিই থাকবে না ওর, কারও কোনও ক্ষতি করবার ক্ষমতা থাকবে না। নিজের চোখেই দেখবে, ও স্রেফ এক হতভাগী নারী—প্রায় অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করছে আজকের বিশেষ রাতটির জন্য। এই প্রতীক্ষায় নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছে ও, স্বাধীনতা ত্যাগ করেছে... শুধুই নতুন একটা জীবনের জন্য, নতুন একটা পৃথিবীকে দেখার জন্য...'

আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েছিল মার্গারেট, হঠাৎ নিজেকে সামলাল। বোধহয় বুঝতে পারছে, কথাগুলো আকুল আবেদনের মত শোনাচ্ছে। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিল ও, চকিতের জন্য ওর চোখে পানি দেখতে পেলাম।

মি. ট্রেলনির দিকে দৃষ্টি ঘোরাতেই অবাক হয়ে গেলাম। এই প্রথমবারের মত মেয়ের আবেগ তাঁকে স্পর্শ করেনি। থমথমে চেহারা নিয়ে তিনি তাকিয়ে রইলেন সন্তানের দিকে, ওকে সান্ত্বনা দেবার কোনও চেষ্টা করলেন না। ভদ্রলোক এত কঠিন হতে পারেন, তা ভাবতে পারিনি।

গম্ভীর গলায় তিনি শুধু বললেন, 'সময়মত তোমার এই কথার সত্যতা পরখ করে দেখব আমরা।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, সিঁড়ি ধরে চলে গেলেন দোতলায়। বিস্মিত চোখে পিতার গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল মার্গারেট, ওঁর এই আচরণ ও নিজেও আশা করেনি বোধহয়।

আমরা কেউ কিছু বললাম না, এই পরিস্থিতিতে বলা শোভনও হবে না। রুমাল বের করে চোখ মুছল মার্গারেট, ক্ষমা

চেয়ে চলে গেল নিজের রুমে। আমরাও উঠে পড়লাম। মি. করবেক আর ডা. উইনচেস্টার যার-যার কামরায় চলে গেলেন, আমি গেলাম দোতলার পিছনদিককার টেরাসে। সাগরের অপূর্ব সৌন্দর্য দেখতে দেখতে ডুবে গেলাম ভাবনায়।

মি. ট্রেলনি কিছু বলুন, আর না-ই বলুন—মার্গারেটের কথাকে অবিশ্বাস করতে পারছি না। এখন পর্যন্ত ওর প্রত্যেকটা ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হয়েছে, এটা হবে না কেন? সত্যিই হয়তো রানী টেরা তার ভয়ঙ্কর ক্ষমতাটা হারাতে চলেছে। আজ রাতে তা হলে নিরাপদে কাজ করতে পারব আমরা, মাথার উপর শঙ্কার মেঘ ঝুলে থাকবে না। যতই ভাবলাম, ততই দৃঢ় হলো বিশ্বাসটা। শেষে বহুদিন পর স্বস্তি পেতে শুরু করলাম, তাই রুমে ফিরে গিয়ে গা এলিয়ে দিলাম বিছানায়।

হঠাৎ করে মি. করবেকের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল আমার। চোখ মেলতেই দেখলাম ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়।

'তাড়াতাড়ি গুহায় চলুন!' উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন তিনি। 'মি. ট্রেলনি সবাইকে এক্ষুনি ডেকেছেন ওখানে।'

ধড়মড় করে উঠে বসলাম। 'ক্...ক'টা বাজে?'

'আটটা প্রায়। জলদি করুন।'

'আটটা! এখনই ডাকাডাকি কেন?'

'কথা বাড়াবেন না তো!' বিরক্ত গলায় বললেন করবেক। 'তাড়াতাড়ি আসুন, আমি যাচ্ছি।'

দ্রুত নিজের পোশাক-আশাক ঠিক করে নিলাম, তারপর প্রায় ছুটতে ছুটতে চলে গেলাম গুহাতে। সবাই উপস্থিত ওখানে, বাকি ছিল মার্গারেট, আমি যাবার একটু পর ও-ও হাজির হয়ে গেল—সঙ্গে সিলভিও-কে নিয়ে এসেছে। পুরনো শত্রু মমি-বেড়ালটাকে দেখামাত্র চঞ্চল হয়ে উঠল প্রাণীটা, হামলা

করতে চাইল, কিন্তু দু'হাতের ভাঁজে ওকে শক্ত করে আটকে রাখল মার্গারেট; ঘাড়ে হাত বুলিয়ে শান্ত করার প্রয়াস চালাল।

হাতঘড়ির দিকে তাকালাম আমি। আটটা বাজল বলে।

মার্গারেট পৌঁছুতেই কয়েক মুহূর্ত নীরবতা বিরাজ করল গুহাতে, তারপর মি. ট্রেলনি মেয়ের মুখোমুখি এসে বললেন, 'তোমার বিশ্বাস, রানী টেরা আজ রাতে স্বেচ্ছায় নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে রাজি আছে? আমাদের পরীক্ষা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত স্রেফ একটা মমি হয়ে পড়ে থাকবে ও? ঠিকমত ভেবে বলো, কারণ ওর কিন্তু কোনও রকম ক্ষমতা থাকবে না। ওকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা সফল হোক, বা ব্যর্থ... তাতে ওর কিছুই করার থাকবে না।'

একটু চুপ করে থাকল মার্গারেট, তারপর পরিষ্কার গলায় বলল, 'হ্যাঁ, ও রাজি!'

চুপ করে থাকার মুহূর্তটিতে অস্বাভাবিক একটা পরিবর্তন এসেছে ওর ভিতর—অবয়ব, ভাবভঙ্গি, কথা বলার স্বর... সবকিছু বদলে গেছে অদ্ভুতভাবে। সিলভিও-ও খেয়াল করেছে ব্যাপারটা, শরীর মুচড়ে মালকিনের বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করল বেড়ালটা, লাফ দিয়ে নেমে পড়ল মাটিতে। মার্গারেট যেন দেখেও দেখল না। ভেবেছিলাম মমি-বেড়ালটার দিকে ছুটে যাবে সিলভিও, কিন্তু তা করল না। আতঙ্কে সিঁটিয়ে গেছে অবলা প্রাণীটা—*মিউ মিউ* করে লেজ গুঁজল পায়ের ফাঁকে, চলে এল আমার কাছে... গুটিসুটি মেরে পড়ে রইল।

মি. ট্রেলনি আবার মুখ খুললেন। 'যা বলছ, তার ব্যাপারে তুমি কতটুকু নিশ্চিত? মন থেকে বিশ্বাস করো কথাটা?'

মার্গারেটের চোখের পলক পড়ল না। পিতার চোখে চোখ রেখে বলল, 'আমি জানি! বিশ্বাসের চেয়েও অনেক বড় আমার এই জানাটা।'

'হুম,' বললেন মি. ট্রেলনি। 'এতই যখন বিশ্বাস, তা হলে প্রমাণ দাও না কেন? ধরো তুমিই রানী টেরা; আমি যে-প্রমাণই চাই, তা দিতে রাজি আছ?'

'হ্যাঁ, যে-কোনও প্রমাণ!'

'যদি বলি, তোমার বাহনকে ত্যাগ করতে হবে? ওকে মরতে দিতে হবে?'

থমকে গেল মার্গারেট, ঠোঁট তিরতির করে কাঁপতে শুরু করেছে ওর—যেন নিজের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করছে। চোখে শূন্য এক দৃষ্টি... কোনও জীবিত মানুষের দৃষ্টি এমন হতে পারে না। ফ্যাল ফ্যাল করে আমরা বাকি তিনজন দেখছি সব, দুর্বোধ্য একটা কিছু ঘটে চলেছে চোখের সামনে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন মি. ট্রেলনি, জবাব পাচ্ছেন না দেখে চলে গেলেন গুহার একপাশে, আলো-বায়ু চলাচলের যে-জানালাগুলো আছে, তার একটার শাটার সরিয়ে দিলেন। তাজা বাতাসের পাশাপাশি অস্তায়মান সূর্যের আলো এসে ঢুকল গুহাতে। সোনালি আভা ছড়িয়ে সাগরের বুকে ডুবে যাচ্ছে সূর্যটা। সেদিকে তাকিয়ে গমগমে গলায় মি. ট্রেলনি বললেন, 'সিদ্ধান্ত নাও! কথা বলো! সূর্য ডুবে গেলে কিন্তু আর কিছু করার থাকবে না আমাদের!'

চোখ দুটো জ্বলে উঠল মার্গারেটের। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল ও। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, তাতেও রাজি আমি।'

সূর্যের আলো থেকে সরে গেল ও, ছায়ায় পড়ে থাকা টেবিলের কাছে গেল, হাত বোলাল মমি-বেড়ালটার গায়ে। গা শিরশির করে উঠল আমার দৃশ্যটা দেখে।

ঘুরল মার্গারেট, ওর শরীরের চারপাশে মনে হলো আঁধার জমাট বেঁধেছে। সেখান থেকে ভেসে এল কণ্ঠ।

'যা-খুশি নাও! আমি... টেরা... আজ রাতের জন্য নিঃস্ব! এই

রাত দেবতাদের। সদ্ব্যবহার করো সুযোগের!'

কথাটা শেষ হতে না হতেই টুপ করে ডুবে গেল সূর্য। আঁধার নেমে এল ধরণীর বুকে। আমার পায়ের কাছ থেকে লাফিয়ে উঠল সিলভিও, ছুটে চলে গেল মার্গারেটের কাছে। মমি-বেড়ালটার দিকে নজর দিচ্ছে না, মালকিনের পায়ে গা ঘষে কোলে ওঠার আবদার জানাচ্ছে।

নিচু হয়ে বেড়ালটাকে তুলে নিল মার্গারেট—ওর চেহারায় আবার কমনীয়তা ফিরে এসেছে। মুখ যখন খুলল, কণ্ঠস্বরে শুনতে পেলাম পুরনো সেই সত্তার নরম, মিষ্টি সুর। করুণ গলায় ও বলল, 'সূর্য ডুবে গেছে, বাবা। আবার কখনও দেখব কি না, জানি না। চরম রাতটা এসে পড়েছে!'

উনিশ

মহা-পরীক্ষা

মনের মধ্যে সামান্যতম দ্বিধাও যা ছিল, দূর হয়ে গেছে আমাদের। রানী টেরার কায়াহীন অস্তিত্বের ব্যাপারে আর কোনও সন্দেহ নেই, অল্প একটু সময়ের মার্গারেটের আচরণটা আমাদের মনে স্থির বিশ্বাসের জন্ম দিয়ে ফেলেছে। সামনে একটা কঠিন সময় অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য, ওটার কথা ভুলতে পারছি না কেউই, তারপরও ঘটনাটা স্বস্তির পরশ বোলাতে শুরু করেছে। ব্যাপারটা বিস্ময় জাগানোর মত—গত কয়েকদিনে অজানা একটা আতঙ্কের মধ্যে বাস করছিলাম সবাই; সেটার স্বরূপ সামনে

আত্মপ্রকাশ করামাত্র আমাদের কুঁকড়ে যাবার কথা ছিল, কিন্তু কেন যেন তা ঘটেনি। হ্যাঁ, মার্গারেটের মুখে টেরার ভাষা শুনতে পেয়ে গা শিরশির করছে বটে, তবে তা ভয়াবহ কিছু নয়।

সবার মধ্যেই একটা পরিবর্তন লক্ষ করলাম আমি। মার্গারেট বিমর্ষ হয়ে গেছে, ডা. উইনচেস্টার হয়ে উঠেছেন অতিমাত্রায় উৎসাহী, করবেক ডুবে গেছেন স্মৃতি-রোমন্থনে। আমার মনটাও কিছুটা ফুরফুরে হয়ে গেছে—বিকেলেই মার্গারেটের কথা শুনে স্বস্তি পাচ্ছিলাম; একটু আগের ঘটনাটা তো নিশ্চিত-ই করে দিল—আজ রাতে বিপদের কোনও ভয় নেই।

ব্যতিক্রম শুধু মি. ট্রেলনি। ভদ্রলোকের মধ্যে কোনও পরিবর্তন নেই, আগের মতই আছেন তিনি। সারাটা জীবন এই বিশেষ সময়টার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন তিনি, কোনও কিছুতেই তাই আর ইতিবাচক, বা নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে না তাঁর উপর। নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় রয়েছেন; মূল উদ্দেশ্য পূরণের পথে যেসব পদক্ষেপ রয়েছে, সেগুলোই শুধু গুরুত্ব পাচ্ছে তাঁর কাছে, অন্যগুলো নয়। রানী টেরার প্রতিশ্রুতি তেমনই একটা অবিবেচ্য বিষয় ভদ্রলোকের জন্য। বিপদের আশঙ্কা কমে গেল, এটা ঠিক, হয়তো কিছুটা স্বস্তিও পেলেন—কিন্তু চেহারায় তার কোনও ভাব ফুটল না। হাজারো বিপদ থাকলেও পিছাতেন না তিনি, পরীক্ষাটা করেই ছাড়তেন।

নির্বিকার ভঙ্গিতে আমাদের নির্দেশ দিলেন মি. ট্রেলনি—হলঘরে একটা ওক কাঠের টেবিল আছে, ওটা নিয়ে আসতে হবে গুহায়। মোটামুটি লম্বা ওটা, তবে চওড়া নয়। ধরাধরি করে সহজেই বয়ে আনা গেল, গুহার মাঝখানে একগুচ্ছ বাতির তলায় রাখলাম আমরা টেবিলটা।

মার্গারেট কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কী করতে যাচ্ছ তুমি, বাবা?'

'মমি-বেড়ালটার আবরণ খুলে ফেলব। আজ রাতে বাহনটাকে আর প্রয়োজন নেই টেরার। নিজের ব্যাপারে কথা দিয়েছে ও, বেড়ালটার ব্যাপারে দেয়নি। ওটা আমাদের হামলা করে বসতে পারে ওর ইশারায়—তা হতে দেব না।'

বুঝতে পারলাম, কেন বেড়ালটাকে খতম করে দেয়ার ব্যাপারে রানীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছেন মি. ট্রেলনি, সবদিকেই ওঁর কড়া নজর।

আঁতকে উঠল মার্গারেট কথাটা শুনে। মি. ট্রেলনি বললেন, 'কী, ভয় পাচ্ছ?'

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল মার্গারেট। বলল, 'না। সিলভিও-র কথা ভাবছিলাম। এই বেড়ালটার জায়গায় ও থাকলে কেমন লাগত আমার, সেটাই মনে পড়ল।'

ছুরি আর কাঁচি নিয়ে এলেন মি. ট্রেলনি। মমি-বেড়ালটাকে রাখা হলো টেবিলের উপর। আমাদের মহা-পরীক্ষার নির্মম প্রারম্ভ ওটা। গভীর রাতে যখন আসল অংশটা শুরু হবে, তখন কী ঘটতে পারে, ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। নতুন করে অশুভ অনুভূতিটা ফিরে এসেছে মনে—নির্জনতা আর পরিচিত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হবার চিন্তা প্রকট হয়ে উঠছে গুহার বাইরে গর্জন করতে থাকা বুনো বাতাস, আর সাগরের ক্রুদ্ধ ঢেউয়ের আওয়াজে। তবে ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবারও উপায় নেই, একটা গুরুদায়িত্ব ভর করেছে কাঁধে। তাই শুরু হলো মমিটার আবরণ খোলা।

অগণিত পরত ব্যাণ্ডেজে মুড়ে রাখা হয়েছে প্রাচীন বেড়ালটাকে—কঠিন বাঁধনে আটকা পড়ে আছে বিটুমিন, আঠা, এবং বিভিন্ন ধরনের আরকে। ফড়ফড় করে ছিঁড়তে থাকল ওগুলো, লালচে ধুলোর একটা আস্তর উড়ল—ব্যাপারটা মনের উপর চাপ সৃষ্টি করে চলল অবিরাম। শেষ পর্যন্ত যখন লিনেনের

ব্যাণ্ডেজের আবরণ সরে গেল, তখন রাজকীয় ভঙ্গিমায় বসে থাকা একটা প্রাণী দেখতে পেলাম আমরা—বিশাল আকৃতির একটা বাঘা-বেড়াল! চোখ বন্ধ, কিন্তু পুরো শরীরটা দেখাচ্ছে একেবারে জ্যান্ত পশুর মত। চামড়া মোটেই টান টান হয়ে নেই, রেশমি পশমগুলো অক্ষত—বাতির আলোয় ঝিলিক মারছে। গোঁফগুলো ব্যাণ্ডেজের চাপে মুখের পাশে বসে গিয়েছিল, আবরণ সরে যেতেই খাড়া হয়ে গেল।

ভাল করে প্রাণীটার দিকে তাকাতেই আমাদের সবার শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল আতঙ্কের একটা শীতল স্রোত। বেড়ালটার মুখ আর পায়ের থাবায় শুকিয়ে আছে রক্ত... নতুন রক্ত!

সবার আগে চমকটা সামলে নিলেন ডা. উইনচেস্টার। পেশায় চিকিৎসক, রক্ত জিনিসটা তাঁর জন্য নতুন কিছু নয়। একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে রক্তের ছোপগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলেন তিনি। পিছনে শব্দ করে শ্বাস ফেললেন মি. ট্রেলনি—যেন বিশাল একটা বোঝা নেমে গেছে ওঁর কাঁধ থেকে।

'ইন্টারেস্টিং! এর থাবায় দেখছি সাতটা নখ!' বলে উঠলেন ডাক্তার। 'দেখা যাক, আমার অনুমান ঠিক কি না!'

পকেট থেকে নোটবুক নিয়ে একটা কাগজ বের করলেন তিনি—চিনতে পারলাম ওটা। ব্লটিং পেপারের ওই টুকরোটাতে সিলভিও-র আঁচড়ের দাগ নিয়েছিলেন ভদ্রলোক, মি. ট্রেলনির হাতের ক্ষতেরও পেন্সিল-ডায়াগ্রাম এঁকেছিলেন। কাগজটা মমি বেড়ালের পায়ের নীচে ধরলেন, দাগগুলো মিলে গেল পুরোপুরি।

'হ্যাঁ, এটাই হামলা চালিয়েছিল আপনার উপর,' মি. ট্রেলনির দিকে তাকিয়ে রায় জানানোর সুরে বললেন ডাক্তার। 'আর কোনও সন্দেহ নেই।'

ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলাম আমরা বেড়ালটাকে। নিখুঁত

সংরক্ষণটাকে হিসেবে না ধরলে আর কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। যত দেখলাম, ততই বিস্ময় জাগল। এমনকী স্টাফ করা জন্তু-জানোয়ারও এত জান্তব হয় না, বেড়ালটা যেন এখুনি হাঁটাচলা করতে শুরু করবে!

মি. ট্রেলনি এগিয়ে গিয়ে দু'হাতে তুলে নিলেন বেড়ালটাকে। তাঁর পিছনে চঞ্চল হয়ে উঠল মার্গারেট। বলল, 'সাবধান, বাবা! ওটা আবার হামলা করতে পারে!'

'সে-ভয় নেই,' শান্ত স্বরে বললেন মি. ট্রেলনি। '...অন্তত এখনকার জন্য।' সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন তিনি।

মার্গারেট অস্পষ্ট গলায় জানতে চাইল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'কিচেনে,' জবাব দিলেন মি. ট্রেলনি। 'আগুনে পোড়াব বেড়ালটাকে। ছাইয়ের ভিতর ছায়াশরীর জমাট বাঁধতে পারে না, কারও বিপদও ঘটাতে পারে না।' সঙ্গে যাবার জন্য আমাদেরকে ইশারা করলেন তিনি।

ফুঁপিয়ে উঠে অন্যদিকে ফিরল মার্গারেট। তাড়াতাড়ি ওকে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে গেলাম; কিন্তু ও বলল, 'না, তুমি ওদের সঙ্গে যাও, ম্যালকম। তোমার সাহায্য দরকার হতে পারে বাবার। ...ওহ্, আমার সহ্য হচ্ছে না! এ তো খুন! বেচারি টেরার বেড়ালটা...' মুখ ঢেকে ফেলল ও, আঙুলের ফাঁক দিয়ে পানি গড়াতে দেখলাম।

কিচেনে গিয়ে বড় চুলোটায় লাকড়ি সাজালাম আমরা—অগ্নিকুণ্ডের আকৃতিতে। তারপর জ্বেলে দিলাম আগুন। কয়েক মিনিটের মধ্যে লেলিহান শিখা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করল আগুন। মৃত বেড়ালটাকে তার ভিতর ছুঁড়ে দিলেন মি. ট্রেলনি। একটা কালো ছায়া হয়ে কয়েকটা মুহূর্ত আগুনের ভিতর পড়ে রইল ওটা, তারপর শুরু করল পুড়তে। কিচেন ভারি হয়ে গেল পশম পোড়ার গন্ধে, তারপর পুড়তে শুরু

করল শুকনো মাংস। মমি করায় ব্যবহৃত আরকগুলো বাড়তি জ্বালানি হিসেবে কাজ করল—নানান রকম রঙ ছড়িয়ে ফুঁসে উঠল আগুনের শিখা, ক্রুদ্ধ গর্জনে কানে তালা লেগে যেতে চাইল। বেশ কয়েক মিনিট চলল এই তাণ্ডবলীলা, শেষে যখন শান্ত হলো আগুন, রানী টেরার প্রিয় বাহনের আর চিহ্নমাত্র নেই।

গুহায় ফিরলাম আমরা, দেখলাম—বাতি নিভিয়ে অন্ধকারে বসে আছে মার্গারেট। বায়ু-চলাচলের জানালা দিয়ে আসা চাঁদের আলোয় আবছাভাবে শুধু দেখা যাচ্ছে অবয়বটা। মি. ট্রেলনি এগিয়ে গিয়ে ওর পাশে বসলেন, সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে হাত রাখলেন পিঠে। মার্গারেটও তাঁর কাঁধে মাথা রাখল।

কথা বলল না, কয়েক মিনিট নীরবে ওভাবেই বসে রইল পিতা-কন্যা। খানিক পর মি. ট্রেলনি বললেন, 'রস, বাতিগুলো জ্বেলে দাও।'

নির্দেশটা পালন করতেই উজ্জ্বল আলোয় আবার ভরে গেল গুহার অভ্যন্তর। মার্গারেটের দিকে তাকালাম, নিজেকে সামলে নিয়েছে ও—চোখদুটো শুকনো। ব্যাপারটা লক্ষ করে মি. ট্রেলনিও যেন স্বস্তি পেলেন।

আমাদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'শেষ মুহূর্তের জন্য সবকিছু ফেলে রাখার মানে হয় না। এসো, পরীক্ষার কাজ এখুনি কিছুটা এগিয়ে রাখি।'

ঝট্ করে পিতার দিকে তাকাল মার্গারেট। 'এখন আবার কী করবে?'

মেয়ের দিকে ফিরলেন মি. ট্রেলনি। নরম গলায় বললেন, 'টেরার মমিটার আবরণ খুলব আমরা।'

'না-আ! কী বলছ! বে-আব্রু করবে ওকে? এখানে... এতগুলো পুরুষের সামনে? আলোতে?'

'সমস্যা কোথায়?' ভুরু কোঁচকালেন মি. ট্রেলনি।

'ভাবো, বাবা। একটা মেয়ে... একা, নিঃসঙ্গ! ওকে তুমি এভাবে অসম্মান করতে পারো না! খুব... খুব নিষ্ঠুর একটা কাজ হবে ওটা!'

আবেগ উথলে উঠেছে মার্গারেটের ভিতর। গাল হয়ে উঠেছে টকটকে লাল, চোখে টলমল করছে অশ্রু। ব্যাপারটা লক্ষ করে নরম স্বরে ওকে সান্ত্বনা দিতে শুরু করলেন মি. ট্রেলনি। আমি দূরে সরে যেতে চাইলাম, কিন্তু ভদ্রলোক ইশারায় কাছে থাকতে বললেন। বুঝলাম, আমার প্রতি মার্গারেটের টান কাজে লাগাতে চাইছেন; নিজের চেষ্টায় যদি মেয়েকে শান্ত করতে না-পারেন, তা হলে আমার সাহায্য নেবেন।

'ও মেয়ে নয়, মার্গারেট,' বললেন মি. ট্রেলনি। 'স্রেফ একটা মমি... প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে যে মারা গেছে।'

'তাতে কী?' পাল্টা যুক্তি দেখাল মার্গারেট। 'সময়ের সঙ্গে নারী-পুরুষের প্রভেদ মিটে যায় নাকি? একজন নারী সবসময়েই নারী—সে পাঁচ হাজার বছর আগেই মরুক, বা পাঁচ মিনিট আগেই মরুক! আর তোমরা তো ওকে জাগিয়ে তুলতে চাইছ। যদি ওকে জাগিয়ে তোলা যায়, তা হলে ওটা মৃত্যু হয় কী করে? বলোনি তুমি, জাদুর বাক্সটা খুললেই ও জীবন ফিরে পাবে?'

'হ্যাঁ, বলেছি... কথাটা মনে-প্রাণে বিশ্বাসও করি। ঠিক আছে, ধরলাম ও মরেনি। অদ্ভুত ধরনের একটা ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কিন্তু সেই আমলের কথা ভাবো। ওকে যারা মমি বানিয়েছে, তাদের কথা ভাবো। তখন মহিলা-ডাক্তার, বা মহিলা-পুরোহিত বলে কিছু ছিল না। পুরুষরাই ওর উন্মুক্ত দেহ দেখেছে, সেটাকে আরকে ভিজিয়ে লিনেনে পেঁচিয়েছে। আমরা তো নতুন কিছু করতে যাচ্ছি না! বৈজ্ঞানিক একটা পরীক্ষা... এতে কাউকে অসম্মান করার উদ্দেশ্য নেই।' মার্গারেটের মাথায় হাত বোলালেন মি. ট্রেলনি। 'কিচ্ছু ভেবো না, এসব কাজে

আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। আমি আর ইউজিন জীবনে বহু মমির আবরণ খুলেছি। ডাক্তারও তার পেশায় মহিলা-রোগী নিয়ে কাজ করে অভ্যস্ত। রসকে জিজ্ঞেস করো, ও-ও সমর্থন দেবে আমাদের...'

অভিযোগের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল মার্গারেট। 'তুমিও ওদের দলে? ওদেরকে সাহায্য করবে?'

জবাব দিলাম না, চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে হলো।

মি. ট্রেলনি দু'হাতে মেয়ের কাঁধ চেপে ধরলেন। বললেন, 'শোনো আমার কথা! তুমি তো আমাদের সঙ্গে থাকবে, নিজের চোখেই দেখতে পাবে, টেরাকে আমরা কোনও ধরনের অসম্মান করছি কি না। ভয়ের কিছু নেই, আমরা সবাই শুধু পরীক্ষাটার কথা ভাবছি। পুরনো দিনের ধ্যান-ধারণা আর জ্ঞানকে ফিরিয়ে আনতে চাইছি, বিজ্ঞানের সামনে নতুন পথ... নতুন দিশা উন্মুক্ত করতে চাইছি। এ-কাজে বিপদ আছে, আমাদের যে-কেউ... অথবা সবাই-ই মরতে পারি, কিন্তু তবু চেষ্টা করে যাব আমরা। ব্যাপারটাকে আমরা কেউ হালকাভাবে নিচ্ছি না, সমগ্র অস্তিত্ব নিয়ে এতে জড়িয়ে আছি প্রত্যেকে। তা ছাড়া... পরীক্ষাটার স্বার্থেই মমির গায়ের সমস্ত ব্যাণ্ডেজ সরাতে হবে আমাদেরকে। কারণ ওটার ভিতর যদি টেরা জীবন ফিরে পায়, তা হলে দম বন্ধ হয়ে মরবে! সেটা নিশ্চয়ই চাও না তুমি?'

আস্তে আস্তে মার্গারেটের মুখের উপর থেকে বিষাদের কালো ছায়াটা সরে গেল। মৃদু গলায় বলল, 'ঠিক আছে, বাবা। আমি আর বাধা দেব না। তারপরও বলব, ব্যাপারটা একজন রানী, বা নারীর জন্য বড়ই অসম্মানের।'

সিঁড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলাম আমি। পিছন থেকে ডাক দিল মার্গারেট। 'ম্যালকম, তুমি কোথায় চললে?'

'এখানে ভাল লাগছে না,' বললাম আমি। 'মমির আবরণ

খোলা হলে নাহয় আসব।'

কাছে এসে আমার হাত ধরল মার্গারেট। বলল, 'যেও না। এখানকার পরিবেশ ভাল নয়, তারপরও তোমার থাকা দরকার। পরে হয়তো খুশি হবে, এমন একটা অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হওনি বলে।'

মনটা দমে গেল ওর কথা শুনে—এখন আর যাওয়া চলে না। বুকের মধ্যে চেপে বসে থাকা ভয় আর আতঙ্কের মুখোমুখি হতে হবে।

ইতোমধ্যে ডা. উইনচেস্টার আর মি. করবেক সরিয়ে ফেলেছেন সারকোফাগাসের ডালাটা। আমি আর মি. ট্রেলনি এগিয়ে গেলাম তাঁদের সাহায্য করতে। মমিটা আকারে বেশ বড়—লম্বা, চওড়া, ওজনে ভারী। লিনেনের পরত খুব বেশি হওয়ায় এ-অবস্থা। দেহটা দ্বিগুণ আকৃতি পেয়েছে। চারজনে মিলেও ওঠাতে কষ্ট হলো, ধরাধরি করে ওটাকে টেবিলে নিয়ে এলাম আমরা, শুইয়ে রাখলাম।

ঠিক তখুনি পুরো ব্যাপারটার ভয়াবহতা উন্মোচিত হলো আমার সামনে। উজ্জ্বল আলোয় শুয়ে থাকা দেহটাকে ঘিরে ঘুরতে থাকা মৃত্যুর স্বরূপ বুঝতে পারলাম পরিষ্কারভাবে। মমির বাইরের দিকের আবরণটা ক্ষয়ে যাওয়া; কোথাও কোথাও ছিঁড়ে গেছে, বা আলগা হয়ে গেছে ঘষা খেয়ে; পুরো জিনিসটা কালচে বর্ণ ধারণ করেছে কালের আবর্তনে। অসংখ্য পরত ব্যাণ্ডেজের তলায় লুকিয়ে থাকা একটা মানবদেহের আকৃতি বোঝা যাচ্ছে সন্দেহাতীতভাবে। এ স্রেফ মৃত্যুর প্রতিচ্ছবি, আর কিছু নয়। দুই মিশর-বিশেষজ্ঞ অবশ্য নির্বিকার, ডাক্তারও অপারেটিং টেবিলের সামনে দাঁড়াবার ভঙ্গিতে শান্ত আছেন; কিন্তু আমার ভিতরে কী যেন ঘটে গেল। সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে ফেললাম, লজ্জা অনুভব করলাম নিজের কাপুরুষতায়... পাশাপাশি

মার্গারেটের ফ্যাকাসে চেহারা আমাকে ঘাবড়ে দিল আরও।

শুরু হলো কাজ। মমি-বেড়ালটার ব্যাণ্ডেজ খোলা দেখে কিছুটা মনের জোর বেড়েছে; কিন্তু এটা তার তুলনায় অনেক গুণ বড় একটা ব্যাপার। ওটার তুলনায় অনেক বেশি সূক্ষ্ম কাজ করা হয়েছে টেরার উপর, ব্যবহার করা হয়েছে উন্নতমানের আরক আর মালমশলা। বাইরের আবরণটা সরাতেই ভিতরের পরিচ্ছন্ন লিনেন উন্মুক্ত হতে শুরু করল। আস্তে আস্তে বাতাস ভারি হতে থাকল শুকনো আরকের গুঁড়োয় আর গন্ধে—ব্যাণ্ডেজ ছেঁড়ার সঙ্গে ছড়াতে শুরু করেছে ওগুলো। মমিটার মোড়ক এত বেশি, যেন অনন্তকাল ধরে চলছে কাজটা। ধীরে ধীরে টেবিলের পাশে জমা হচ্ছে বিশাল এক স্তূপ, ব্যাণ্ডেজ ছেঁড়ার অবিরাম শব্দ কানের উপর চাপ সৃষ্টি করে চলল। ধীরে ধীরে উত্তেজনা ফিরে এল আমার মধ্যে, যদিও অংশ নিচ্ছি না অবশ্য কাজটাতে। দু'হাত একত্র করে একটু দূর থেকে দেখে চলেছি প্রক্রিয়াটা, পাশে মার্গারেট। এক পলকের জন্য ওর চোখে কৃতজ্ঞতা দেখতে পেলাম—রানীকে উন্মুক্ত করায় হাত লাগাচ্ছি না বলে।

ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে আসছে মোড়ক। বিটুমিন আর আরকের পরিমাণ কমে গেছে, ব্যাণ্ডেজগুলো খুলে আসছে মোটামুটি সহজভাবে। তবে তীব্র গন্ধটা কমেনি একটুও। তাতে অবশ্য দুই মিশর-বিশেষজ্ঞ আর ডাক্তারের অসুবিধে হচ্ছে না, দ্রুত হাতে কাজ করে চলেছেন তাঁরা। ভিতরদিককার মোড়কের গায়ে মাঝে মাঝেই হায়ারোগ্লিফ পাওয়া যাচ্ছে—কিছু শুধু সবুজ রঙে আঁকা, বাকিগুলো বহুবর্ণ। ওগুলো নিয়ে সময় নষ্ট করছেন না মি. ট্রেলনি—সাবধানে খুলছেন বটে, তবে আলাদা করে রাখছেন পরে দেখবেন বলে।

কাজের শেষ অংশটা বুঝতে অসুবিধে হলো না। ব্যাণ্ডেজের পরিমাণ কমে যাওয়ায় স্বাভাবিক আকৃতির মনুষ্যদেহ ফুটে উঠল

আমাদের সামনে। আমার বাহু খামচে ধরল মার্গারেট, চেহারায় মনে হলো রক্ত নেই, ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে—বুক ওঠানামা করছে অস্বাভাবিকভাবে। ওকে শান্ত করব কী, নিজেও উত্তেজনায় কাঁপতে শুরু করেছি তখন।

আমাদের চোখের সামনে লিনেনের শেষ পরতটা সরালেন মি. ট্রেলনি, গম্ভীর চোখে দেখলেন উন্মুক্ত দেহটা। তারপর আশ্বস্ত করার সুরে চোখ তুলে বললেন, 'খামোকাই দুশ্চিন্তা করছিলে, মা। এই দেখো, রানীর গায়ে একটা আলখাল্লা আছে... রাজকীয় আলখাল্লা!'

দুরু দুরু বুকে এগিয়ে গেলাম আমরা। ঠিকই বলেছেন ভদ্রলোক, সাদা রঙের একটা ধবধবে আলখাল্লায় ঢাকা টেরার দেহটা—গলা থেকে একেবারে পায়ের পাতা পর্যন্ত। মুখ দেখা গেল না, ওটা আরেক টুকরো লিনেনে ঢাকা পড়ে আছে। আলখাল্লাটার উপর নজর দিলাম আমরা। নারীসুলভ কৌতূহল মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে মার্গারেটের ভিতরও, ও-ও ঝুঁকে পড়ল দেহটার উপর।

আমার দেখা শ্রেষ্ঠ সিল্কে তৈরি হয়েছে আলখাল্লাটা—এত বছর পরও ঝলমল করছে আলো পড়ায়। গলার কাছটায় নিখাদ স্বর্ণ দিয়ে কারুকাজ করা হয়েছে, দেখা যাচ্ছে একসারি পদ্মফুল। পায়ের কাছে, আর হাতায়ও রয়েছে একই কারুকাজ।

একটা কোমর-বন্ধনী দেখতে পেলাম কোমরের উপর—পরানো হয়নি, দেহটার উপর ফেলে রাখা হয়েছে। চোখ-ধাঁধানো জিনিস—নানা রকম মণিমুক্তোয় খচিত, ঠিকরে বেরুচ্ছে রংধনু-র সাতটা রঙ। কোমর-বন্ধনীর বাকল্‌টা বিরাট এক হলুদ পাথরে গড়া—গোলাকার, তাতে খোদাই করে রাখা হয়েছে সূর্যের প্রতীক; দু'পাশে আরও দুটো ছোট গোল পাথর আছে—ওগুলো ছড়াচ্ছে চাঁদের আলো।

মার্গারেট চঞ্চল চোখে দেখছে অলঙ্কারটা, চেহারায় উত্তেজনা। হঠাৎ ভুরু কুঁচকে গেল ওর, পিছিয়ে এসে বলল, 'এটা কাফন নয়... লাশ ঢাকার জন্য রাখা হয়নি! এটা তো বিয়ের পোশাক!'

তাড়াতাড়ি দেহটার উপর ঝুঁকলেন মি. ট্রেলনি। পোশাকটা ধরে দেখলেন, টান দিলেন গলার কাছে। তারপর সোজা হয়ে বললেন, 'ঠিক বলেছ। লাশের পোশাক না এটা, পরানোও হয়নি। গায়ের উপর শুধু মেলে রাখা হয়েছে।'

কোমরবন্ধনীটা তুলে নিলেন তিনি, মার্গারেটের হাতে দিলেন; তারপর ধীরে ধীরে সরিয়ে ফেললেন আলখাল্লাটা।

দম আটকে এল আমাদের। অদ্ভুত সুন্দর একটা নারীদেহ শুয়ে আছে আমাদের সামনে—মুখের কাপড়টা বাদ দিলে সম্পূর্ণ নগ্ন! কাঁপা কাঁপা হাতে ওই আবরণটাও সরালেন মি. ট্রেলনি—রানীর পূর্ণ সৌন্দর্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো। প্রবল গ্লানিবোধ, আর বিবেকের দংশনে আক্রান্ত হলাম—এখানে আমাদের উপস্থিতি ঠিক নয়; ঠিক নয় এমন নিরাবরণ এক সৌন্দর্যের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা। এ পাপ... নারীর প্রতি চরম অবমাননা!

ভাবলাম ঠিকই, কিন্তু চোখ ফেরাতে পারলাম না আমিও। এমন রূপ আর দেহ-সৌষ্ঠব কেবল স্বপ্নেই দেখা যায়... আর দেখা যায় শিল্পীর হাতে গড়া মূর্তিতে। মৃত্যুর কোনও ছোঁয়া নেই তাতে—মাখনের মত মোলায়েম চামড়া স্বাভাবিক বর্ণ আর ঔজ্জ্বল্য ধরে রেখেছে—শুকিয়ে টান টান হয়ে নেই। সারা দেহ পুরুষ্ট, সতেজ... ঠিক জীবিত মানুষের মত। ফোলা ঠোঁট, উন্নত স্তনযুগল, পেলব বাহু, চিকন কোমর, গভীর নাভি... আজও পুরুষকুলকে কামনার আগুনে পোড়াবে। একমাত্র খুঁত ডান হাতটা... কয়েক হাজার বছর বাইরের আলো-বাতাসের স্পর্শে

সামান্য বিবর্ণ হয়ে গেছে; কবজির তলায় কাটা অংশটাতে শুকিয়ে আছে কালচে রক্ত।

হাঁ হয়ে তাকিয়ে ছিলাম আমরা, কিন্তু মার্গারেটের ভিতর নারীত্ববোধ জেগে উঠল মুহূর্তে। পিতার হাত থেকে আলখাল্লাটা ছোঁ মেরে নিয়ে দেহটা ঢেকে দিল ও। এবার শুধু মুখটা দেখতে পাচ্ছি আমরা—তাতে আটকে গেল দৃষ্টি।

দেহের চেয়ে মুখটাও কোনও অংশে কম অবাক করার মত নয়। মৃত মানুষের চেহারা নয়, ঘুমন্ত... জীবিত একজন মানুষের ছায়া ফুটে আছে তাতে। চোখদুটো বন্ধ, মাথার এক গোছা চুল পড়ে আছে কপাল আর গালের উপর; টকটকে লাল ঠোঁটদুটো একটু ফাঁক হয়ে আছে, দেখা যাচ্ছে মুক্তোর মত সাদা দাঁতের অগ্রভাগ। এর চেয়েও অবাক ব্যাপার হচ্ছে চেহারাটার সঙ্গে মার্গারেটের মিল। প্রথম যেদিন ওকে দেখি, যেন সেই মুখটাই আবার উদয় হয়েছে সামনে। ঠিক ওর মতই টেরার মাথায় একটা মিশরীয় মুকুট রয়েছে!

দৃশ্যটা দেখে স্থবির হয়ে গেছেন মি. ট্রেলনি। মার্গারেট পাশে গিয়ে তাঁর পিঠে হাত রাখল। ফ্যাল ফ্যাল করে মেয়ের দিকে তাকালেন তিনি, অস্ফুট গলায় বললেন, 'যেন তুমিই ওখানে শুয়ে আছ, মা।'

প্রত্যুত্তরে কিছু বলল না মার্গারেট। কিছুক্ষণ নীরবতায় কাটল আমাদের। চুপচাপ শুনলাম সবাই সাগরের উত্তাল গর্জন, বাতাসের শোঁ শোঁ—ঝড় আসবে মনে হচ্ছে। প্রকৃতি যেন কিছু বলতে চাইছে আমাদের।

খানিক পর নিজেকে সামলে মি. ট্রেলনি বললেন, 'সময় করে পরে আমাদের দেখতে হবে—এই আশ্চর্য প্রিজার্ভেশনটা কীভাবে করা হয়েছে। মমি বানানোর যেসব পদ্ধতি দেখেছি আগে, তার সঙ্গে এটার একটুও মিল নেই। লাশের গায়ে কাটাকুটি নেই,

তার মানে পচনশীল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো বের করে নেয়া হয়নি। দেহটা অক্ষত রেখে কীভাবে পচন ঠেকাল, সেটাই বিস্ময়কর। রঙ-টঙ সব স্বাভাবিক রেখেছে... মনে হয় শিরার ভিতর কোনও আরক ঢুকিয়েছে। কী সেটা, আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে।'

একটা সাদা কাপড় এনে রানীর দেহটা ভাল করে ঢাকল মার্গারেট, আমাদের অনুরোধ করল ওটা ওর রুমে পৌঁছে দিতে। বলল, 'তোমাদের পরীক্ষার তো এখনও অনেক দেরি আছে, ততক্ষণ ওকে এখানে একা ফেলে রাখতে চাই না।'

মি. ট্রেলনি আপত্তি করলেন না, তাই লাশটা আমরা নিয়ে গেলাম দোতলায়, মার্গারেটের বিছানায় শুইয়ে রাখলাম। আমাদেরকে চলে যেতে বলল মার্গারেট। 'আমাকে কিছুক্ষণ ওর সঙ্গে একা থাকতে দাও। পোশাকটা পরিয়ে দেব ওকে, হয়তো এই বিশেষ অনুষ্ঠানটার জন্যই ওটা সঙ্গে রেখেছিল ও।'

অনেকক্ষণ পর আমাকে ডেকে পাঠাল মার্গারেট। রুমে ঢুকে দেখলাম, রানী টেরার পরনে বিয়ের পোশাক। অলঙ্কার, মুকুট, কোমরবন্ধনী... সবকিছু দিয়ে ওকে সুন্দর করে সাজিয়েছে মার্গারেট; বুকের উপর রেখেছে একটা সাদা ফুল। কিছু বলল না ও, আমার হাত ধরে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল প্রাণহীন দেহটার দিকে, তারপর ওটাকে একটা সাদা চাদরে ঢেকে আমার সঙ্গে বেরিয়ে এল রুম থেকে।

সবাই তখন ডাইনিং রুমে—একসঙ্গে বসে মহা-পরীক্ষার খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করছে। কথোপকথন চলছে অনেকটা জোর করে, আলাপচারিতার মাধ্যমে নিজেদের ব্যস্ত রাখার একটা প্রাণান্ত চেষ্টা। চরম মুহূর্তটার আগে একাকীত্বে ভুগতে চাইছে না কেউই।

কিন্তু সময় যত ঘনিয়ে এল, ঘড়ির কাঁটা যেন ঘুরতে থাকল

ততই ধীরগতিতে। আমার সঙ্গীদেরকে তন্দ্রায় ঢুলতে দেখলাম, ভয় হলো—নতুন করে এরা অচৈতন্য হয়ে পড়ছেন কি না। আমি অবশ্য সম্পূর্ণ সজাগ আছি, সজাগ আছে মার্গারেটও। তবে মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে আছে ওর—উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা তাড়াতে পারছে না। জোর করে লাইব্রেরিতে নিয়ে গেলাম ওকে, সোফায় শোয়ালাম—বললাম একটু ঘুমিয়ে নিতে। রাত তিনটায় আমাদের এক্সপেরিমেন্ট... প্রস্তুতি যদি দুটো থেকেও নিতে শুরু করি, তারপরও প্রায় দু'ঘণ্টা আছে বিশ্রাম নেবার জন্য। ওকে কথা দিলাম, জেগে থাকব, যথাসময়ে ডেকে দেব; তবে লাভ হলো না। আমার পীড়াপীড়িতে শুলো ঠিকই, কিন্তু চোখ মুদল না, এটা-সেটা গল্প জুড়ে দিল। শেষে ঘণ্টাখানেক পর চেষ্টায় ক্ষান্ত দিলাম আমি, রেহাই দিলাম ওকে। মুচকি হেসে উঠে বসল মার্গারেট। আমাকে বলল, বাবার রুমে যেতে চায়।

মি. ট্রেলনির কামরায় পেলাম আমার সঙ্গীদের, সবাই মূর্তির মত বসে আছে অসীম ধৈর্য নিয়ে। কথা বলছে না। আমি আর মার্গারেট যোগ দেবার পরও অবস্থার পরিবর্তন ঘটল না।

অবশেষে ঘড়িতে রাত দুটো বাজার ঘণ্টা শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রাণ ফিরে পেলাম আমরা। মুখ-হাত ধুয়ে নেমে পড়লাম কাজে। প্রথমেই বাড়ির সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ আছে কি না, পরীক্ষা করে দেখলাম। তারপর সবাই সঙ্গে নিলাম একটা করে রেসপিরেটর—সপ্তভুজ বাক্সটা খোলার পর কী বেরুবে জানি না, তবে অজানা কোনও ড্রাগের প্রভাবে সবাই চেতনা হারাতে চাই না।

এরপর মি. ট্রেলনির নির্দেশে রানী টেরার দেহটা আমরা নিয়ে গেলাম গুহায়; একটা কাউচ নিলাম সঙ্গে, তাতে শুইয়ে রাখলাম রানীকে। বুক পর্যন্ত ঢেকে রাখা হলো একটা সাদা চাদর দিয়ে। ডান হাতটা ভাঁজ করে রাখা হলো বুকের

উপর—ভ্যান হাইনের বর্ণনা মোতাবেক। কাটা কবজিটা রাখা হলো ওটার সামনে... উপুড় করে; তলায় থাকল সপ্তমীর রত্নটা—ওটা সেফ থেকে বের করে নিয়ে এসেছেন মি. ট্রেলনি। টেরার হাতের নীচে রাখবার সময় ওটা ঝলমল করতে থাকল।

দৃশ্যটা অভিনব, অভিজ্ঞতাটাও। চারজন পুরুষ ধরাধরি করে এমন একটা মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছি, যেটার হুবহু চেহারার একজন জীবিত মানুষ অনুসরণ করছে আমাদেরকে!

লাশটা কাউচে শোয়ানোর পর গুহাটা শেষবারের মত পরীক্ষা করে দেখলাম আমরা। বায়ু চলাচলের জানালাগুলো বন্ধ করলাম ঠিকমত, জিনিসপত্রগুলোর অবস্থান নিশ্চিত করলাম চূড়ান্তভাবে—দেখে নিলাম গুহার মাঝখানে সারকোফাগাস, আর পাশের সপ্তভুজ বাক্স-সহ টেবিলটা ঠিকমত আছে কি না। প্রাচীন প্রদীপগুলো খাঁজ মিলিয়ে রাখলাম বাক্সটার চারপাশে। এসব করতে করতে কেটে গেল পঁয়তাল্লিশ মিনিট। শেষে গুহা থেকে বেরিয়ে গেল মার্গারেট, ফিরে এল সিলভিওকে কোলে নিয়ে।

সময় হয়ে গেছে, মুখে রেসপিরেটর লাগালাম, তারপর আগে থেকে ঠিক করা অবস্থানে দাঁড়িয়ে পড়লাম সবাই। আমি থাকলাম প্রবেশপথের পাশে, ইলেকট্রিক সুইচের কাছে—ওগুলো বন্ধ করবার দায়িত্ব পেয়েছি। ডা. করবেক থাকছেন কাউচের পাশে, সারকোফাগাসের উল্টোদিকে—যাতে মমিটার কী হয়, তা ঠিকমত দেখতে পান। মার্গারেট ওঁর পাশে থাকবে। মি. ট্রেলনি আর মি. করবেক দায়িত্ব নিয়েছেন প্রদীপগুলো জ্বালাবার। হাতে দেশলাই নিয়ে তৈরি হয়ে থাকলেন ওঁরা।

ঘড়ির ঘণ্টা শুনেই বুকটা ধক্ করে উঠল। সময় হয়ে গেছে—এ তারই বার্তা। গুরুগম্ভীর ধ্বনিতে বাজল ঘণ্টা... এক, দুই, তিন!

তৃতীয় ঘণ্টাটা পড়বার আগেই ঝটপট প্রদীপগুলো জ্বেলে

দিলেন দুই মিশর-বিশেষজ্ঞ। আমাকে ইশারা করলেন। ঘণ্টার আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই সুইচ বন্ধ করে দিলাম আমি। অন্ধকার যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল গুহার ভিতর, আলো বলতে শুধু সাতটা প্রাচীন প্রদীপের শিখা লড়াই শুরু করল নিকষ কালোর বিরুদ্ধে। দুরু দুরু বুকে আরম্ভ হলো প্রতীক্ষার পালা।

সময় গড়িয়ে চলল মন্থর গতিতে। চারপাশের পৃথিবী যেন স্থির হয়ে গেছে। আবছা আলোয় দেখতে পেলাম সঙ্গীদের—কেউ একবিন্দু নড়ছে না। রেসপিরেটর লাগানো অবস্থায় সবাইকে কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছে। জ্বলজ্বল করছে শুধু মার্গারেটের সাদা পোশাক, আর সিলভিওর চোখদুটো।

প্রদীপগুলো জ্বলেই চলেছে, যেন নিভবে না কখনও। অস্থির হয়ে উঠলাম মনে মনে—কিছু ঘটছে না কেন?

হঠাৎ করে সচকিত হয়ে উঠলাম। সপ্তভুজ বাক্সটা থেকে আভা বেরুতে শুরু করেছে, ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে আলোটা—নীলচে থেকে শুরু করে পরিণত হলো চোখ-ধাঁধানো সাদায়! জ্বলজ্বল করতে শুরু করল বাক্সটা—যেন নিরেট কোনও বস্তু নয় ওটা, আলোর খণ্ড! কতক্ষণ ওভাবে রইল ওটা, জানি না; আচমকা একটা মৃদু বিস্ফোরণের মত আওয়াজ পেলাম। পরমুহূর্তেই ধীরে ধীরে খুলে যেতে শুরু করল ওটার ডালা—ফাঁকা দিয়ে বেরিয়ে এল আরও কয়েকগুণ উজ্জ্বল আরেকটা আলোকরশ্মি, পুরো গুহাকে সয়লাব করে ফেলল। ওটার দিকে সরাসরি আর তাকাবার উপায় থাকল না।

হঠাৎ করে কমতে শুরু করল আলো, বাক্সের ভিতর থেকে বেরুতে শুরু করল সবুজ রঙের একটা ধোঁয়া। রেসপিরেটর থাকায় ওটা নাকে ঢুকল না, কিন্তু তীব্র একটা ঝাঁঝালো গন্ধ পেলাম নাক-মুখ ঢাকা অবস্থাতেই।

ঘন হতে থাকল ধোঁয়াটা, পাক খেতে শুরু করল গুহার

ভিতর, প্রতি মুহূর্তে ঘনত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে ওটার, ছেয়ে ফেলছে দৃষ্টিসীমাকে। মার্গারেটের কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে হলো—কাউচের পিছনে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে ও, কিন্তু পা নড়াতে পারলাম না। ওদিকে তাকাতেই ডা. উইনচেস্টারকে হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ে যেতে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারালেন না উনি, মেঝে থেকেই হাত নেড়ে ইশারা করলেন আমাকে—যেন ওদিকে না যাই। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকালাম দুই মিশর-বিশেষজ্ঞের দিকে, ধোঁয়ার জন্য দেখতে পেলাম না ঠিকমত, কিন্তু মনে হলো যেন ওঁরাও টলছেন। একটু পর থিকথিকে তরলের মত পুরো গুহাটাকেই ঢেকে ফেলল ধোঁয়া, নিজের হাতটাও আর দেখতে পাচ্ছি না ঠিকমত।

স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম আমি, সময়জ্ঞান থাকল না। কতক্ষণ ওভাবে ছিলাম জানি না, হঠাৎ খেয়াল করলাম—পাতলা হয়ে এসেছে ধোঁয়া, প্রদীপগুলোও নিভে গেছে। বাতি জ্বালাবার আদেশের অপেক্ষায় থাকলাম, কিন্তু পেলাম না। মার্গারেটকে দেখবার আশায় দ্রুত চোখ বোলালাম কাউচের কাছে—ওখানে সাদা রঙের কী যেন একটা নড়ে উঠল। বুকের কাছে হৃদপিণ্ড লাফিয়ে উঠল, আরও নড়াচড়ার আভাস পাচ্ছি... তবে তা মার্গারেটের নয়। সিলভিও-র ভয়ার্ত ডাক কানে এল, মেঝেতে ছুটোছুটি করছে প্রাণীটা। একটু পর আমার পায়ের কাছ দিয়ে ছুটে চলে গেল প্রবেশপথের দিকে।

ঢোঁক গিলে আবার তাকালাম কাউচের দিকে, নড়াচড়া থেমে গেছে। চোখ ঘোরালাম, সপ্তভুজ বাক্সটার পাশে কাউকে দেখতে পেলাম না। ওটা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, একই সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছে আলোর আভা।

শান্ত হয়ে উঠল সবকিছু, তীব্র গন্ধটা ছাড়া আর কিছু পাচ্ছি না। নিকষ আঁধার নেমে এসেছে গুহার ভিতর। রেসপিরেটর

সরিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'বাতি কি জ্বেলে দেব?'

জবাব পেলাম না। তাই আবার চেঁচালাম... এবার আরও জোরে। 'মি. ট্রেলনি! সুইচ কি অন্ করব?'

জবাব এবার পেলাম, তবে সেটা মি. ট্রেলনির নয়... মার্গারেটের কাছ থেকে। অন্ধকারে রিনরিন করে উঠল ওর কণ্ঠ।

'হ্যাঁ, ম্যালকম।'

তাড়াতাড়ি জ্বেলে দিলাম সব বাতি। এখনও পুরোপুরি যায়নি ধোঁয়া, আলো জ্বলবার পরেও সব অস্পষ্ট। তাড়াতাড়ি কাউচের কাছে ছুটে গেলাম। মার্গারেট মেঝেতে বসে আছে, হাত ধরে ওকে দাঁড়াতে সাহায্য করলাম।

আমার উদ্বেগ লক্ষ করে ও বলল, 'ভয়ের কিছু নেই। আমি ঠিক আছি।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!' বললাম আমি। 'কিন্তু বাকিদের কী অবস্থা? এসো, জানালাগুলো খুলে দিই। এই হতচ্ছাড়া ধোঁয়াটা বের করতে হবে...'

আমাকে অবাক করে দিয়ে ঘোর লাগা গলায় মার্গারেট বলল, 'অস্থির হবার কিছু নেই। সবাই ভাল আছে, কারও কিছু হয়নি।'

কী দেখে ও এমন কথা বলছে, কে জানে। তা নিয়ে মাথা ঘামালাম না। দ্রুত সমস্ত জানালার মুখ খুলে দিলাম, খুলে দিলাম প্রবেশপথের দরজাটাও। পাক খেয়ে সমস্ত ধোঁয়া বেরুতে শুরু করল গুহা থেকে। একটু পরই ভিতরটা দেখবার মত পরিষ্কার হয়ে গেল।

মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে সবাই। কাউচের পাশে চিত হয়ে পড়ে আছেন ডা. উইনচেস্টার। সারকোফাগাসের পাশে, টেবিলের নীচে পড়ে আছেন মি. ট্রেলনি আর করবেকও। অজ্ঞান হলেও সবাই নিয়মিত তালে শ্বাস ফেলছে দেখে স্বস্তি পেলাম।

মার্গারেটের দিকে তাকালাম—নেশাগ্রস্তের মত লাগছে ওকে, তবে দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসছে। এগিয়ে গিয়ে মি. ট্রেলনিকে একটা জানালার পাশে টেনে নিয়ে গেল ও, দেখাদেখি আমিও ডাক্তার আর করবেককে নিয়ে গেলাম অন্য দুটো জানালার পাশে। গুহা থেকে বেরিয়ে গেলাম আমি, খানিক পরে কিচেন থেকে একটা ব্র্যাণ্ডির বোতল নিয়ে ফিরে এলাম। অজ্ঞান তিনজনকে উঁচু করে গলায় ব্র্যাণ্ডি ঢালতে শুরু করলাম আমরা। চিকিৎসাটায় ফল মিলল, একটু পরেই সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করলেন তাঁরা।

কাজটায় মগ্ন থাকায় অন্যদিকে নজর দিতে পারিনি, এবার ফুরসত পেতেই চোখ ফেরালাম গুহার দিকে—আমাদের মহা-পরীক্ষার ফলাফল দেখবার জন্য। ধোঁয়া কেটে গেছে প্রায় পুরোপুরি, রয়ে গেছে শুধু ঝাঁঝালো গন্ধটা।

বিশাল সারকোফাগাসটা ঠিক আগের মতই দেখতে পেলাম আমি, পাশের টেবিলে ডালা-খোলা অবস্থায় পড়ে আছে সপ্তভুজ বাক্সটা। ওটার ভিতরে কালো রঙের কীসের যেন তলানি! এ ছাড়া পুরো গুহার ভিতরে... প্রতিটা জিনিসের উপর পড়েছে ছাইয়ের মত কীসের যেন প্রলেপ।

কাউচের দিকে তাকালাম—ওটা শূন্য। সাদা চাদরটা ঝুলছে কিনারে, যেন ওটা সরিয়ে কেউ নেমেছে মেঝেতে। রানী টেরার কোনও চিহ্ন নেই কোথাও।

মার্গারেটের হাত ধরে এক কোণে নিয়ে এলাম আমি। উত্তেজিত কণ্ঠে জানতে চাইলাম, 'কোথায় টেরা? কী ঘটেছে ওর ভাগ্যে? তুমি তো ঠিক পাশেই ছিলে, নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছ সব?'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মার্গারেট। 'না, ম্যালকম। কিছুই দেখিনি। যতক্ষণ পেরেছি, তাকিয়ে থেকেছি কাউচের দিকে;

এরপর ধোঁয়াটা এত ঘন হয়ে গেল যে, দেখবার আর সুযোগ ছিল না। অবশ্য হ্যাঁ, কী যেন নড়তে শুনেছি কাছে। তবে ওটা ডা. উইনচেস্টার হতে পারেন—মেঝেতে পড়ে গেলেন কিনা! সিলভিও-ও হতে পারে। ভয় পেয়ে কোল থেকে নেমে পড়েছিল ও, ছোটাছুটি করছিল...'

বলতে না বলতে ফিরে এল বেড়ালটা, মালকিনের পায়ের কাছে শরীর ঘষতে শুরু করল। মৃদু হেসে ওকে কোলে তুলে নিল মার্গারেট, হাত বুলিয়ে আদর করতে শুরু করল।

কাছে গিয়ে কাউচটা পরীক্ষা করলাম আমি। জ্ঞান ফেরার পর পরীক্ষা করে দেখলেন মি. ট্রেলনি আর করবেকও। ডাক্তার অবশ্য পারলেন না, ওঁর সুস্থ হতে পুরো চব্বিশ ঘণ্টা লেগেছিল। যা হোক, কাউচ থেকে আমরা কোনও সূত্রই পেলাম না। ওখানে শুধু পড়ে ছিল রানী টেরার পোশাক, অলঙ্কার আর সপ্তর্ষির রত্নটা। দেহটা গায়েব, ওটা বাড়ির কোথাও পাওয়া গেল না। দরজা-জানালা বন্ধ ছিল, ওর পক্ষে জেগে উঠে বেরুতে পারার কথা না, পারলেও পোশাক আর প্রিয় রত্নটা ছাড়া কেন যাবে—সেটাও প্রশ্ন।

সে-রাতে আসলে কী ঘটেছিল, তা আর কোনোদিন জানতে পারিনি আমরা। পুরো গুহায় ছড়িয়ে থাকা ছাই পরীক্ষা করে দেখেছিলাম—ওগুলো পোড়া দেহাবশেষ আর অস্থিভস্ম বলে প্রমাণিত হয়েছিল। ফলাফলটার ভিত্তিতে মি. ট্রেলনি অনুমান করেছিলেন, হয়তো ব্যর্থ হয়েছিল পরীক্ষাটা... রানীর দেহ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

সত্যিই কি তা-ই? টেরার দেহ-ই কি ধ্বংস হয়েছে ওই গুহাতে, নাকি অন্য কারও? ওই ঘটনার পর থেকে মার্গারেটের দিকে তাকালে সন্দেহ জাগে আমার মনে, ওকে অন্যরকম মনে হয়। শুধু মনে পড়ে যায়... অন্ধকার, ধোঁয়ায় ঢাকা গুহাতে একই

চেহারার দুজন মানুষ ছিল! টেরার ফেলে যাওয়া পোশাক, অলঙ্কার আর রত্নের কথা ভাবি... ওগুলো এখন মার্গারেটের কাছে। মার্গারেট-ই তো? নাকি...

জানি না আমি, জানতে চাই-ও না। ভয়াবহ সম্ভাবনাটার কথা মাথায় এলে অসুস্থ বোধ করি, ভুলে যেতে চাই অমন একটা আশঙ্কা। তীব্র ভালবাসায় কাছে টেনে নিই ওকে, নিজেকে বিশ্বাস করাই—না, এ-আমারই মার্গারেট। অন্য কেউ নয়। হতে পারে না!

সেই শরতে বিয়ে হয়ে গেল আমার আর মার্গারেটের। বিয়ের অনুষ্ঠানে রানী টেরার পোশাকটা পরেছিল ও, সঙ্গে সমস্ত অলঙ্কার। সপ্তর্ষির রত্নটা ঝুলিয়েছিল গলায়, নেকলেসের লকেট হিসেবে। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় অপার্থিব আলো ছড়াচ্ছিল ওটা।

সুখেই দিন কাটছে আমাদের। মাঝে মাঝে অবশ্য ভয়াল সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়... এই যেমন আজ পড়ল... তখন মার্গারেটের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করি আমি। কখনও কখনও হা-পিত্যেশের সুরে সমবেদনা জানাই, বেচারি রানী নতুন পৃথিবীকে দেখতে পেল না। ওর প্রতিক্রিয়া দেখতে চাই আসলে কথাটা বলে।

মার্গারেট তখন হাসে। বলে, 'ওর জন্য দুঃখ কোরো না। কে জানে, হয়তো যা চাইছিল, তা পেয়ে গেছে ও! ধৈর্য আর প্রতীক্ষার ফল সবাই পায়; ও তো কম ধৈর্য ধরেনি, কম প্রতীক্ষা করেনি! আসলে কী ঘটেছে, তা আমরা কেউই জানি না, কাজেই ও-নিয়ে মাথা ঘামাবার মানে হয় না। ওকে ওর মত থাকতে দাও।'

চোখে অদ্ভুত আভা খেলা করতে থাকে ওর।

***